www.banglastreet.online

বাংলা ST. উৎসব ১৪৩১

Happy Durga Puja

MEDHA CHOWDHURY

Naktala, Kolkata

Overseas Consultants

27 YEARS

FESTIVE GREETINGS

OVERSEAS CONSULTANTS
OC CONSULTANTS PVT. LTD.
LOOK EAST MEDIA PVT. LTD.
MEERA INTERNATIONAL FILMS
BANGLASTREET ONLINE
ONTARIO SECONDARY SCHOOL DIPLOMA (OSSD), CANADA
NIGHTINGALE CLINIC IVF LAB
SEMEY MEDICAL UNIVERSITY, KAZAKHSTAN
NATIONAL INSTITUTE OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT (NIEM)
PSC MEDISERVICES PVT LTD
DIAHOME (ARH CHENNAI INITIATIVE)

CE -17, SECTOR - 1, SALTLAKE
KOLKATA - 700064 ,INDIA

প্রকাশন সংস্থা

লুক ইস্ট মিডিয়া প্রাইভট লিমিটেড

সম্পাদক

আশিস পণ্ডিত

অনুপ্রেরণা
বিপ্লব ঘোষ
সাগরিকা ভট্টাচার্য

সহযোগী সম্পাদক
পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়

সহ সম্পাদক
প্রণব দত্ত

ওয়েব ডেভেলপ
শুভ্রনীল

ব্যবস্থাপনা
মহম্মদ শাহজাহান
দীপিকা শাসমল

রিসার্চ
রাহুল শাসমল

পৃষ্ঠাসজ্জা ও পরিকল্পনা
অভয় দে

অলংকরণ
বিনীতা পণ্ডিত

বিপণন
তপন পাল

বর্ণ সংস্থাপন
বাপ্পাদিত্য নায়েক

প্রচ্ছদ
নীল

লন্ডন প্রতিনিধি
এ কে এস মাসুদ
১১২ শেরউড গার্ডেন , লন্ডন,ই১৪৯, ডব্লিউ ডব্লিউ
ফোন ৪৪৭৭২৩৩১৭৮১৩

আশিস পণ্ডিত কর্তৃক সি ই ১৭ সল্ট লেক কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও কলকাতা গ্রাফিক প্রা লি , ৩বি মানিকতলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট থেকে মুদ্রিত
RNI No. WBBEN/২০০৯/৩৫২৯৯

সম্পাদকীয় দপ্তর
সি ই ১৭, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০০৬৪

ই-মেল banglastreet@gmail.com
Banglastreet2@gmail.com
Website : banglastreet.online

২০০ টাকা

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। আস্তে আস্তে এই বাংলার বুকে সোনা রোদের ইশারা জাগছে বটে, আকাশও নীলচে হয়ে এসেছে। মা আসছেন। কিন্তু প্রত্যেকবারের মতো এবার বাংলার বুকে মাতৃ আরাধনার চেনা সুরে লেগেছে অন্য এক জেগে ওঠার উত্তাপ। মায়ের পুজোর উপচারে এবার লেগেছে রক্তের ছিটে। এ মহাপাপ। নির্যাতিত এবং নিহত এক নারীর রক্তের রং যেন একা জ্বালিয়ে দিয়েছে আগুনপাখির অগ্নিগীতিকার সুর। সেই সুরের আবহেই এবার বাঙালির উৎসবের আবহও বেঁধে নিয়েছে তার বুকের তার। বাংলার কোণে কোণে জেগেছে অত্যাচারীর দর্পিত আস্ফালনের মুখোমুখি 'বিচার চাই বিচার দাও' স্বর। তার চিরচেনা গানের সুর গেছে পাল্টে। ভাগ্যহীন একা আজ আর সেই মেয়েটি নয়, অনাথ যেন আজ গোটা বাংলা। কিন্তু তার জন্য বাংলা আজকে কেবল শোকে মুহ্যমান নয়, বাঙালি আজ অন্য সুরে বেঁধে নিয়েছে নিজের জেগে ওঠাকে। সেই জেগে ওঠার গান বুকে নিয়ে আসন্ন উৎসবের জন্য তৈরি হয়ে উঠছে 'বাংলা স্ট্রিট' - ও। তার এবারকার পুজোর নৈবেদ্য সে সাজিয়ে নিয়েছে সেই বিচার চাওয়ারই সুরে। অনাচারের এই ক্লিন্ন দিনগুলো নিশ্চয়ই কেটে যাবে। কিন্তু ভবিষ্যতেও আসুরিক , নগ্ন এই হিংস্রতা আর যেন বাংলার বুকে কখনো ফিরে না আসে – এই হোক আমাদের সকলের প্রার্থনা।

সবাই ভালো থাকুন। সকলে সুস্থ থাকুন । উৎসবের দিনগুলো সকলের ভালো কাটুক। সকলের শুভ হোক। সকলের ভালো হোক।

Apollo Clinic
Expertise. Closer to you.

NOW IN AGARTALA

WITH ULTRA MODERN FACILITIES

Experience doctors available from all over the India

OUR SERVICES

Consultation | Health Check | X-Ray (Digital) | Ultrasonography | Echocardiography | Dental | TMT (Cardiac Stress Test) | Pulmonary Function Test | Holter Monitoring | ECG | Pathology (Biochemistry, Haematology,Serology, Clinical Pathology, Microbiology, Biopsy, Hormones,Immunology) | Eye Clinic

 # Dhaleswar Road No: 13, Near Blue Lotus Club Chowmohani, Agartala - 799007 | Phone : 0381-232 8088/8089
E mail : agartala@theapollo.com

সূচিপত্র

আখ্যান

অমরকোষে দেবী দুর্গা
অমিয় কুমার দাশগুপ্ত ১১

স্মৃতিকথা

সেদিনের কথা
শংকর চক্রবর্তী ১৩

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রোত্তর কাল ও বাংলা রঙ্গমঞ্চের মধ্যযুগ
দীপঙ্কর সেন ২৩
সাহিত্য মরে ' না ' ...
তরুণ চক্রবর্তী ৩৫

নিবন্ধ

অদ্ভুত দেশ অস্ট্রেলিয়া
সৌরভ অধিকারী ৮৫

বড়ো গল্প

খেয়ালী
আদিত্য সেন ১৬

গল্প

সমর্পণ
সুজিত বসাক ২০
নীলনদে দুর্গোৎসব
প্রভাত ভট্টাচার্য ২৮
টানাপোড়েন
সুস্মিতা দেবনাথ ৩০
যেতে নাহি দিব
অনির্বাণ জানা ১০৮
হওয়া বদল
অর্পিতা ঘোষ পালিত ১১৩
শোক
রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৬

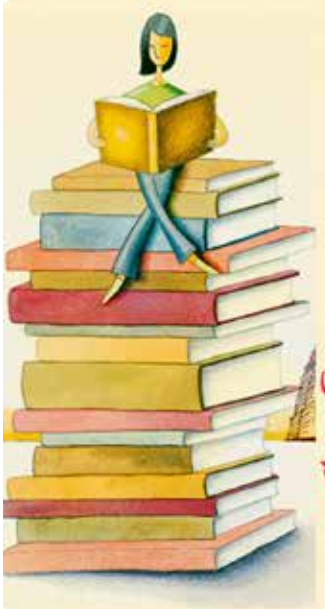

৪৮ তম কলকাতা
বইমেলায়
প্রতি বছরের মতো
এবারেও আমরা আসছি
আমাদের নতুন বইয়ের
সম্ভার নিয়ে

Look East Media Pvt. Ltd.
+91 33 2321 0004
CE 17, Salt Lake , Kolkata-700064

Ignite Successwith with NIIEM

NATIONAL INSTITUTE OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT (NIIEM)

WHO WE ARE

Launched in 2021, National Institute of Innovation and Entrepreneurship Management (NIIEM) has been working to develop the Innovation and Entrepreneurial capabilities of students. The focus of the Institute is to make the Gen Z future-ready with skills that makes human unique – Creative, Empathetic, Critical, Persuasive.

Call now! +91 33 2321 0004

Kolkata - CE 17, Sec - 1. Saltlake, Kolkata- 700064(W.B)

Pune - New Modi Colony, Rasta Peth, Pune, Maharashtra 411011

www.niiem.com

Email id - Info@niiem.com

নভেলেট
জীবন স্রোত
প্রণব দত্ত ৭৪

থ্রিলার
কান্তার মরু
কাজী আনোয়ার হোসেন ৪০

কবিতাগুচ্ছ
অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় ৮৮

কবিতা
কস্তুরী সেন, পারমিতা চট্টোপাধ্যায়, তুলিকা মজুমদার, মালবিকা মিত্র, সহেলী সেনগুপ্ত, সুশীল মণ্ডল ৮২

শতবর্ষে
দ্য গ্রেটেস্ট শোম্যান
চণ্ডী মুখোপাধ্যায় ৯১

ভ্রমণ
এক যে ছিল পাকিস্তান
সুমিতা মুখোপাধ্যায় ১১৮

অভিযান
মণিমহেশের পথে পথে
বাবলু সাহা ১২৩

গ্যালারি
সেইসব পুরোনো কর্মকর্তারা ...
জয়ন্ত চক্রবর্তী ১৩১

ফ্যাশন ১৩৬

২০০ টাকা

Nightingale
CLINIC IVF LAB

Dhaleswar, Road No 13, Near UBI, Blue Lotus Club Chowmuhani, Agartala - 799007
Email : nightingaleclinicivf@gmail.com , Web : www.nightingaleivf.com

Ultra Modern Clinic
Reputed Foreign Doctor
Imported Machinery
Affordable Cost

Only IVF Clinic in Agartala Now Open

Reg. Off. **KROMOSOM DIAGNOSTICS LLP,**
CE - 17 , Sec - 1, Salt Lake, Kolkata - 700064, Ph : **+91 33 2321 0004**

With Best Compliment From

M/S. N.C.BANERJEE & SON

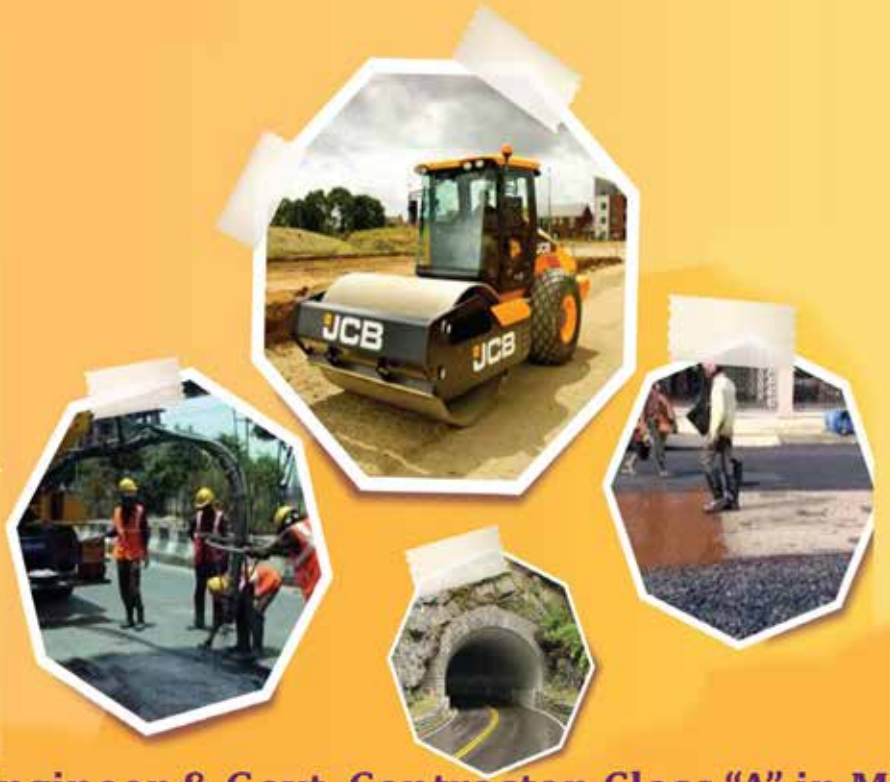

Engineer & Govt. Contractor, Class "A" in MES
We are Member of: INDIAN ROADS CONGRESS
INDIAN INSTITUTE OF BRIDGE ENGINEERS
&
BUILDER'S ASSOCIATION OF INDIA

Office at AE-552, Sector-I, Salt Lake City,
Kolkata-700064 (Near Bhagabati Devi Girls High School)

Powered By ARH DR. A. RAMACHANDRAN'S DIABETES HOSPITALS

Overseas Consultants

diahome
DIABETES CARE COMES HOME

Namashkar Kolkata

Now avail expert Diabetes Care from **Diahome at your doorstep**

Video Consultation with expert Diabetologist

Lab Tests at the convenience of your home

Medicines delivered

MONTHLY OPD STARTED BY ARH
(Dr. A. Ramachandran Hospital, Chennai.)

- Diabetologist Consultation
- Lab Tests & Special Investigation
- Delivery of Medicines
- Dietitian Consultation
- Dedicated Physician Assistance
- ECG
- Doppler
- Biothesiometry
- Funduscopy

ECG

Doppler

Biothesiometry

Funduscopy

GET THESE TESTS AT YOUR DOOR STEP

Dial +91 9830601899 To book an appointment

CE-17, SECTOR-1, SALT LAKE, KOL-700064

অমরকোষে দেবী দুর্গা

অমিয়কুমার দাশগুপ্ত

ভারতের প্রায় সর্বত্র স্বজনমান্যা এক মহাদেবীর যে কয়টি অতি-প্রসিদ্ধ রূপের পূজা-উপাসনা বহুকাল ধরে চলে আসছে, দুর্গা-রূপ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই দুর্গা-রূপে মহাদেবীর উপাসনা ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলসমূহে বিশেষভাবে বিস্তৃতিলাভ করলেও, অন্য অনেক স্থানেই মহাদেবীর এই বিশেষ রূপটির উপাসনা প্রচলিত আছে, দেখা যায়। মহাদেবীর এই দুর্গা নাম ভক্ত সমাজে সর্বপ্রথম কখন গৃহীত ও প্রচলিত হয়েছিল, তা সাল-তারিখের নিরিখে বলা দুঃসাধ্য হলেও, মহাদেবীর এই বিশেষ রূপটির সঙ্গে ঋষি-সমাজের পরিচয় যে ঋগ্বেদীয় যুগের প্রথম দিকেই সম্ভবত ঘটেছিল, তার প্রমাণ ঋগ্বেদেই আছে। দেবী দুর্গা যে মূলত ঋগ্বেদীয় দেবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই কোনো কোনো ভারতীয় ও অভারতীয় পণ্ডিতের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, দেবী দুর্গা বৈদিক দেবী নন । এই ধারণাটি সত্য এবং প্রমাণসিদ্ধ হলে অবশ্য বলবার কিছুই থাকত না। কিন্তু ধারণাটি যে

ভ্রান্ত এবং অমূলক, তা ঋগ্বেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং অন্য ২।১টি বৈদিক গ্রন্থ একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেই বুঝা যায়। একথা ভাবতে সত্যই আশ্চর্য বোধ হয় যে, এদেশীয় এত-এত মহাপণ্ডিতের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে দেবী দুর্গা সম্পর্কে এতগুলি মূল্যবান তথ্য কী করে এতকাল লুক্কায়িত রইল ! আবার এমনও সম্ভব যে, ভারতীয় গবেষক-সমাজ সতর্কতার সঙ্গে মূল-গ্রন্থ পাঠ না করে , অনুবাদ এবং কোনো-কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতামতের উপর অতিমাত্র নির্ভরশীল হয়েই এই অবস্থাটি ঘটিয়েছেন।

বিখ্যাত কোষগ্রন্থ অমরকোষের স্বর্গবর্গে শিবানী মহাদেবীর ১৭টি বিভিন্ন নামের মধ্যে দুর্গা নামটি উমা, কাত্যায়নী সহ ধৃত আছে। এই ১৭টি নাম হল - গৌরী, কালী, হৈমবতী, ঈশ্বরা, শিবা, ভবানী, রুদ্রাণী, স্ব্বাণী, স্ব্বমঙ্গলা, অপর্ণা, পার্ব্বতী, দুর্গা, মৃড়াণী, চণ্ডিকা, ও অম্বিকা। আর মহাদেবের নামের সংখ্যা হল ৪৮টি - শম্ভু, ঈশ, পশুপতি, শিব, শূলী, মহেশ্বর, ঈশ্বর, সর্ব্ব, ঈশান, শঙ্কর, চন্দ্রশেখর, ভূতেশ, খণ্ডপরশু, গিরীশ, গিরিশ, মৃড়, মৃত্যুঞ্জয়, কৃত্তিবাস, পিনাকী, প্রমথাধিপ, উগ্র, কপর্দী, শীকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ, কপালভৃৎ, বামদেব, মহাদেব, বিরুপাক্ষ, ত্রিলোচন, রুশানুরেতা, সর্ব্বজ্ঞ, ধূর্জটি, নীললোহিত, হর, স্মরহর, ভর্গ, ত্র্যম্বক, ত্রিপুরান্তক, গঙ্গাধর, অন্ধকরিপু, এতুধ্বংসী, বৃষধ্বজ, ব্যোমকেশ, ভব, ভীম, স্থানু, রুদ্র ও উমাপতি। দেবী দুর্গার সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য বলে আমরা এখানে

অমরকোষে ধৃত সম্পূর্ণ তালিকাটিই উদ্ধৃত করলাম । একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, অমরকোষে একার্থ-বোধক নাম এবং পদ- সমূহের তালিকাই ধৃত আছে ।

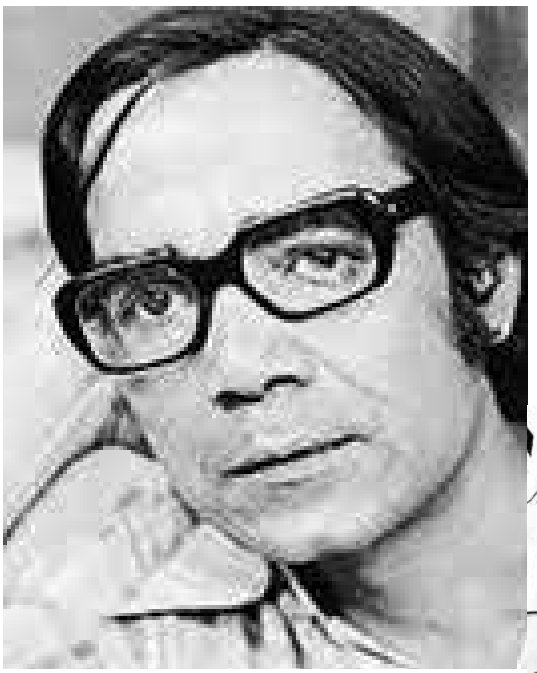

সেদিনের কথা

শংকর চক্রবর্তী

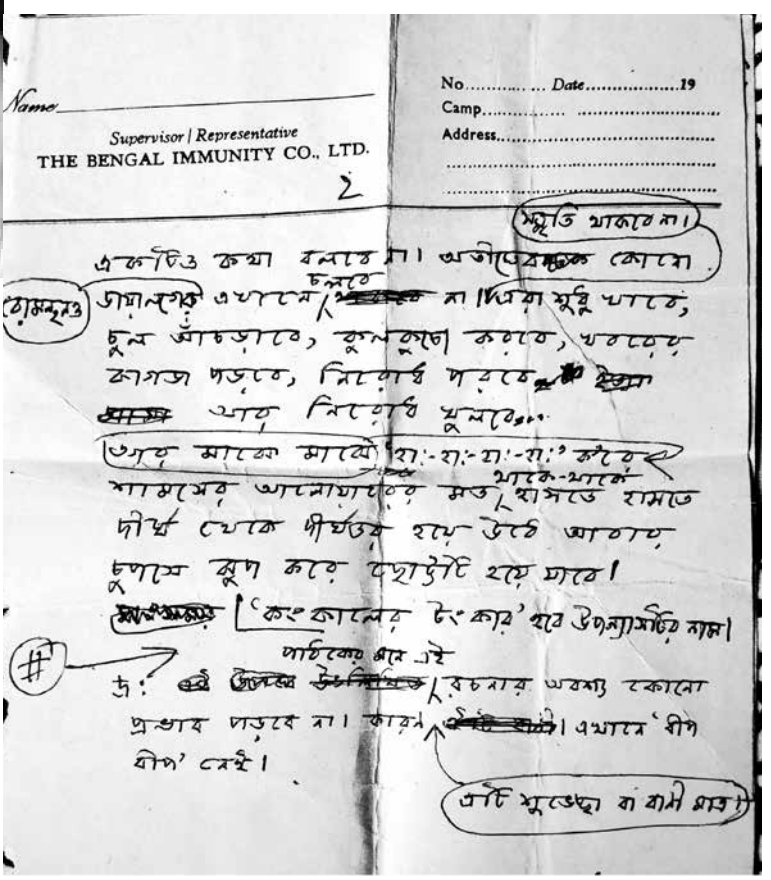
Name
Supervisor / Representative
THE BENGAL IMMUNITY CO., LTD.
No..... Date.....19
Camp.....
Address.....

তখনো তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়নি। দেখেছি মাত্র। হয়তো '৬৯- '৭০ নাগাদ। কৃষ্ণগোপাল মল্লিক সম্পাদিত 'গল্প-কবিতা' দপ্তরে । যাঁর সঙ্গে পরে বই প্রকাশ নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের। যাইহোক সন্দীপনদার সঙ্গে ফের মুখোমুখি হই এবং টানটান কথাবার্তা হয় তারও কিছুদিন পরে। অক্রুর দত্ত লেনের মাসিক কৃত্তি বাস অফিসে। আমি তো ১৯৭০ সাল থেকেই শিলং- এ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন প্রথম এলেন ওই পাহাড়ে, আমাকে, কলকাতায় গেলে, কৃত্তিবাস দপ্তরে নিয়মিত যাবার ছাড়পত্র দিয়ে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, সেখানেই সন্দীপনদার মুখোমুখি হই। কৃত্তিবাসের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপনগুলো নিজের মতো সাজাতেন তিনি, আর, চিঠিপত্র বিভাগটিও তাঁর হাতের স্পর্শে দুরন্ত হয়ে উঠত। সাধারণত শীতের সময় শিলং থেকে নেমে যেতাম আমি। মনে আছে, পরে যখন বইমেলা আরম্ভ হল, বইমেলার সময় আমাকে সঙ্গে করে মেলায় ঢুকতেন। আসলে আমি যে তাঁর টুকিটাকি সমস্ত লেখারই প্রবল অনুরাগী ছিলাম তা জানতেন সন্দীপনদা। মাঝে মাঝে নিজের লেখা সম্পর্কে সংশয়ী হয়ে আমাকে নানা ধরনের প্রশ্নও করতেন। আমি খোলামেলা, নির্দয়ের মতো খোঁচাও দিয়েছি কখনো সখনো। আবার তাঁর অভিমানী চিঠিতে আত্মবিশ্লেষণে ব্যাপারটাও আমাকে অনেক পরিণত করে তোলে।

একবার তাঁকে শিলচরে অনুষ্ঠিত এক বার্ষিক সাহিত্য সভায় যেতে হয়েছিল। সে খবর আমি শিলচর থেকেই পাই। তবে আমি জানতাম না যে, তিনি সেখান থেকে গুয়াহাটি হয়ে কলকাতা ফিরে যাবার সময়ে (শিলচর থেকে গুয়াহাটি যাবার রাস্তা শিলং শহরের ওপর দিয়ে গেছে) আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য হঠাৎই শিলং-এ নেমে পড়বেন। তিনি আমার বাড়ি চিনতেন না। অফিসের কথা জানতেন। ফলে সন্ধের সময় শিলং পৌঁছে, অফিসে গিয়ে চৌকিদারের কাছ থেকে আমার বাড়ি যাবার নির্দেশিকা জেনে নিয়ে, সোজা সেই শীতের রাতে বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলেন। ওভারকোট ও টুপিতে আচ্ছাদিত হয়ে দুজনকে আমার বাড়ির

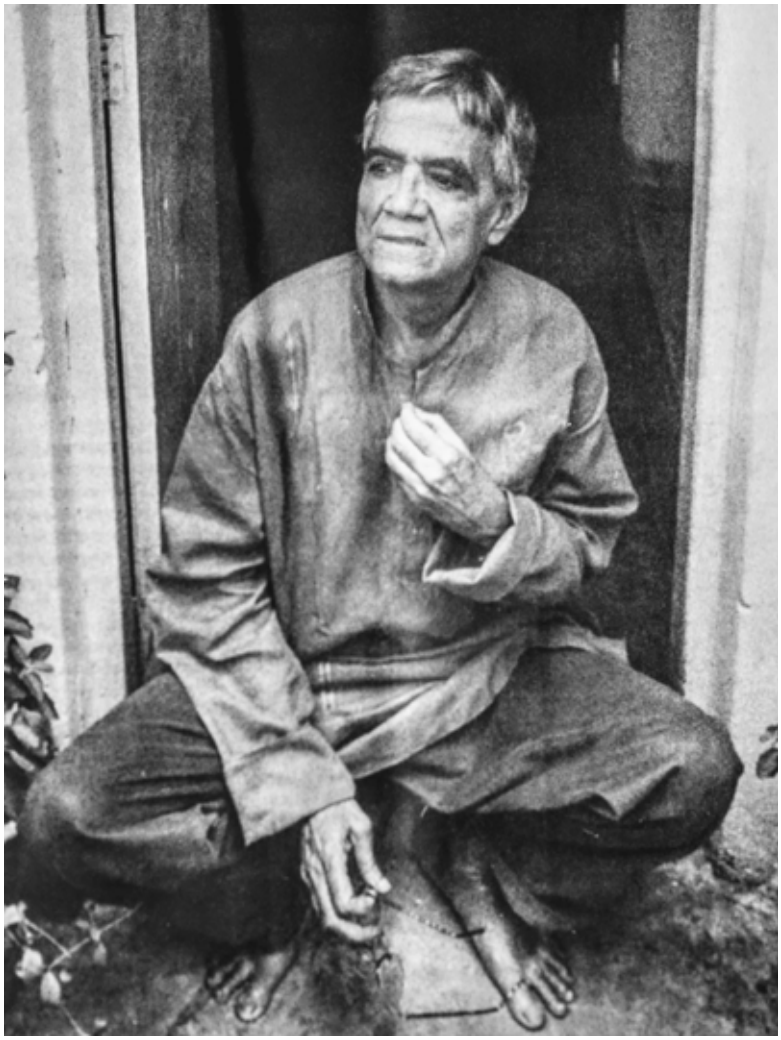

সামনে হেঁটে আসতে দেখলাম। তখন যে বাড়িতে ভাড়া থাকতাম, লাবানের সেই সুদৃশ্য বাড়ির বারান্দায় অফিস থেকে ফিরে পাইচারি করছিলাম আমি। রাস্তার স্তিমিত আলোয় ওঁরা দুজন গেট খোলার চেষ্টা করছেন যখন, বুঝলাম হয়তো এ বাড়িরই কোনো অতিথি। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাই। গেট খুলতে গিয়ে চমকে উঠি। সন্দীপনদা আর সঙ্গে পার্থসারথি চৌধুরী। পার্থদা সেই সময়ে হাওড়ার জেলা শাসক। দুজনকে নিয়ে ঘরে ঢুকি। ঘরে তখন আমার স্ত্রী কৃষ্ণা, সে-ও অফিস থেকে ফিরে পাঁচ মাস বয়সী ছেলের সঙ্গে হুল্লোড় করছিল। হঠাৎই ওদের দুজনকে দেখে অবাক হয়। সন্দীপনদা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'এই অঞ্চলে যখন এসেছি তখন তোমার সঙ্গে দেখা না করে ফিরি কী ভাবে ?'

সেটাই ছিল সন্দীপনদার প্রথম শিলং সফর। পরে আরও তিনবার। একবার রিনা বৌদি ও মেয়ের তৃণাকে সঙ্গে নিয়ে। আমাদের দুই পরিবারের কাছে সেই সব দিনগুলি ছিল হুলুস্থুল পর্যায়ের । তাঁর প্রথম সফরের দুটো দিনের কথাই উল্লেখ থাকুক এখানে। কেননা সেবার দুদিন ঝটিতি কাটিয়ে পরের দিনই ওঁরা নেমে গিয়েছিলেন গুয়াহাটি। সকালে একটা জরুরি কাজ সেরে আসার জন্যে অফিস যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সন্দীপনদা আর পার্থদাও যেতে চাইলেন সঙ্গে, কলকাতায় নিজেদের বাড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবেন বলে। আমার অফিসে সেরকম সুযোগ ছিল, জানতেন ওরা। সেটা ১৯৭৬ সাল। তো, ওঁরা ঝকঝকে পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে আমার সঙ্গে অফিসে এলেন। এসে নিজেদের বাড়ির সঙ্গে কথোপকথনও সেরে নিলেন। তারপর সন্দীপনদা খুবই নিশ্চিন্তে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'শংকর, সুনীলকে ধরো তো ফোনে একবার। শুনি নতুন কোনো কাহিনি জমা হল কিনা সুনীলের কাছে!'

প্রথমে আমি সুনীলদাকে ফোন করলাম। জানালাম সন্দীপনদা আর পার্থদার হঠাৎ আগমনের কথা। সুনীলদা হেসে বলেছিলেন, 'বাহ, তুমি তো তাহলে এখন আর নিঃসঙ্গ নও। মজায় আছো।' তারপর ফোনটা এগিয়ে দিলাম সন্দীপনদার দিকে। সন্দীপনদা ফোন ধরেই সুনীলদাকে বলতে শুরু করলেন, 'সুনীল , শঙ্করের বাড়িটা খুবই সুন্দর। চারদিকে পাইন গাছ । তার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো পড়েছে বাড়িটার ওপর। ভোরবেলা। তোমার কথা মনে পড়ছিল খুব।'

পার্থদাও কথা বললেন পরে ,তারপর দুজনে মিলে অফিসের বাইরে গেলেন, দ্রুত কাজ শেষ করে আমাকে চলে আসার হুঙ্কার দিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে অফিসের বাইরে গিয়ে এধার ওধার তাকিয়ে ওঁদের খুঁজছিলাম। হঠাৎ দেখি উল্টোদিকে, রাস্তার পাশে একটা ঘাসের জমিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন ওঁরা দুজন। এবং শুয়ে শুয়ে বিড়ি ফুঁকছেন। একজন 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য গল্প'-এর লেখক আর অন্যজন দাপুটে আমলা। আমার প্রিয় দুই অতিথি যেন স্বেচ্ছায় শিলঙে ভূমি শয্যা বেছে নিয়েছেন। কাছে যাওয়ার পর সন্দীপনদা বললেন, 'তুমিও শুয়ে পড়ো।'

আমি টেনে তুললাম দুজনকে। সন্দীপনদা উঠে বললেন, ' আরে, তোমার অফিসের কাছেই , ওই তো শিলংয়ের রেডিও স্টেশন। চলো তো, ওখানে আমার পরিচিত একজন ওড়িশার কবি প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ হিসেবে জয়েন করেছে। তার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

তাঁদের নিয়ে রেডিও স্টেশনে গিয়েছিলাম, সেখানে আড্ডাও হল অনেক। ওড়িশার সেই তরুণ কবি সেদিন সন্দীপনদার একটি সাক্ষাৎকারও রেকর্ড করে রেখে ছিলেন। সেই পর্ব শেষ হলে , সন্দীপনদা হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে বলেছিলেন, 'ইংরিজিতে এতক্ষণ বকবক করতে করতে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে।' হ্যাঁ, শিলং রেডিও স্টেশনে প্রচারের ব্যবস্থা সবই ইংরেজিতে। কখনো সখনো খাসি - জয়ন্তিয়া - গারোতেও। আমাকে নিজের কবিতার ইংরেজি অনুবাদই পড়তে হয়েছিল বেশ কয়েকবার।

সেদিন বাড়ি ফিরে ওই গৃহীত সাক্ষাৎকারটি নিয়ে আমরা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলাম। মনে আছে বছর দুয়েক পরে একবার আমার 'শতাব্দী' পত্রিকার জন্য

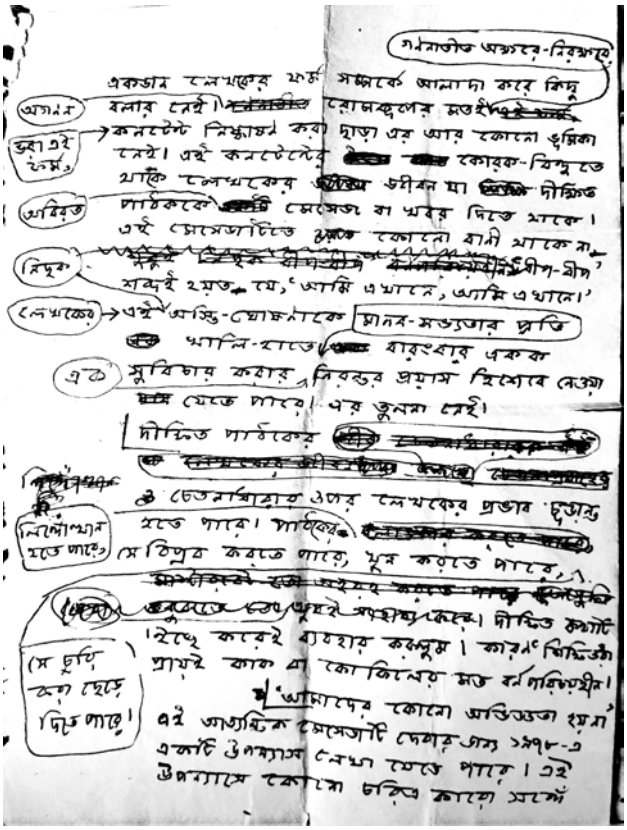

সন্দীপনদাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। সাহিত্য বিষয়ক সেই প্রশ্নটি ছিল এরকম ‘একজন লেখকের ফর্ম বা তাঁর জীবন , পাঠককে কোন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে থাকে কি ? এবং ওই পাঠক, আপনার কাছে, ১৯৭৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি একটি উপন্যাস, গল্প বা কবিতা প্রত্যাশা করেন, তাহলে কী ধরনের উপহার তাঁকে দেবেন আপনি ?’ দু পৃষ্ঠা জুড়ে অনেক কাটাকুটি করে সন্দীপনদা উত্তরে লিখে পাঠালেন

‘একজন লেখকের ফর্ম সম্পর্কে আলাদা করে কিছু বলার নেই। অগণন রোমকূপের মতোই গণনাতীত অক্ষরে-নিরক্ষরে ভরা এই ফর্ম, কন্টেন্ট নিষ্কাষণ করা ছাড়া এর আর কোনো ভূমিকা নেই। এই কনটেন্টের কোরক-বিন্দুতে থাকে লেখকের জীবন, যা দীক্ষিত পাঠককে অবিরত মেসেজ বা খবর দিতে থাকে। এই মেসেজটিতে কোনো বাণী থাকে না --- ‘বীপ বীপ’ শব্দই হয়তো --- যে, ‘আমি এখানে, আমি এখানে’ । লেখকের এই নিছক অস্তি-ঘোষণাকে খালি-হাতে মানব সভ্যতার প্রতি বারংবার একক সুবিচার করার এক নিরন্তর প্রয়াস হিসেবে নেওয়া যেতে পারে । এর তুলনা নেই। দীক্ষিত পাঠকের চেতনাধারার ওপর লেখকের প্রভাব চূড়ান্ত হতে পারে। পাঠকের লিঙ্গোত্থান হতে পারে, সে বিপ্লব করতে পারে, খুন করতে পারে, সে চুরি করা ছেড়ে দিতে পারে। দীক্ষিত কথাটি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলুম । কারণ ‘শিক্ষিত’-রা প্রায়ই কাক বা কোকিলের মতো বর্ণপরিচয়হীন।

‘ আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা হয় না’ এই আত্যন্তিক মেসেজটি দেবার জন্য ১৯৭৮ এ একটি উপন্যাস লেখা যেতে পারে । এই উপন্যাসে কোন চরিত্র কারো সঙ্গে একটিও কথা বলবে না। অতীতের কোনো ডায়লগের রোমন্থনও এখানে চলবে না। স্মৃতি থাকবে না । এরা শুধু খাবে, চুল আঁচড়াবে, কুলকুচো করবে, খবরের কাগজ পড়বে, নিরোধ পরবে, আর নিরোধ খুলবে... ‘হাহাহাহা’ ক’রে আর মাঝে মাঝে শামসের আনোয়ারের মতো থাকে থাকে হাসতে হাসতে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠে আবার চুপসে ঝুপ করে ছোট্টটি হয়ে যাবে। ‘কঙ্কালের টংকার’ হবে উপন্যাসটির নাম।

দ্র. পাঠকের মনে এই রচনার কোনো প্রভাব পড়বে না। কারণ, এটি শুভেচ্ছা বা বাণী মাত্র। এখানে ‘বীপ বীপ ‘ নেই।’

এছাড়াও সন্দীপনদা বিভিন্ন চিঠিতে তাঁর নিজস্ব লেখালেখির কথা, সাফল্য -ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করতেন। তাঁকে চিনতে পারতাম অনেকটাই। তাঁর আন্তরিকতা ও আবেগও স্পর্শ করত বারবার। একবার কলকাতায় এসে, তাঁর সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবার জন্য অভিমানী হয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সেসবই তো সঞ্চয়ের। আর বইমেলায় আমার ঘাড়ে হাত রেখে ঘুরে বেড়াবার স্পর্শটুকুও টের পাই এখনও। এই সবটুকু নিজেরই জন্য।

খেয়ালী

আদিত্য সেন

না, ওতে হাত দিও না লিলি। সন্দীপন বাধা দিয়ে ডায়েরিটা হাতের উঠিয়ে নিয়ে বলল, ওটা আমার সিক্রেট ডায়েরি, আমার অনুমতি ছাড়া পড়া নিষেধ ।

হাতটা উঠিয়ে নিল অবাধ্য মেয়ের মতো ওদিকেই নজর দিয়ে বলল, তোমার ডায়েরি তোমার ছায়া আমি জানি । কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ পড়তে পারবে না, তা তো জানতাম না।

সন্দীপন হাসতে হাসতে বলল, লোকেদের ধারণা ডাইরি বলতেই সিক্রেট জিনিস। নিষিদ্ধ প্রেমের কাহিনি। একটু থেমে সন্দীপন আবার বলল, ঠিক আছে, তুমি যদি শুনতে চাও আমি তোমাকে শোনাতে পারি, কিন্তু কোথায় আমার নিষিদ্ধ প্রেম তার তোমাকে আঙুল তুলে দেখাতে হবে।

--- আমাকে আগে ডায়েরিটা দাও, আমি আগে উল্টেপাল্টে দেখি, তারপরে না হয় তোমার বেছে নেওয়া পাতা আমাকে পড়িও।

এ কথা বলে লিলি ডায়েরিটা নিয়ে মন দিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকে।

--- তুমি কোনো খবর না দিয়ে এসে হাজির হয়েছ, তোমার অনেক কথা জানা হয়নি কিন্তু।

--- বলো কী কথা !

---কবে তুমি কার্সিয়াং-এ এলে , একা না মাকে নিয়ে ?

--- কাল বিকেলে এসেছি শিলিগুড়ি থেকে। মা শিলিগুড়িতে যাবার অনুমতি দিয়ে বললেন, তুই যা , পাহাড়ে যাবার অত ঝুঁকি আমি পোহাতে পারব না। নিজের বাড়িতে না থেকে বোনের বাড়িতে চলে গেছে।

--- তুমি কতদিন থাকবে ?

--- তুমি যতদিন চাইবে। ডায়েরি পড়তে পড়তে একটু হেসে লিলি সন্দীপনের মুড যাচাই করতে চাইল।

--- ভীষণ স্বাধীনচেতা যারা, তারা ওরকম অর্থহীন কথাবার্তা বলে। যারা শোনে তারা একটু মাথা না খাটালে পরিশেষে বদনামের ভাগীদার হতে হয়।

--- তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি তোমার ভেতরে মানুষটাকে কিছুতেই ধরতে পারি না। তাই দেখছিলাম ডায়েরিতে যদি এর

কিছু ক্লু পাওয়া যায়।

--- নেই ,আমার ছন্নছাড়া জীবনের কোনো ক্লু নেই। বলেছি তো, মা-হারা সন্তান, তখন আমার বয়স পাঁচ, পরের বছরে বাবা চলে গেলেন । ভাইকে বলে গেলেন যেন আমাকে দেখে। আসলে কি জানো, জীবনটাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। একটি মেয়ে এসে সেই জীবনের সর্বস্ব কেড়ে নেবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

--- তোমার বিষয়ে আরও যেটুকু জানি মনে হয় যথেষ্ট। তোমরা এককালে যশোরের জমিদার ছিলে। দেশ বিভাগের সময় সবকিছু ছেড়ে এ দেশে চলে এসেছ। এখন কলকাতায় দুটো বাড়ি। তোমার নামে একটা, অন্যটা তোমার দাদার। সে তোমার একমাত্র গার্ডিয়ান। নিকট আত্মীয় বলতে তোমার আর কেউ নেই।

--- আমার নিয়ন্ত্রক আমি নিজে। আমার দাদা তো কদাচ নয়। এমনকি লিলিও কোনো কালে আমাকে ঠিক...

---- থাক ও সব কথা। ডায়েরির কিছু গোপন কথা শুনতে চাও, এই তো !

---হ্যাঁ , পড়ে শোনাও।

--- না , আগে পড়ব না। তুমিতো বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। ইংরেজি নিয়ে এমএ পাস করেছ। এখন নর্দান ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছ। আচ্ছা, আমাকে বলো, ফ্যান্টাসি মানে কী ?

--- কেন আজগুবি কথা, আজগুবি স্বপ্ন বা অ্যাডভেঞ্চার। এমনকি আজগুবি ম্যাজিক। যা স্বপ্নের মতো। আসলে এক কথায় যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। স্বপ্নের মধ্যে যা সত্য, তাকি জাগ্রত অবস্থায় গ্রাহ্য বলে ভাবতে পারো তুমি ?

--- তোমার কথা ঠিক মনঃপুত হল না।

লিলি তার সরাসরি উত্তর না দিয়ে চারপাশটা একটু দেখে নিয়ে বলল, এই নাকি তোমার জিৎ হোটেল ! বাড়ি ভাড়া না করে এরকম একটা হোটেলে থাকো কেন তা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সন্দীপন রহস্যজনক হাসল, যা তোমার বোধগম্য নয় তাই আমি করে থাকি, এটাই তোমাকে জানিয়ে রাখি।

---কাউন্টারে আমাকে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হল। আগে তোমাকে ম্যাডাম জিৎ বোধ হয় ফোন করল। তুমি হয়তো টয়লেটে ছিলে। উত্তর না পেয়ে লোক পাঠাল। আমার পরিচয় জানতে চাইল। আমি বললাম তুমি আমার বন্ধু। ভদ্রমহলে একটু দীপ্তিময় হাসি হেসে খুব সন্তর্পণে নিজে এসে তোমার ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দিলেন।

--- বেশ সম্মান দিয়েছে বলো, সন্দীপন নিজের গর্বটা সবসময় অন্যের কাছে এভাবে তুলে ধরে।

লিলি হাসির সঙ্গে একটু বিস্ময় মিশিয়ে বলল, এর চেয়ে একটা ঘর ভাড়া করে থাকলেই হয়।

---রান্না করা আমার ধাতে নেই। ওই ব্যাপারে আমি একটু আলসে।

--- লোক দেখে নিলেই হয়।

--- ওসব ঝঞ্ঝাটে থাকতে চাই না। বদলির ব্যাপারটা আমাদের এখানে খুবই আছে। আমাকে তো শিলিগুড়ি রেডিও স্টেশনে পাঠাতে চেয়েছিল। আমি কর্শিয়াং - এ আসা প্রেফার করলাম। এখানে খুব বেশিদিন যদি থাকতে হয় তখন না হয় একটা আলাদা কোনো বাসা দেখব। আর ব্যক্তিগত কোনো কথা নয়, এবার শুধু আমরা অ্যাবসট্রাক্ট ছবি আঁকব। শুধু একটা মাত্র কথা, এখানে কোথায় উঠেছ ?

--- আমার এক আত্মীয় আছেন, সান্যাল, তার বাসায়।

--- খুব চিনি । রসিক লোক। তাহলে কোনো ভাবনা নেই। কিছুক্ষণ নিশ্চয় থাকতে পারবে।

--- বৌদি বলেছে তাড়াতাড়ি ফিরতে।

---তাহলে এখনি ফিরে যাও।

--- কেন , অ্যাবস্ট্রাক্ট কথা বলবে না ?

--- ওসব ইন্টেলেকচুয়াল কচকচানি তোমার আবার ভালো নাও লাগতে পারে।

--- ডায়েরির মধ্যে বড়ো বড়ো কথা আছে নাকি ? তবে আজকে না হয় নাই পড়লে। আমরা এমনি দু-চারটে মনের ও প্রাণের কথা বলে না হয় বিদায় নিই। কালকে আমি দার্জিলিং যাচ্ছি। তুমি যাবে ?

--- যেতে পারি । কাল তো আমার অফ ডে। মানে সাপ্তাহিক ছুটি।

----খুব ভালো হয় তাহলে, লিলি খুশি হয়ে বলল, তাহলে এখন ডায়েরির পাতা পড়ো, কি সব ফ্যান্টাসি কথা বলছিলে না !

--- না ডায়েরির যে দিনটার কথা পড়ব তার একটা পটভূমি আছে। ফ্যান্টাসি কাকে বলে ? আমি কার্শিয়াং এর একটা দিনকে ফ্যান্টাসি বলেছি, যদি মেনে নিতে পারো তবে পড়ি।

--- বাহ , আগে না শুনে কীভাবে মতামত দেব ? তুমি তো সভা - সমিতিতে ডায়েরির পাতা পড়ে শোনাচ্ছ না। আমার কাছে, একজন অতি আপন জনের কাছে নিজেকে খুলে ধরছ।

---খুলে ধরছি না, এটা আমার অবজারভেশন মাত্র।

-- হোক না, পড়ো তো শুনি।

সন্দীপন পড়তে শুরু করল, মনটা আবার গ্রহণ করছে, আলো , রং, মানুষ, ও মানুষের সুখী ও দুঃখী মুখগুলো। মনটা আলোর মতো প্রকাশিত হলে হাতের কাছের মানুষ ও রঙ নিয়ে বেশ ভুলে থাকা যায়। (লিলি মন্তব্য করল , আমাকে ভুলে আছ তোমার নিজের লেখাতেই তার প্রমাণ। সন্দীপন বলে, পড়ার সময় কোন মন্তব্য করবে না।

তাতে পড়ার যে একটা ফ্লো আছে তার ব্যাঘাত ঘটে। লিলি বলল, ঠিক আছে, পড়ে যাও।)' ঘুম থেকে উঠেই দেখি ভেজা ভেজা সকাল। কাল রাতে দুঃখের কথা বলতে বলতে শুধু সিগারেট

উড়িয়েছি। বাসি খবর আরো একদিন আরো বাসি হয়ে যায়। শুলেই তো ঘুমিয়ে পড়ি, তার মধ্যে শুনতে পাচ্ছিলাম বাতাসের শো শো আওয়াজ। নানা জায়গায় কালবৈশাখী ঝড় উঠবে তার আভাস ইঙ্গিত কদিন ধরেই পাচ্ছিলাম। আর আমাদের পাহাড় সেই সব মেঘ আর কুয়াশাগুলো বুকে চেপে ধরে তিন দিন আকাশটাকে মলিন করে রাখল। চারিদিকে সাদা সাদা পর্দা ঝোলানো হল, মানুষ দেখা যায় না, গাছগুলো যেন লম্বা লম্বা কালো রেখা। সমস্ত কাশিয়াং কুয়াশায় নিঝুম হয়ে রইল। রাস্তায় চলতে চলতে কিছুই দেখা যায় না। তুমি চলতে চলতে পেছনে একটা ছোরা বসিয়ে দিতেই পারো। পাশ দিয়ে তুমি যে চলছ, তুমিও টের পাবে না। আধুনিক যুগটার পর্দার আড়াল এরকম ভয়ংকর। হঠাৎ পর্দা সরিয়ে একেকটা লোক ভেসে ওঠে যেন জলে ভেসে ওঠা এক একটা হাঙ্গর। দূর থেকে ট্রাকের লাইট শুধু দেখা যায়। এরা পাহাড়ির রাতের ঘন কুয়াশায় কি করে যে গাড়ি চালায়, এদের দক্ষতায় অবাক হয়ে যেতে হয়। বেশিরভাগই তো তরুণ নেপালি ড্রাইভার। ঘন সাদা কুয়াশায় যখন কার্শিয়াং ঢেকে যায় আমার খুব ভালো লাগে । মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছি, স্বপ্নে যেমন কোনো কিছু স্পষ্ট নয়, গাছগাছড়া বা মানুষ, একটা রাস্তা বা
একটু আকাশ হঠাৎ উড়ে আসে অসংলগ্ন কথার মতো, কুয়াশায় ঢাকা কার্শিয়াং- ও অসংলগ্ন স্বপ্ন দেখে বা দেখায়! জাগ্রত ফ্যান্টাসির হাতেনাতে উদাহরণ দেখে সচকিত হয়ে উঠছি...'
হঠাৎ পড়া বন্ধ করে সন্দীপন বলে উঠল, একে তুমি নিশ্চয়ই ফ্যান্টাসি বলে মানবে না।

--- প্রাণের কথা লিখেছ খুব সুন্দর। তাই বলে একে আমি ফ্যান্টাসি বলে গ্রহণ করতে রাজি নই। ফ্যান্টাসি মানে কি কি বোঝায় আগে বলে নিই। অপ্রত্যাশিত বা অসম্ভব কোনো কাজ। কার্শিয়াং পুরো ঢাকা পড়ে গেছে পর্দায়, শীতকালে তো হতেই পারে। এখানে উপস্থিত না থাকলে হয়তো কার্শিয়াং এর এই চেহারাটা কারো নজরে আসবে না।

--- তাহলে কোনো স্বপ্নই বিশ্বাসযোগ্য নয়। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক স্তব্ধ হয়ে যায়, তাইতো !

--- হ্যাঁ ঠিক তাই। যেমন তোমার আমার সম্পর্ক। কেউ বিশ্বাসই করে না আমরা কোনোদিন ঘর করব।

--- তোমার মা নিশ্চয় আশা রাখেন , তুমি বলেছ।

--- হ্যাঁ বলেছি, কারণ মায়ের কথাবার্তাতে সেটাই মনে হয়। কিন্তু আমি নিজে বিশ্বাস করি না তুমি কোনোদিন সংসারের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে রাজি হবে । সেটাও একটা ফ্যান্টাসিই। ওই আশাটা।

--- ফ্যান্টাসি নিয়ে আমরাও মাঝে মাঝে দিন কাটাই। এটাই আমি বলতে চেয়েছি তোমাকে। এই বিশ্বাস নিয়ে যদি তুমি আমাকে বিচার কর তবে দেখবে আমি খুব স্বাভাবিক ও স্বচ্ছ একজন মানুষ ।

---- সে কথা আর বলতে ! ফ্যান্টাসির সংজ্ঞাই পাল্টে দেবে তুমি । আজ উঠলাম। কাল আমি তোমার কাছে সকাল ন'টায় এসে যাব। তারপর দুজনে সারাটা দিন মজা করব। শুধু তুমি আর আমি।

--- না , তুমি আমি আর ফ্যান্টাসি। লিলি হেসে উঠলে ভারী সুন্দর লাগে সন্দীপনের।
খুশি হয়ে সন্দীপন লিলিকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

দুই

--- আমরা দার্জিলিং এ চলেছি টুরিস্ট হিসেবে কিংবা সৌন্দর্য উপভোগ করছে কিংবা আমাদের দুজনের জীবনের একা চির বসতি খুঁজতে। কোনটা ? সন্দীপন জিপে যেতে যেতে লিলিকে জিজ্ঞেস করল।
সন্দীপনকে এভাবে কোণঠাসা করতে পেরে লিলি দারুন খুশি। হাসি ছড়িয়ে বলল, আমি আমার দাবিকে কোনো দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইনি। একবারও বলিনি আমার দিনগুলি কীভাবে যাচ্ছে, তার কথা। দাবি দাওয়া পেশ করতে তোমার কাছে আসিনি সন্দীপন। তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থেকো।

--- আমি ওসব বলছি না। আমরা দার্জিলিং- এ কী দেখতে চললাম সেই সিম্পল কথাটা জানতে চাইছি। কারণ টাইগার হিলে লোকেরা রাত থাকতে স্টার্ট করে। বাতাসিয়া লুপ, জাপানিজ পিস প্যাগোডা, ঘুম মনাস্ট্রি এসব তো চলতে ফিরতেই দেখা হয়ে যাবে । শুধু মলে গিয়ে তোমাকে কতক্ষনে ঘোড়ার পিঠে চড়াতে পারব তার জন্যই অপেক্ষা করছি।

--- বাচ্চা মেয়ে ছাড়া আর কিছু বলে বোধহয় ভাবতে পার না আমায় তাই না ! তাই কতক্ষণে ...

--- বাহ, আচ্ছা মানুষের পাল্লায় পড়লাম তো ! আমি কি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি যে পরের সিঁড়িতে ওঠার বায়না ধরব! আমার তো একা একা জীবন দিব্যি ফুর্তিতে কেটে যাচ্ছে।

--- সেটাই আমি লক্ষ্য করছি। ওই দেখো বালাসন নদী একটা রেখার মতো দূরে দেখা যাচ্ছে। ওখানে গেলে তোমার মনে রোমান্টিক ভাবনা জেগে উঠত।

--- আর এখানে, লিলি হেসে জানতে চাইল।

---এখানে তো যেতে যেতে যা দেখছ তার বেশিরভাগই চা বাগান। যে চা তোমরা শিলিগুড়িতে খাও, দার্জিলিং টি, গ্রিন লিভ্স টি সে তো আছেই, আমি যে চা প্রেফার করি টাটার গ্রিন লিভস টি, তার কিছু চা বাগান কার্শিয়াং-এও

আছে। যেতে যেতে ওরা টয়ট্রেন দেখতে পেল। লিলি আহ্লা নন্দে লাফিয়ে উঠল। ---আমরা যদি ফিরে যাই ওই ট্রেনে, কেমন হয় ?

--- বেশ, তাই না হয় করা যাবে। আগে তো দার্জিলিং ঘুরে দেখি, তারপর মলে গিয়ে একটা ভালো ঘোড়া বেছে নিয়ে তোমাকে চড়িয়ে দেব। ঘোড়ার পিঠে চড়ে সারা মল ঘুরে বেড়াবে --- তাতে যাতে বাধা না পড়ে সে আমার দায়িত্ব।

--- উদ্ভট চিন্তা তোমার। আমাকে বিপদে ফেলে তোমার চির কেলে আনন্দ। ফ্যান্টাসি নয়, তোমার মধ্যে একটা স্যাডিস্ট টেন্ডেন্সি আছে।

----এটা এটা একেবারে ঠিক ঠিক বিশ্লেষণ হয়েছে তোমার।

ওরা দার্জিলিংয়ের নানা জায়গায় একটু আধটু নেমে দেখল, তারপর মলে এসে সন্দীপন বলল, এতক্ষণে এলাম তোমার জায়গায়।

--- এখানে আমাদের বিয়ে হবে নাকি ?

--- হলেও হতে পারে। দুটো মালা কিনে পরস্পর পরস্পরকে পরিয়ে দিলেই তো বাঙালি মতে বিয়ে হয়ে যায়।

--- তা মোটেই নয় । বাঙালির বিয়ের ব্যাপারে নিয়ম-কানুন কায়দা --- অনেক কিছু যৌথ চলে।

--- আমরা দুজনে তা মানব না। আমরা এখানে শুধু একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। একজন দীর্ঘদিন প্রেম করে চাইছে এখন একজন মুক্ত পুরুষকে বিবাহবন্ধনে জড়িয়ে ফেলতে। নইলে কোনোকালে সে ধরা দেবে না। লিলি এসে ব্যাপারটা সহজ করে দিয়ে বলল, যা আমি কখনো ভাবিনি বা করতে চাইনি অকারণে আমার ওপরে চাপাচ্ছ কেন ? এ কি ভয়ানক অন্যায় নয় !!!

--- ওই যে বললাম আজ যদি বিয়ে না করি তবে হয়তো কোনো কালে বিয়ে করব না।

--- এই যদি হয় তাহলে অবশ্য বিয়েটাই আমি প্রেফার করব।

--- তবে চলো দুটো মালা কিনে আনি, সন্দীপন বলল।

দুজনে উৎসাহ করে মালা কিনতে গেল। মাজা কিনে নিয়ে স্বস্তি নেয়। সন্দীপন প্রস্তাব করল, চলো খেলতে যখন নেমেছি তখন খেলাটা শেষই করে ফেলি। মন্দিরে গিয়ে পুরোহিত ডেকে বিয়েটা তাহলে সাঙ্গ করি।

--- আমার আপত্তি নেই , বেশ চলো। লিলি হেসে সায় দেয়।

দুজনে মন্দিরে গিয়ে দিব্যি বিয়ে করে এল। হালকা করে মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে নিল লিলি।

--- চলো , এবার খাওয়া দাওয়া সারি । লিলি খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠল । সরাসরি খুব মন যেন নানা কথা ভেবে হেসে হেসে উঠছে। আর ভীষণ একটা কান্নাও পাচ্ছে, এমন একটা ঘটনা হঠাৎ কিভাবে ঘটে গেল কিছুই কেউ জানল না। অবিশ্বাস্য।

--- আমরা কি এখন শিলিগুড়িতে ফিরব ? বিয়ে হল, মায়ের আশীর্বাদ নেব না ? লিলি জানতে চায়।

--- তা কি খুব প্রয়োজন আছে, সন্দীপন বলে ওঠে। আমার মর্জি হল ,তাই একটা পুতুল খেলার মতো বিয়ে করে নেওয়া গেল, এটা কি সমাজের চোখে চোখে স্বীকৃত হবে ! তোমার মা কি গ্রহণ করতে পারবেন ?

--- মা হাড়ে হাড়ে জানেন তোমার স্বভাব। ভীষণ হুইমজিকাল। একরোখা মানুষ। এও জানেন যে, তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।

--- তাও বলছি, এই খেলা খেলা বিয়ে কি তিনি মেনে নিতে পারবেন ?

--- তোমাকে যে মা অনেকদিন আগে থেকে চিনে গেছেন। মা বলেন, ওকে ওর মতো থাকতে দে। সময় যখন আসবে ঠিক ও সাড়া দেবে।

সন্দীপন অবাক হল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, তাই নাকি !

স্বীকার করল , এইরকম একটা উদার মনোভাব নিয়ে কেউ আমাকে দেখেনি। তবে চলো, আজই ঘুরে আসব শিলিগুড়িতে । আমাদের এই খেলা খেলা বিয়ে যদি না মানেন , ওনার পছন্দমতো না হয় তাহলে আরেকবার বিয়ে করা যাবে।

লিলি আনন্দে অধীর হয়ে বলল, তোমাকে আজ যেন ঠিক চিনে উঠতে পারছি না সন্দীপন। এ তুমি সেই তুমি নও।

--- তবেই বোঝো কত তাড়াতাড়ি আমি পাল্টাতে পারি। জীবনকে আমি ভালোবাসতে পেরে এটুকুই জীবন থেকে শিখেছি। সময় মত নিজেকে পাল্টে নিতে হয়।

লিলি টয় ট্রেনে বসেছিল । সন্দীপনের আরো গা ঘেঁষে এসে কাছাকাছি বসে বলল, তোমাকে কি বুঝা যায় না সেটাই আমার বড়ো পাওনা। পাওয়া। আমি আগের মতোই চলে ফিরে বেড়াব। আমি প্রমিস করছি কোনো ব্যাপারে আমি তোমাকে কোনোরকম বাধা দেব না।

সমর্পণ

সুজিত বসাক

‘ন্যায় অন্যায়ের যখুন যুদ্ধ হয় কত্তা , তখুন অন্যায়কারীর দল পাল্লায় ভারী থাকে । কুরুক্ষেত্রের কথাই ধরেন , কেষ্ট ঠাকুর না থাইকল্যে পান্ডবদের বাপের সাধ্যি ছিল যুদ্ধ জেতার ?’ ইনি যুধিষ্ঠির বর্মন । চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া । জ্ঞানে ঠাসা ছোটোখাটো একটা অ্যাটম বোমা । লম্বায় টেনেটুনে পাঁচ ফুট । গর্দান বলে কিছু নেই । পাঁচ নম্বর ফুটবলের সাইজের একটা বিদ্যাসাগরী মাথা সরাসরি ঘাড়ের উপর বসানো । পুঁথিগত বিদ্যা যৎসামান্য । তবে মগজটাকে হিজিবিজি দিয়ে ভরে দেননি । নিয়মিত বাংলা পেপার পড়েন , বইও পড়েন । পড়ার আগ্রহ যথেষ্ট। ফলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি থেকে শুরু করে তালিবান সমস্যা , সবই তাঁর জানা । একসময় কিছুদিনের জন্য পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছিলেন । লোকে বলে , পায়খানার টাকা মারতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং প্রধানত্ব ঘুচে যায় ।

উনি অকপটে আমার কাছে স্বীকার করেছেন , একবারই দুর্নীতি করতে গিয়েছিলেন , প্রথমবারেই শিক্ষাও পেয়েছেন । আরও একটা বিশ্বাস ওঁর মাথার মধ্যে গেঁথে আছে, ওঁর এসবের কারণেই ওঁর বাইশ বছরের তরতাজা ছেলেটার অকাল মৃত্যু হয়েছে । হয়তো অন্ধবিশ্বাস , কিন্তু আমার মনে হয় লোকটাকে জাজমেন্ট করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট । এটা তো একধরনের অনুশোচনাই । যে মানুষ কোনো ভাবে নিজের দোষ স্বীকার করে অনুতাপ করে , সে একদিন দুর্নীতিগ্রস্ত থাকলেও চিরকাল থাকে না । আমি বিডিও চিরন্তন চক্রবর্তী , চারপাশে তো দেখছি ! তাপ অনুতাপ কোনোটাই নেই , শুধু টাকার খিদে , বীভৎস খিদে ! সেই চাওয়ার মধ্যে কতটা নির্মমতা মিশে থাকে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করি ।

প্রধান নন , সাধারণ পঞ্চায়েত মেম্বারও নন , পার্টিও করেন না আর , তবুও অফিসে আসেন মাঝেই । সঙ্গে থাকে ছেলে তাড়ানো বৃদ্ধ , স্বামী খেদানো বউ , সব হারানো বিধবা ; এদের মতো অসহায় সব মানুষ । তাদের ফর্ম ফিলাপ করে দেওয়া , নাম নথিভুক্ত করতে সহায়তা করা ইত্যাদি সব কাজ নিয়ে । প্রথম যেবার এসেছিলেন , আমার এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে , বলেছিলাম আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে অফিস স্টাফদের বলুন , গুরুত্বপূর্ণ মিটিং রয়েছে আমার । ঘরেই ছিল ওই অঞ্চলের বর্তমান প্রধান । মৃদু হেসে বলেছিল , ওকে বেশি পাত্তা দেবেন না স্যার । লোকটা এক নম্বরের চোর । লোক ধরে ধরে আনে , কাজ করে দেওয়ার নাম করে টাকা খায় । গরিব মানুষগুলোকেও ছাড়ে না ।

মিটিং শেষ হবার পর দেখি লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে । পাশে এক মলিন বৃদ্ধ । মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল । আচ্ছা ঠ্যাঁটা তো ! বিরক্ত গলায় বলেছিলাম , বাংলা কথা বোঝেন না ? আমি তো বললাম আগে অফিস স্টাফদের জানান । আমার কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন কেন ? বিনীতভাবে যুধিষ্ঠির বর্মন উত্তর দিয়েছিলেন , অরা কেউ শুনবে না স্যার । অনেকবার কইছি । এই যে লোকটা , কাগজ পত্তর সব আছে , অথচ কিছুই পায় না । অর টাকা নাকি অন্য কেউ তোলে । লোকটা না খাইতে পাইয়া মরার পথে । আগের সাহেবকে অনুরোধ করছি , কানে তোলেন নাই । আপনে নতুন আইছেন , তাই ভাবলাম আপনারে একবার চেষ্টা কইরা দেখি । সবাই তো সমান হয় না । কী মনে হতে আমি বলেছিলাম , ঠিক আছে , কাগজপত্রগুলো রেখে যান । আমি দেখব । দু তিনদিন পর আসুন ।

সেই শুরু । একটু একটু করে কেমন করে জানি খুব কাছে চলে এসেছেন ভদ্রলোক । তাতে অনেকেই রুষ্ট হয়েছিল , এখনও রুষ্ট । আমি আমল দিইনি , এখনও দিইনা । যুধিষ্ঠিরের বড় গুণ , কখনও অন্যায় দাবি নিয়ে আমার কাছে আসেন না । আর কারও ভয়ে নায্য দাবিকে ইগনোর করার পাত্তর আমি নই । ফলে বিভিন্ন ভাবে সংঘাত হয়েছে, হচ্ছে ।
প্রথম প্রথম স্যার বলতেন , এখন কত্তা বলেন । তবে সবার সামনে নয় । কে জানে ওই ডাকে ওঁর কী আনন্দ ! স্বতস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে , বুঝতে পারি , তাই আর বাধা দিই না ।
‘ আজ একেবারে মহাভারত নিয়ে পড়লেন যে ?’
হেসে উঠলেন যুধিষ্ঠির , ‘এমনিই । জেবন যুদ্ধ আর মহাভারতের যুদ্ধ , কুথায় যেন একটা মিল আছে কত্তা । আমি মুখ্যু মানুষ অত বুঝি না , কিন্তু মনে হয় । হয়তো অনেক পড়াশুনা কইরল্যে বুঝতে পারতাম । মহাভারতের চরিত্তরগুলাই আমাদের চাইরপাশে ছড়ায়ে ছিটায়ে আছে । ধৃতরাষ্ট্র খ পান্ডু খ. অর্জুন খ দুর্যোধন খ. শকুনি খ সব্বাই । অরাই যুগে যুগে আসে খ নাম পাল্টায়ে পাল্টায়ে খ’

এবার চোখ তুলে তাকাতেই হল । আমি বিডিও হলেও টুকটাক সাহিত্যচর্চা করি । বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা পাঠাই । দু’চারটে ছাপাও হয় ।
‘ আপনি মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলেন , ঘাবড়ে যাই । যাই পড়েন মন দিয়ে পড়েন পরিস্কার বোঝা যায় । মহাভারত পড়েছেন আপনি ?’
‘ যখুন যেমন পাই , ছাড়া ছাড়া । ওইতে আর কত্তটুকান হয়’ !

সময় আকাশের গায়ে মেঘের মতো , চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই চলে যায় ! এই জগৎবল্লভপুরে কয়েকটা বছর কেমন করে কেটে গেল ভাবলেই অবাক লাগে । এই কয়েক বছরে মধুর , তিক্ত দু’ধরনের অভিজ্ঞতাই হয়েছে । প্রশাসনের চাকরিতে তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকেই , মধুরটা বাড়তি পাওনা । যেটা ভেবেছিলাম সেটাই হল । আমার ট্রান্সফারের খবর পেয়েই ছুটে এলেন যুধিষ্ঠির বর্মন । থমথমে ভারী মুখ । দেখেই বোঝা গেল কষ্ট পেয়েছেন ।
স্বাভাবিক গলাতেই বলার চেষ্টা করলেন যুধিষ্ঠির , ‘কবে যাচ্ছেন স্যার ?’
লক্ষণীয় বিষয় , ঘরে কেউ নেই তবুও যুধিষ্ঠির আমাকে স্যার সম্বোধন করলেন । আমি মৃদু হেসে বললাম , ‘এখনই পর করে দিচ্ছেন ?’
‘তা ক্যান স্যার । আপনার চাকরি তো এমনই । সময় ফুরালে যাওয়া লাগবেই । সবায় জানে ।’
যেন নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিচ্ছেন । একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন , ‘আমার একটা অনুরোধ ছিল স্যার । যাওয়ার আগে যদি একবার আমার বাড়িতে পায়ের ধুলা দ্যান । আমার মেয়ে বউ অরাও একবার দ্যাখতে চায় আপনারে । আপনারে আর তো পাব না । আমার মতো সামান্য একটা মানুষরে আপনে অনেক সন্মান দিছেন , সেটা ভুলব ক্যামন কইরা ?’
‘থাক থাক আর বলতে হবে না । আমি একদিন অবশ্যই যাব । শিবেন আপনার বাড়ি চেনে , কোনো অসুবিধা হবে না ।’

যুধিষ্ঠির বর্মনের বাড়ির অবস্থা খারাপ জানতাম , কিন্তু এতটা খারাপ ভাবতে পারিনি । রীতিমতো বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপের মধ্যে বাড়ি । চারপাশে জল আর জল । যেতে হয় একটা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে । যথেষ্ট বিপদসঙ্কুল । শিবেনের সহায়তা নিয়ে যখন পৌঁছলাম তখনও আমার বুক ধড়ফড় করছিল ।
যুধিষ্ঠির মাথা চুলকে বললেন , ‘বর্ষাকালে এমনই অবস্থা থাকে স্যার । অনেক দরখাস্ত টরখাস্ত করছি একসময় , কোনো কাজ হয় নাই । আপনে কষ্ট কইরা আসলেন সেজন্য ধোন্যবাদ । ভদ্রমানুষ ক্যামুন কইরা আসে এখানে ?’

বেড়ার ঘর । কিন্তু পরিস্কার , পরিচ্ছন্ন , পরিপাটি । বিছানার চাদর নিখুঁত করে পাতা। একটা লাল রঙের প্ল্যাস্টিকের চেয়ারে বসতে দিয়ে যুধিষ্ঠির গেলেন ভিতর বাড়িতে । একটু পরেই ফিরে এসে বললেন , ‘হয়তো আপনার কষ্ট হবে , একটু মানায়ে নিয়েন স্যার ।’

আমি বললাম , 'অযথা টেনশন নিচ্ছেন । কষ্ট কেন হবে ? আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে । দারিদ্র কোনো পাপ নয় , লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই ।'

যুধিষ্ঠির গেলেন , ঘরে ঢুকল যুধিষ্ঠিরের মেয়ে । সদ্য যৌবনে পা রাখা লাবণ্য আর মায়া ভরা মিষ্টি একটা মুখ । হাতে কমদামি একটা চায়ের ট্রে ।

'তোমার নাম কী ?'

'সুভদ্রা বর্মন ।' চায়ের ট্রে রাখতে রাখতে জবাব দিল সুভদ্রা ।

'ফাস্ট ইয়ারে পড়ছ শুনেছি তোমার বাবার মুখে । তবে কোন সাবজেক্ট সেটা শোনা হয়নি ।'

'সংস্কৃত ।'

আপাতদৃষ্টিতে শান্ত , নিরীহ , ভদ্র মনে হলেও সুভদ্রার মধ্যে একটা চাপা আগুন জমে আছে কিছুক্ষণ কথা বলার পরেই টের পেলাম । যে আগুনে আত্মার গুণাবলী মিশে আছে , ধ্বংস করা সম্ভব নয় । একটু পরে সুভদ্রার মুখ থেকেই জানতে পারলাম তার উৎস , 'দাদার মৃত্যুটা মেনে নিতে পারি না স্যার । তখন ছোটো ছিলাম অতটা বুঝতে পারিনি । বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি আমার দাদা কী ছিল ! আর যত বুঝতে পারি তত ভিতরের আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে । মাঝে মাঝে মনে হয় , আমিই না কোনদিন পুড়ে যাই ! এত তাপ নিতে কষ্ট হয় । অথচ বাবাকে দেখুন , কী শান্ত !'

আমি স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম , 'আমি কোনোদিন এ বিষয়ে তোমার বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি । ইচ্ছে করেই । মনে হয়েছে , এসব প্রসঙ্গ তোলা মানে লোকটাকে আবার কষ্ট দেওয়া । তুললেই যখন , একটু খুলে বলবে আমাকে ?'

'আমার দাদা একটি অসহায় মেয়ের সম্মান রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল । তারই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ওকে । টিউশনি থেকে ফিরছিল , ওই সামনের মাঠটায় ডেকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ওরা ।'

'কারা ? তুমি তাদের চেনো ?'

'সবাই চেনে । বাপ্পা , মদন , মনিরুল , মুন্না । কোনো প্রমাণ নেই বলে অ্যারেস্টও করতে পারেনি পুলিশ ।'

'তোমার বাবা পুলিশকে কিছু বলেননি ?'

'বলেছিল । পুলিশ পরিষ্কার বলে দেয় , প্রমাণ ছাড়া তাদের কিছু করার নেই । বাবা পুলিশের কথা মেনে চুপ হয়ে গেল । কিছু বললে বলে , তার দাদা তো আর ফিরে আসবে না । জানি দাদা আর ফিরবে না , কিন্তু ওরা তো শাস্তি পেত ।'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সুভদ্রা । কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে বলল , 'এসব কথা আপনি বাবাকে বলবেন না স্যার । মতের অমিল থাকলেও আমি চাই না আমার কথাতে বাবা কষ্ট পাক । বাবা আপনার কথা খুব বলে আমাদের কাছে । আপনি নাকি অন্যরকম মানুষ । বাবা ভগবান বিশ্বাস করে , সব বিচার নাকি তাঁর কাছে আছে । আমি বিশ্বাস করি না । যাঁর অস্তিত্ব শুধুই মানুষের বিশ্বাসে , সে কি বিচার করবে ? কোথায় করল ?'

অভিমান জানান দেয় বিশ্বাসের ভিত্তি ! নাকের পাটা ফুলে ফুলে ওঠে সুভদ্রার । ওর কাতর আর্তি শুনে দিশেহারা লাগে আমার । যুধিষ্ঠির এলে মুক্তি পাই আমি । সামান্য বললেও অনেক রকম খাওয়ার আয়োজন করেছে ওরা । যুধিষ্ঠির গিন্নি পাকা রাঁধুনি । খাব না খাব না করেও অনেকটা খেয়ে ফেললাম । এবার ওঠার পালা । সুভদ্রার এখন অন্য রূপ । মুখে শান্ত স্নিগ্ধ , মায়াবী হাসি। একটু আগের দৃশ্যমান দাবানল অলীক জাদুবলে ভ্যানিশ করে দিয়েছে যেন !

'আবার আসবেন স্যার ।' মিষ্টি হেসে বলল ।

বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম । শিবেন গাড়ি আনতে গেলে আমি যুধিষ্ঠির বর্মনের দিকে তাকিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম , 'আপনার ছেলেকে খুন করা হয়েছিল সেটা তো কোনোদিন বলেননি ।'

'আপনারে বিব্রত করতে চাই নাই । পুরাণা কথা তুলে কী লাভ ?'

'আশ্চর্য মানুষ তো আপনি । পুলিশ বলল আর অন্যায়টা মেনে নিলেন ? এভাবেই তো ক্রিমিনালরা ছাড়া পেয়ে যায় ।'

' প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলছেন স্যার ?'

'প্রতিশোধ , বদলা এসব আমি বুঝি না । ছেলের হত্যাকারীকে সাজা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না ?'

মৃদু হেসে যুধিষ্ঠির বললেন , 'সুভদ্রার বয়স কম , অবুঝ । আমি অনেক ভাইব্যা দেখছি স্যার । কোনটা আমি চাই ? প্রতিশোধ না ন্যায় ? প্রতিশোধ থেইক্যা আর একটা প্রতিশোধের জন্ম হয় , আর একটা থেইক্যা আর একটা , চলতেই থাকে । ন্যায় আর পাওয়া যায় না । তাই আমি ন্যায়ের সিদ্ধান্তে অনড় । তার জন্য আমি অদের ক্ষমাও কইরা দিছি । কারণ আমি না যতক্ষণ অদের ছাড়ব ততক্ষণ ন্যায় আসবে না ।'

আমি বিরক্ত গলায় বললাম , 'আচ্ছা বেকুব লোক তো আপনি ! সবকিছুর একটা প্রসিডিওর থাকে, এমনি এমনি কিছু হয় না । দু'হাত গুটিয়ে বসে থাকলে বিচার পাওয়া যাবে ?'

'কে বলছে আমি দু'হাত গুটায়ে রাখছি ? আমি তো দু'হাত তুলে দিছি , দ্রৌপদীর মতোন ।'

কথাটা বুঝতে আমার একটু সময় লাগল । বোঝার পর একটা কথাও মুখ দিয়ে বের হল না।

রবীন্দ্রোত্তর কাল ও বাংলা রঙ্গমঞ্চের মধ্যযুগ

দীপঙ্কর সেন

উনিশ শতকের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ শতকের প্রথম দুটো দশক বাংলার নাট্যাভিনয়ের চলন একই ভাবে চলেছিল। মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই এই সময়ে প্রয়াত হয়েছেন একে একে - অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী (১৯০৮), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৯১২), নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯১৩), অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯১৬)। এই সময়ের পরিস্থিতি আরো বিপন্ন হয়ে উঠল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলল চার বছর ধরে (১৯১৪ - ১৮)। এই যুদ্ধের পরে বাংলা থিয়েটারের দৈন্য-দশা আরো প্রকট হয়ে উঠল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ছাড়া জীবিত নাট্যকার কেউ নেই, সেরা অভিনয় ব্যক্তিত্বরাও নেই। একমাত্র গিরিশ-মনোমোহন পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (দানী বাবু) আর অভিনেত্রী সুশীলাবালা পুরানো রীতির অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন। কোনো প্রকার নতুন উদ্যম, ভাবনা অথবা নাট্যপ্রচেষ্টা - কিছুই আর উপস্থিত ছিল না; যেন এক কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে বাংলার অভিনয় জগৎ চলেছে। কলকাতার তিনটি মাত্র প্রেক্ষাগৃহ -মনোমোহন পাঁড়ের 'মনোমোহন থিয়েটার'-এ দানীবাবু একাধারে অধ্যক্ষ ও অভিনেতা; মিনার্ভা থিয়েটারের প্রায় না-চলার মতোই অবস্থা আর স্টার থিয়েটারে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার। নটসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর সঙ্গে বাংলা নাটকের একটি প্রভূত গৌরবময় যুগের অবসান হয়। এরপর প্রায় দীর্ঘ দশ বছর তাঁর উত্তরসূরিরা ও পুত্র দানীবাবু অতীতে মঞ্চস্থ নাটক থেকে বেরোতে পারেননি। কলকাতায় সেই সময় তিনটি রঙ্গমঞ্চ - স্টার, মিনার্ভা ও মনমোহন। এই মঞ্চেও সেই নাটকের পুনরাবৃত্তি দেখতে দেখতে দর্শকেরা হতাশ হয়ে পড়ছিলেন এবং এক বিরাগের জন্ম হচ্ছিল তাঁদের মনে। এই শোচনীয় অবস্থার সদ্ব্যবহার করার জন্য এগিয়ে এলেন এক পার্শি ব্যবসায়ী - জে.এফ.ম্যাডান। কলকাতায় তাঁর একাধিক সিনেমা-হল ছিল। ধর্মতলা স্ট্রিটে কোরিন্থিয়ান রঙ্গালয়ের মালিক ছিলেন তিনি, যেখানে 'প্যারিস থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি' নাম দিয়ে হিন্দি ও উর্দু নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই নাটকগুলি লিখতেন আগা হাসার কাশ্মীরি, লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'ইন্ডিয়ান শেক্সপীয়ার'। প্রচুর অর্থব্যয়ে দৃশ্যসজ্জা, পোশাক ও আলোর নানান কারসাজিতে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা হতো। বাংলা রঙ্গমঞ্চের দীন অবস্থা দেখে ম্যাডান সাহেব বাংলা থিয়েটার নিয়ে ব্যবসা করার কথা ভাবলেন। তাঁর

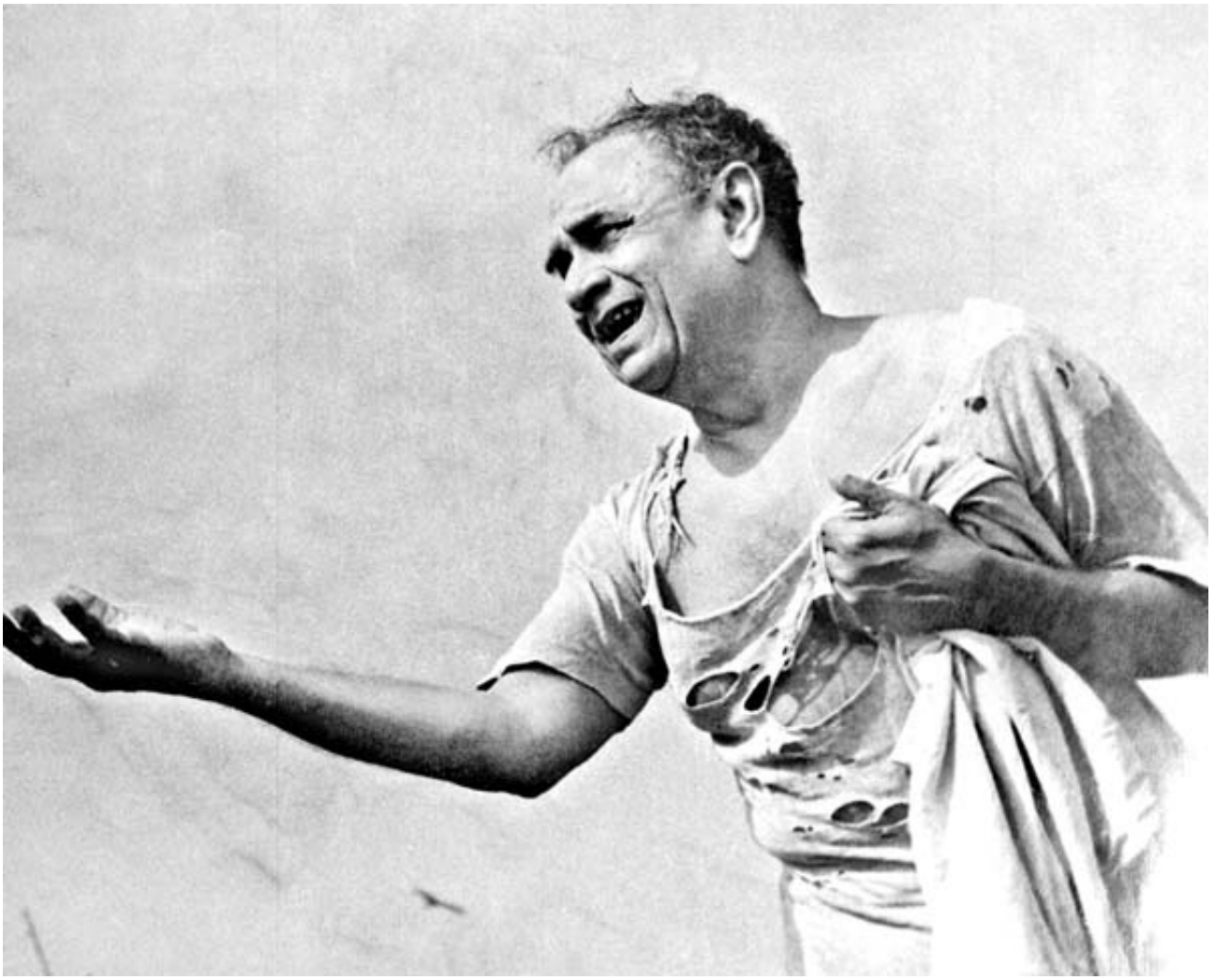

নাট্যদলের নাম হল ‘বেঙ্গলি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি’। আগা হাসারের একটি হিন্দি নাটকের বাংলা অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করা হল, কিন্তু দর্শকের কাছে তা জনপ্রিয়তা পেল না। ম্যাডান সাহেব নতুন নাটকের জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের দ্বারস্থ হলেন ও সেই সঙ্গে অভিনয়নৈপুণ্যশালী অভিনেতার সন্ধান করতে সচেষ্ট হলেন - যা তাঁকে ব্যবসা এনে দেবে। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার সব থিয়েটারগুলির মালিকানা নিয়ে বাংলা রঙ্গালয়ে নিজের একচ্ছত্র সম্রাজ্য বিস্তার করা। বাংলা নাট্যজগতে তখন সম্রাটের স্থানে বসে আছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তখন তিনি কলেজের অধ্যাপনা করছেন, শৌখিন নাটকে অভিনয় করছেন। ম্যাডান সাহেবের প্রস্তাবে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। একথাও তো ঠিক যে তাঁর মতো প্রতিভাধর অভিনেতা মাঝে-মধ্যে শৌখিন নাটকে অভিনয় করলেও তাতে তাঁর অভিনয় করার তৃষ্ণা মেটে না। সৎ বান্ধবদের পরামর্শ নিলেন, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্মতি দিলেন, অভিনয়জগতে শিক্ষাগুরু মন্মথনাথ বসুও তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে উৎসাহিত করলেন। শিশিরকুমার অধ্যাপনায় ইস্তফা দিয়ে ম্যাডানের থিয়েটার কোম্পানিতে যোগ দিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ ম্যাডানের থিয়েটারের জন্য লিখলেন তাঁর বিখ্যাত নাটক ‘আলমগীর’। ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর শিশিরকুমার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন বাদশা আলমগীর রূপে। সাধারণ দর্শকের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার ডালি তাঁকে ভরিয়ে দিল, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন, ‘এমন একজন মানুষ এলেন যিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চকে আবার খাড়া করে তুলতে পারবেন।’ আলমগীর নাটক দেখার পর সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুরআতর্থী লিখলেন, ‘...প্রথম দৃশ্যেই শিশির এমন চমক লাগিয়ে দিলে যে দর্শক-সাধারণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। তারপর দৃশ্যের পর দৃশ্য চলতে লাগল। সমস্ত স্টেজখানা জুড়ে কেবল শিশির আর শিশির। অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রী আসছে আর যাচ্ছে। কিন্তু লোকে উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছে শিশিরের। মনে হতে লাগল যেন এক অতুলনীয় শক্তিশালী জাদুকর তার মায়াজাল বিস্তার করেছে। প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটা মানুষ সেই মায়ায় মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে আছে...’। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায় শিশিরকুমারের এই অভিনয় দেখে লিখলেন, ‘শিশিরকুমার আলমগীরের ভূমিকায় ভারতীয় অভিনয়-কলার এতই

উৎকর্ষ-সাধন করেছেন যে, আমার মনে হয় যে, ইংলন্ডের কোনও অভিনেতার চেয়েই কৃতিত্ব তাঁর কম নয় - যদি এঁদের তুলনায় শিশিরকুমারের handicap (সুযোগাভাব)-গুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখা যায়'।

পেশাদারী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের এই আবির্ভাব ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনাবিশেষ। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলার এই নাট্যমঞ্চ যেভাবে দর্শকশূন্য হয়ে উঠছিল, শিশিরকুমার তাকে শুধুমাত্র ব্যাহত করলেন না, তাকে পুনরায় পূর্ণ মর্যাদায় আবার প্রতিষ্ঠিত করলেন স্বমহিমায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের দ্বিতীয় নাটক মঞ্চস্থ হল, শিশিরকুমার অভিনয় করলেন রঘুবীর চরিত্রে ,পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের তুমুল জয়জয়কারের মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখলেন, 'ক্ষীরোদপ্রসাদের রঘুবীর নাটক নিয়ে শিশিরকুমার যখন পাদপ্রদীপের সম্মুখে দাঁড়ালেন - তখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর, দৃপ্ত বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিমা সমস্ত দর্শকদের চিত্রার্পিত করে প্রেক্ষাগৃহে রেখে দিলে'। কিন্তু শিশিরকুমার সন্তুষ্ট নন, তখন তাঁর মনে অন্য চিন্তা বাসা বাঁধছে ধীরে ধীরে; বললেন, '....পরের চাকরিতে থেকে, বিশেষত অবাঙালীর চাকরিতে, নাটক বা নাট্যাভিনয়ের কোন উন্নতি করতে পারব না। নিজের free will না হলে কলাচর্চা হয় না। আমার উদ্দেশ্য টাকা রোজগার নয়, আমি চাই নতুন করে বাংলা থিয়েটারকে গড়ে তুলতে। কাজেই চাই নিজের থিয়েটার'।

ম্যাডানের কোম্পানিতে শেষতম অভিনয় করলেন চন্দ্রগুপ্ত নাটকে। মাসিক হাজার টাকা উপার্জনকে তুচ্ছ করে বেরিয়ে এলেন নতুন স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু স্বপ্নপূরণে নানান বাধার সম্মুখীন হতে থাকলেন। বেশ কিছু সম্মানীয় ও লাভবান ডাক উপেক্ষা করলেন, বহু নাটক অভিনীত হলো, যার মধ্যে বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আর্ট থিয়েটার লিমিটেড মঞ্চস্থ করল কর্ণার্জুন নাটক। অভিনয় করলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র প্রমুখ। অপরেশচন্দ্র শিশিরকুমারকে যোগদানের আহ্বান জানালেন, শিশিরকুমার প্রত্যাখ্যান করলেন। কর্ণার্জুন নাটক বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করল এবং একটানা তিনশত রজনী অভিনীত হল। এর মাস দুয়েক পর এক অবিস্মরণীয় ঘটনা আমরা দেখলাম - কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ফার্স্ট এম্পায়ার মঞ্চে স্বরচিত বিসর্জন নাটকটি অভিনয় করলেন, যখন তাঁর বয়স বাষট্টি বছর; তরুণ জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিলেন।

বাংলার রঙ্গভূমি যে নতুন কিছু পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে তা অনুভূত হচ্ছিল প্রবল ভাবেই। ১৯২৩ সালে ডিসেম্বরের বড়দিন উপলক্ষ্যে তৎকালীন সরকার এক বিশেষ উৎসবের আয়োজন করলেন ইডেন গার্ডেনে। এই উৎসবকে আরো প্রাণবন্ত করার জন্য নাট্যাভিনয়েরও ব্যবস্থা করা হল। প্রদর্শনী কমিটির সভাপতি কিরণচন্দ্র দে মহাশয় শিশিরকুমারের উপর এই অভিনয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন। এক নতুন সূচনার ইঙ্গিত পেলেন শিশিরকুমার। তিনি মনস্থির করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সীতা নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। একে একে যোগ দিলেন ললিতমোহন লাহিড়ী, রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, নীরোদাসুন্দরী, শেফালিকা প্রমুখ। শিশিরকুমারের অভিনয় দক্ষতা ও নাট্যপরিচালনা যে দর্শকদের আকৃষ্ট করবে তা তো বলাই বাহুল্য। পূর্ণ দর্শকাসনের সামনে অভিনীত হল সীতা। প্রদর্শনীতে এই নাটকের সাফল্য দেখে ভীত হয়ে পড়লেন আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ। দ্বিজেন্দ্রলাল-পুত্র দিলীপকুমার রায় বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনমাত্র আর্ট থিয়েটার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সীতা নাটকের স্বত্ব কিনে নিলেন। শিশিরকুমার যখন তাঁর কাছে গিয়ে এই নাটকের অনুমতি চাইলেন তখন দিলীপকুমার অবগত হলেন আর্ট থিয়েটারের কৌশলের ব্যাপারে। 'নাচঘর' পত্রিকায় লিখলেন, 'তখন আমি জানতাম না যে, এই 'সীতা' নিয়েই তিনি (শিশিরকুমার) নুতন থিয়েটার করতে উদ্যত। সব কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম এবং তাঁকে সঙ্গে করে আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে বলি যে, আমাকে দিয়ে চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নেওয়ার সময় আমার কাছে সব কথা খুলে বলা হয়নি। অতএব আমাকে এই

চুক্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হোক, কারণ তা না হলে শিশিরবাবুর প্রতি মস্ত অবিচার করা হয়'। বলাই বাহুল্য, আর্ট থিয়েটার এই চুক্তিপত্র বহাল রেখেছিলেন; তাঁরা তো সীতা অভিনয় করার জন্য ক্রয় করেননি, তাঁকে জব্দ করার জন্যই এই উদ্যোগ ছিল। শিশিরকুমার তাঁর পুরানো নাটকগুলিই নতুন উদ্যমে মঞ্চস্থ করতে লাগলেন, পাশাপাশি যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে দিলেন নবকলেবরে 'সীতা' নাটক লেখার দায়িত্ব। শিশিরকুমার মনমোহন থিয়েটার লীজ নিলেন, নতুন নাম রাখলেন 'নাট্যমন্দির'। এই মঞ্চে সীতাসহ বহু নাটক অভিনীত হয়েছে নাট্যপ্রেমীদের সামনে। ১৯৩০ সালে নিউ ইয়র্কের এক বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও মিস মারবেরি শিশিরকুমারকে আমন্ত্রণ জানালেন ব্রডওয়ে মঞ্চে সীতা অভিনয়ের জন্য। তিনি তাঁর দল নিয়ে সুদূর নিউ ইয়র্ক উপস্থিত হলেন এবং সীতা অভিনীত হল বিপুল উৎসাহী দর্শকদের উপস্থিতিতে। পত্রপত্রিকাগুলি তাঁদের অভিনয়ের উচ্ছসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। The Evening World লিখল, 'Of course there were few in the audience who understood the language of the visitors. But that mattered little. So superb was their pantomime– so illustrative was a shrug of the shoulders– a flash of the eye– and a lifting of the hands or arms– that one could follow the story with little trouble. It was a great treat to watch Sishir Kumar Bhadury as Rama. His voice was belléôélike– his pantomime– which told as clearly to the audience which understood not a single word– was so perfect that the words any way would have been unnecessary'.

#

তিনি ছিলেন বাংলা থিয়েটারের নবযুগের প্রবর্তক। এই নবযুগটি কি সেটা একবার দেখে নেওয়া প্রয়োজন অবশ্যই। তাঁর আগে প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেতা কি ছিলেন না? প্রকৃত অভিনয়-শিক্ষকেরও কি অভাব ছিল? মনে রাখতে হবে, এই থিয়েটারে একদিন আঁকা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পুস্করিণীর অভিনয় করতে হত, নট-নটিদের পরিচ্ছদের সঙ্গে নাটকের পরিবেশ বা পরিস্থিতির কোনো রকম সংযোগ থাকত না। কখনও বা অকারণে সখীদের নাচ-গান দিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হত। কয়েকটি কার্বন-আর্ক আর ফুটলাইটের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনেতাদের চেঁচিয়ে সংলাপ বলে নাটকের নামে এক প্রহসন দর্শিত হত। কিন্তু দৃশ্যপট, আলো, সংগীত, নৃত্য, অভিনয়, অভিনয়-শিক্ষক, অভিনয় রীতি - প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিশিরকুমারের ব্যতিক্রমী চিন্তা-ভাবনা দেখা যায়। নাট্যাভিনয়ে ত্রিমাত্রিক ব্যঞ্জনাময় মঞ্চসজ্জা, পোশাকে ও রূপসজ্জায় চরিত্রের সঙ্গে যথাযথ সঙ্গতিপূর্ণসুষম রঙের পরিকল্পনায় এক নব্য চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠল। কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে, নিশ্চিত জীবনের মায়া ত্যাগ করে শিশিরকুমার সেই সময়ের নিন্দিত রঙ্গমঞ্চকে নির্বাচন করলেন একমাত্র পেশা হিসাবে। বাংলা রঙ্গমঞ্চ নতুন প্রাণে স্পন্দিত হল, সঞ্জীবিত হল অভিনয়ের নতুন রীতিতে, মঞ্চ-উপস্থাপনার নব্য আঙ্গিকে নাট্য-নির্দেশনার সুরুচি সম্মত শিল্পবোধে। তিনি প্রথমেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশকে মান্যতা দিলেন, শিল্পী চারু রায়ের সৃজন প্রকল্পকে গ্রহণ করে মঞ্চের আঙ্গিকে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এলেন। ভারতীয় নান্দনিক রুচি অনুসারী সেই মঞ্চে প্রায় একশত জন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সুসঙ্গত রূপসজ্জায় সজ্জিত করে বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন কম্পোজিশন রচনা করলেন। নাট্যপ্রকাশে অবান্তর দৃশ্যকল্প, অলঙ্কারিকতার বাহুল্যকে সযত্নে বর্জন করে নাট্যোপযোগী গান ও আবহ পরিকল্পনা করলেন। আবহ রচয়িতা নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা গান গাওয়ালেন বিখ্যাত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দত্তকে দিয়ে। উপস্থিত করলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় পরিকল্পিত নৃত্যবিন্যাস। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিল্পী সতু সেনকে সঙ্গে নিয়ে আলোক পরিকল্পনাতেও রূপান্তর আনলেন। অভিনেতাদের শেখালেন কীভাবে উচ্চারণের শুদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে আনা যায় অর্থবহতা, যে-অর্থ শুধুমাত্র চরিত্রের বাইরের দ্বন্দ্বকেই উন্মুক্ত করে না, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকেওবাচনিক ও শারীরিক অভিব্যক্তি দেয় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে।

#

প্রয়োগক্রমে বৈপ্লবিক হয়েও প্রত্যেক পদক্ষেপে তিনি তাঁর পূর্বজদের উত্তরাধিকার কোনোদিন অস্বীকার করেননি। এই সূত্রেই তিনি মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন তাঁর গুরু গিরিশচন্দ্র এবং ভাবগুরু রবীন্দ্রনাথের আদর্শের মধ্যে। তাঁর আগে একমাত্র গিরিশচন্দ্রই এক নির্দিষ্ট ধারায় অভিনয় করে বাংলা থিয়েটারের ব্যবসাকে লাভজনক বলে প্রমাণ করেছিলেন - একথা অবশ্য স্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের সশ্রদ্ধ উক্তি স্মরণীয়, গিরিশ বাংলা থিয়েটারকে brought home to menós business and bosom অবৈতনিক হিসাবে কিছুদিন মঞ্চে কাজ করে গিরিশচন্দ্র বুঝে ছিলেন এ দেশে থিয়েটারকেও ব্যবসা বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তখনই তিনি তাঁর নিজের

নাট্যশালা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং 'ন্যাশনাল থিয়েটার' অধিগ্রহণ করেন। শিশিরকুমারও তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের যুক্তি ছিল, অভিনয়ের সমস্ত প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সমেত একটি নাট্যশালা না থাকলে কোনো নাট্য সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদিত নেতা হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ব্যবসায়িক থিয়েটারে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু পেশাদার মঞ্চের আবহে তাঁর রুচি আরাম পায়নি কোনোদিন। এই বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের প্রয়োগনৈপুণ্যের বিষয়ে নিঃসন্দিহান হয়ে কয়েকটি নাটক তাঁকে দিলেও একমাত্র 'শেষরক্ষা' নাটকটিই তাঁর নিজস্ব রচনাগুণে এবং শিশিরকুমারেরন অভিনয় গুণে দর্শক সমাদর পেয়েছিল। অন্যান্য নাটকগুলির ব্যর্থতার জন্য দর্শক বা রবীন্দ্রনাথই কেবল দায়ি নয়, দায়ি রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমারের সম্পর্কের সঙ্গে নাটক ও পরিচালকের অসম দ্বন্দ্বও অন্যতম কারণ হিসাবে ভেবে নেওয়া যেতে পারে। শিশিরকুমারের সহযোগে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ হয়তো পুনরায় আশান্বিত হয়েছিলেন থিয়েটারের আবহাওয়ায় সুস্থ জলবায়ু নিয়ে আসার ব্যাপারে। অন্যদিকে বাংলাদেশে যেহেতু প্রতিভাবান প্রতিভাবান সূক্ষদর্শী নাট্যকারের অভাব ছিল সেই যুগে, তাই শিশিরকুমারও চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি রবীন্দ্রনাথকে পেশাদার মঞ্চে জায়গা করে দিতে। কিন্তু বাধা এসেছে বিভিন্ন দিক থেকে, এই বাধার একটা দিক যেমন দুজনের বোঝাপড়ার মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক থেকে যাওয়া, আবার অন্য দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় হয়তো স্বয়ং নাট্যচার্যের অসম ভাবনা-চিন্তা।

১৯৫৯ সালে শিশিরকুমারের সত্তর বছর বয়স পূর্ণ হল। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন তাঁকে সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করতে চাইলে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন সরকার যদি সত্যিই তাঁকে ও তাঁর কাজকে সম্মানিত করতে চান তবে কলকাতা মহানগরীতে একটি 'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' উপহার দেওয়া হোক। ধীরে ধীরে তাঁর শরীর বয়সোচিত কারণে অশক্ত হতে চলেছে, তবু ভাঙা শরীর নিয়েই মে মাসে তিনি মহাজাতি সদনে আলমগীরের চরিত্রে রূপদান করলেন ও তার দুদিন পর 'রীতিমতো নাটকে' দিগম্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। মঞ্চে এই তাঁর শেষ অভিনয়। আর কিছুদিন পর, ৩০ জুন তিনি মর্ত্য থেকে বিদায় নিলেন অনন্তের উদ্দেশে। তাঁর জীবনের সমস্ত সাধনা, স্মৃতি এক অবিনশ্বর সংকেতের মতোই প্রোজ্জ্বল হয়ে থেকে গেল বাংলার নাট্যজগতেরমধ্যযুগে, যা রবীন্দ্রোত্তর পরবর্তীকালে বাংলা রঙ্গালয়ে এক স্বর্ণযুগ বললে অত্যুক্তি হয় না। ।

নীলনদে দুর্গোৎসব

প্রভাত ভট্টাচার্য

বাংলা তো বটেই , ভারতের অন্যান্য অংশে , বাংলাদেশে এবং আমেরিকা, ব্রিটেন সহ পৃথিবীর অন্য কিছু দেশে দুর্গোৎসব পালিত হয়। কিন্তু মিশরে দুর্গোৎসবের কথা সেভাবে শোনা যায় না, তাও আবার নীলনদের বুকে।

এবারে ঠিক হল পুজোর সময় মিশর বা ইজিপ্টে যাওয়া হবে। নীলাঞ্জন , বিদিশা আর তাদের মেয়ে বৃষ্টি, তিনজনেই খুব খুশি। পিরামিড, মমি সব দেখা হবে। এক বিখ্যাত ভ্রমণসংস্থার সঙ্গে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

পনচমীর দিন ওরা রওনা দিল কাতার এয়ারলাইন্সের বিমানে। মাঝখানে বিরতি ছিল কাতারে। কায়রো এয়ারপোর্টে নামার পরে ট্যুর ম্যানেজার দীপক সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে নিয়ে চলল এয়ারপোর্টের বাইরে, যেখানে তাদের জন্য বাস অপেক্ষা করছিল । তাইতে চড়ে সবাই চলল হোটেলের দিকে।

হোটেলটা খুব সুন্দর। সন্ধেবেলায় যাওয়া হল লাইট এন্ড সাউন্ড শো

দেখতে। বেশ ভালো লাগল সবার। শোনা হল প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সম্পর্কে, যা দেখানো হল আলোর জাদুতে। তারপর একটা ভারতীয় রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে হোটেলে ফিরে একেবারে ঘুমের দেশে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে যাওয়া হল আলেকজান্দ্রিয়া দেখতে। এই শহরের নামকরণ হয়েছিল বিখ্যাত গ্রিক সম্রাট আঙ্গ লেকজান্ডারের নামে। একসময় মিশর ছিল গ্রিক শাসনে, সেই প্রভাব খানিকটা এখনও রয়ে গেছে ।

আলেকজান্দ্রিয়ায় দেখা হল ক্যাটাকম্বস ,পম্পেই'স পিলার, ন্যাশনাল মিউজিয়াম। ক্যাটাকম্বস ছিল সাধারণ মানুষদের সমাধিস্থল ।সন্ধেবেলায় দেখা হল মনতাজা প্যালেস ও গার্ডেন ।

পরদিন দেখা হল মিশরের সেই বিখ্যাত পিরামিড। সবচেয়ে বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ পিরামিডগুলি হল গিজার গ্রেট পিরামিডগুলি । এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল দ্য গ্রেট পিরামিড অফ খুফু। আর দুটি পিরামিড তৈরি হয়েছিল ফ্যারাও খাফরা ও মাইসেরিনাসের জন্য।

কি মজা, আমরা পিরামিডের সামনে! বলে উঠল বৃষ্টি।

চক্ষু সার্থক হল। বিদিশা বলল।

সত্যিই তাই। বলল নীলাঞ্জন।

খুফুর পিরামিডের ভেতরে ঢোকা হল। কিছুই নেই সেখানে। অনেক জিনিস চুরি হয়ে গিয়েছে আর কিছু আছে কায়রোর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে ।

স্ফিংক্সও দেখা হল ,যার শরীর সিংহের কিন্তু মুখটা মানুষের মতো। এটি বসানো হয়েছিল ফ্যারাও খাফরার পিরামিডের সামনে এবং মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে এর রহস্যময় ক্ষমতা আছে।

এরপর প্যাপাইরাস ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখা হল প্রচুর প্রাচীন মিশরীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন এবং মিশরের বিখ্যাত মমি, যার মধ্যে রয়েছে রামেসিস টু, হাটসেপসুট প্রভৃতির মমি।

সত্যিই, দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, কতদিন আগের জিনিস, এখনও অনেকটাই অবিকৃত রয়েছে। বললেন অমলবাবু। তিনি ওদের সঙ্গেই ঘুরছেন ।

সেদিন রাতেই ট্রেনে চেপে যাওয়া হল আসওয়ানে । সেখানে দেখা হল হাই ড্যাম , টেম্পল অফ ফিলা এবং অসমাপ্ত ওবেলিস্ক ।

ওবেলিস্ক হল সূর্যের এক পবিত্র প্রতীক, যা আসলে পাথরের তৈরি এক স্তম্ভ , যা ওপরদিকে ক্রমশ সরু হয়ে গিয়েছে। মিশরীয় রাজারা কোনো যুদ্ধ জয়ের পরে ওবেলিস্ক স্থাপন করতেন। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল এক বিজয়স্তম্ভ ।

এরপরে জলপথে যাওয়া হল নুবিয়ান ভিলেজে, যা হল এক প্রাকৃতিক গ্রাম । নুবিয়ানরা হল এক প্রাচীন উপজাতি , যারা থাকত মিশরের দক্ষিণ দিকে।

জায়গাটা ভীষণ সুন্দর। বলল বিদিশা।

পরদিন ভোরবেলায় যাওয়া হল সুদান সীমান্তে, আবু সিম্বেল মন্দির দেখতে।

মরুভূমির মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল মন্দির। আসলে দুটো মন্দির রয়েছে - বড়ো মন্দিরটি রামেসিস টু এর জন্য, যার সামনে তাঁর চারটি বিশাল মূর্তি রয়েছে। ছোটো মন্দিরটি তাঁর রানি নেফারতিতির জন্য এবং এর সামনে রয়েছে রামেসিস ও নেফারতিতির মূর্তি।

আসাধারণ ! বলে উঠল নীলাঞ্জন।

এবারে সোজা চলে যাওয়া হল ক্রুজশিপে ,যা ওদের নীলনদের বুকে ঘোরাবে তিনদিন ধরে।

দারুনভাবে সাজানো জাহাজ - এক সুন্দর বিলাসবহুল হোটেলের মতো।

জাহাজ চলতে শুরু করল একটু পরেই । ঘরে গিয়ে গুছিয়ে বসল ওরা। জানলা দিয়ে দেখা যায় নীলনদ। মিশরের সেই বিখ্যাত নদী।

বইতে পড়েছি নীলনদের কথা। কী সুন্দর! বলে উঠল বৃষ্টি।

ভাবাই যায় না, ভেসে বেড়াচ্ছি নীলনদের বুকে। বিদিশা বলল।

সন্ধেবেলায় নীচে যাওয়া হল। দেশবিদেশের প্রচুর পর্যটক রয়েছেন এখানে। মিশর তো ঘোরার জন্য এক অতি আকর্ষণীয় জায়গা।

ওদের গ্রুপের আরো লোকজন রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন অর্পণ গাঙ্গুলি নামে একজন প্রফেসর, বেশ হাসিখুশি আর মিশুকে। তাঁকে বিদিশা বলল - আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না ?

কী কাজ?

এখন তো দুর্গাপূজোর সময়, আমরা যদি এখানে মহিষাসুরমর্দিনী পালা করি সবাই মিলে।

দারুণ হবে।

দুর্দান্ত আইডিয়া। আমি ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আপনাকেই দুর্গা হতে হবে। বিদিশাকে বলল দীপক।

তাহলে আমি নিশ্চয়ই অসুর। বলে উঠল নীলাঞ্জন।

হেসে উঠল সবাই।

দীপক সব ব্যবস্থা করে দিল। শুরু হল মহিষাসুরমর্দিনী পালা। বিদিশা দুর্গা, নীলাঞ্জন অসুর, বাকিরা সব দেবদেবী। কেউ বা থালা চামচ বাজাতে লাগল, কেউ টেবিলের ওপরে তবলার মতো আওয়াজ তুলতে লাগল। বেশ জমে গেল ব্যাপারটা । বিদিশা কলেজে নাটকে অংশগ্রহণ করেছে আগে, দুর্গা সাজার অভিজ্ঞতা আছে তার।

উৎসাহী দর্শক জমে গেল প্রচুর - দেশি বিদেশি। সবাই বেশ উপভোগ করতে লাগল। ছবিও উঠতে লাগল।

নীলনদের বুকে জমে উঠল দুর্গোৎসব ।

টানাপোড়েন

সুস্মিতা দেবনাথ

উত্তরের জানালা খুলে দিল অশেষ। সঙ্গে সঙ্গেই দমকা বাতাসের ঝাপটা লাগল চোখে মুখে। বাতাসের আশ্চর্য রকমের একটা সম্মোহনী ক্ষমতা আছে।মুহূর্তে সকল জ্বালা-দুঃখ ভুলিয়ে শান্তির পরশ নিয়ে আসতে পারে শরীর ও মনে। অশেষেরও মনের জ্বালা মূ হুর্তে উধাও।

অশেষের নজর বাড়ির উত্তর - পূর্ব কোণে। আবছায়া, ঠিক কালো নিকষ অন্ধকার নয়। যতটুকু আলো তাতে কালো কালো রেখার সুপুরি গাছ ভালোই নজরে আসে। বাতাসে বেঁকে বেঁকে আবার মাথা তুলছে বাবার লাগানো গাছটা। গাছটি ক্রমাগত লড়াই করছে বাতাসের সঙ্গে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। অশেষের মনে হচ্ছে এই বুঝি সুপুরিগাছটি দুমড়ে মুচড়ে পড়ে যাবে। কিন্তু না অশেষের অনুমান ভুল করে দিয়ে পরক্ষণেই গাছটি আবার মাথা সোজা করে বাতাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে পড়ছে। পাশেই একটি তালগাছ,এত ঝড় তুফানেও গাছটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একই পরিস্থিতিতে দুটো গাছের অদ্ভুত এক জীবনের লড়াই।

বাবার কথা ভীষণভাবে মনে পড়ছে, 'তালগাছের মতো হবি, জানিস, তালগাছ আমাদের মনুষ্য সমাজকে নিজের জ্ঞান, দক্ষতা, বিবেক নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখায়। ন্যায় ও সত্যতে অটল থাকতে বলে অবিরত।'

এতদিন বাবার কথাটা মনে আসত না,আজ ঝড়ের সঙ্গে গাছটির অবিরত লড়াই দেখে মনে পড়ে গেল।আর মাত্র কিছু সময়, সোনালি চলে আসবে, তারপর তো লোকটার পার্থিব শরীরটাও চিরতরে হারিয়ে ছবি হয়ে দেওয়ালে ঝুলবে।

হঠাৎ উত্তরে বাতাসটা গায়ে সুচের মতো বিঁধতে শুরু করতেই জানালাটা বন্ধ করে চেয়ারটায় বসে পড়ে । এটা বাবার চেয়ার। এই চেয়ারে বসে বাবা সকাল সন্ধ্যা চা খেত, পত্রিকা পড়ত, রেডিয়ো চালিয়ে পুরানো দিনের গান শুনত।

শীতের মধ্যে কোনোকালেই বেশি রাত জাগতে ভালো লাগে না অশেষের। কিন্তু কোনো উপায় নেই। বৃষ্টি হওয়ায় আজ শীতের তীব্রতা একটু বেশিই, তবুও যেন অশেষের খারাপ লাগছিল না, শুধু বুকের ভেতরটা শোঁ শোঁ করছে।এক কাপ কফি খেতে ভীষন্ণ ইচ্ছে করছে।ঘটনাটার পর থেকে এখন অবধি এক গ্লাস জলও খাওয়া হয়নি। কিন্তু কে দেবে কফি করে?

যে কফি করে ফ্লাস্কে ভরে টেবিলে রেখে যেত সেই লোকটা পাশের ঘরে শুয়ে আছে চিরঘুমে।

কাঁদার কেউ নেই বলে বাড়িতে এখনও শোকাবহ তৈরি হয়নি। লোকজন আসবেই বা কী করে,বাইরে এখনও আবছা অন্ধকার, সঙ্গে বৃষ্টিও ঝরছে। তবুও একজন দুইজন করে পাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা আসছে, এ এমসির গাড়ি অর্থাৎ শববাহী গাড়িকেও খবর দেওয়া হয়েছে, আসবে আর কিছু সময়ের মধ্যেই। অশেষের কাকা আর বন্ধু বান্ধবরা এই বৃষ্টির মধ্যেই শেষ যাত্রার জিনিসপত্র জোগাড়ে ব্যস্ত। বাঁশ কেটে খাটিয়ার মতো বানানো হচ্ছে। বাবাকে এর মধ্যে শোয়ানো হবে। চারজন তারপর কাঁধে তুলে নিয়ে বাইরে এ এমসির গাড়িতে তুলে দেওয়া হবে। সারাজীবনের ভালো মন্দের হিসেব নাকি মরলেই হয়। মা বলতেন,মরার পর যদি চারজন লোকই না থাকে তাহলে এই জীবন রেখে কী লাভ? মরার পর যদি লোকে হা-হুতাশ না করে তাহলে এই জীবন রেখে কী লাভ? বাঁচতে হলে বাঁচার মতো বাঁচো।

সেই মা'ও নেই আজ তিনবছর। দুদিনের জ্বরে বিনা নোটিশে হঠাৎ মারা যায় । আর আজ বাবাও, সেই বটগাছটা। মাথার উপর ছাদটাও আজ খ সে পড়ল, সেই মা'র মতোই হঠাৎ করে দুপুরের খাবারের পর বিছানায় শুয়ে আর চোখ খোলেনি।

অশেষ ব্যাঙ্কে কাজ করার পাশাপাশি যুক্তিবাদী সংস্থার সভাপতি। প্রতিদিনই ব্যাঙ্ক থেকে সোজা যুক্তিবাদী অফিসে চলে যায়। সেখান থেকে বাড়িতে আসতে প্রায় দশটা বাজে। অশেষ বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, যুক্তিতে বিশ্বাসী, সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাদের সংস্থা কাজ করে চলছে।

লক্ষ্য একটাই --- আগামী প্রজন্মকে বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে নেওয়া যাওয়া।

আজ মিটিং ছিল বিভিন্ন মহকুমাগুলির সঙ্গে। তাই একটু দেরি হল আসতে।

এসেই দেখে বাবা ঘুমাচ্ছে। ভাবল হয়তো তার দেরি বলে বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু রান্নাঘরে যখন গিয়ে দেখল খাবার যেমন তেমনই রয়েছে, তখনই সন্দেহ হয়। বাবাকে ডাকতে এসে দেখে নিস্তব্ধ নীরব বাবা।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে অশেষের। বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে। পুরো বাড়িতে তারা দুজন ছাড়া তো কেউ-ই নেই। বন্ধু সুরযকে ফোন করে। তারপর অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে আসে। বাড়িতে মারা গেছে তাই চুলচেরা প্রশ্নোত্তরের পর প্রায় সকাল পাঁচটায় বাবার মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে।

বোন সোনালিকে খবর পাঠানো হয়। সে বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে দিল্লিতে থাকে। সোনালির আসতে রাত হয়ে যাবে। ততক্ষণ বাবার সঙ্গে থাকতে পারবে অশেষ।

বাবার কাছে আসে অশেষ। মনে হচ্ছে এক্ষুনি জেগে ওঠবে, আর বলবে, অশেষ, তুই এলি? হাত মুখ ধুইয়া নে, আমি কফি কইরা দিতাসি, খাইয়া একটু সময় রেস্ট কইরা তারপর আবার তুই তর সংস্থার কাজ নিয়া বইস।সারাদিন কত কাজ করস? হ্যাঁ রে বাবা তরা কি এত কাজ করস?

সারাদিন বইয়ের মধ্যে ডুইব্যা থাকস,কিতা অত পড়স।

---বাবা তুমি কি জানো আজও কত মানুষ সমাজের উল্টোপাল্টা নিয়মের জন্য মারা যায়। কত বউ বাচ্চা হবার সময় মারা যায়। জ্বর হলে, জন্ডিস হলে ডাক্তারের কাছে তারা আসে না, লতা পাতার রস খাওয়ায়। সাপে। কামড়ালে ওঝার কাছে নিয়ে যায়।এইসব কুসংস্কারের জন্য কত মানুষ যে মারা যায়,রোগে ভোগে। আমরা তাদের সচেতন করার জন্যই সংস্থা বানালাম। আমাদের সংস্থার ছেলেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সবাইকে সচেতন করছে।

--- বাহ্ আনন্দে লাফিয়ে ওঠে রজতাভ।

--খুইব ভালা! তরা ভালা কাজ করতাছস,হেদিন ও তো আমাগো গেরামের সুশীলের বউডা মারা গেইল জন্ডিস হইয়া। হেতেরে কত কইলাম হাসপাতালে লইয়া যা, হেতে শুনল না,হেতের মা নাকি কইসে পাতার রস আর হলুদ ছাড়া ভাত তরকারি খাইলেই ভালা হইয়া যাইব।কই , ভালা তো অইলোই না, পোলাডা মা হারা হইল,অত্তটুকুন একটা কচি বাচ্চা, অখন হারাদিন মা মা করে।আহারে কী কচি মুখখান! কবে দেশ স্বাধীন হইল আইজ ও মানুষ বুঝল না।

--তাদের বুঝাবার জন্যই তো আমরা কাজ করছি বাবা।তারপর ও যদি না জাগে আর কি করব?

--না না তরা ঠিক পারবি। ..আর মরতও না লোগ, জন্ডিস আর জ্বর হইলে। নে আইয়া পড় তর কফি হইয়া গেছে।

বাবার ডাকটা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ঘরের প্রতিটি জায়গায় বাবার অস্তিত্ব । মা মারা যাবার পর থেকে বাবা যে কখন মা হয়ে ওঠেছিলেন অশেষ বুঝতেই পারেনি।

অশেষ বাবার বিছানার পাশে আসে।হাঁটু গেড়ে বসে বিছানায়।, দুচোখ দিয়ে জল বেয়ে

পড়তে থাকে।

সুরজ, অজয় মাঝে মাঝে এসে কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে যায়। অশেষ আর পারে না নিজেকে মানাতে।

বাবার কম্বলটা টেনে নেয়। বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতো বাবাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।শীতল শরীরটা এতদিন তার মাথার উপর শীতল ছায়া দিয়ে আসছিল,আজ শরীরটা শীতল কিন্তু ছায়াটা আর

রইল না।অশেষ প্রাণভরে বাবার শরীরের গন্ধটা নেয়। বাবার গায়ের গন্ধটা আজ ভীষণ ভালো লাগছে।
কত দিন বাবাকে এইভাবে বুকে জড়িয়ে ধরা হয়নি। সেই স্পর্শ, সেই উত্তাপ, সেই নিরাপদ আশ্রয়, সেই আঙুলে আঙুল জড়িয়ে শৈশবে একসঙ্গে ভোরের শিশিরভেজা ঘাসে হাঁটা মানুষটির একই রকম গায়ের গন্ধ নিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত। এখনও হাতে দুপুরের মাছের তেলের গন্ধটা।
'তোমাকে কতদিন বলেছি তুমি মাছের তেল রান্না করলে ভালোভাবে হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুবে, তুমি কেন যে শোনো না বাবা।'
কতদিন সে বাবাকে এইভাবে শাসন করেছে,কতদিন বাবা তাকে শাসন করেছে।আজ সব শেষ। তাকে নিঃস্ব একলা করে দিয়ে বাবাও চলে গেল।
'বাবা তুমিও ভাবলে না আমি একা কী করে থাকব ?'
বাবা গো...
এত কান্না,এত চোখের জল কোথায় ছিল জমা?
ভোরের আলো আসার এখনও কিছুটা সময় বাকি, যে যার মতো করে ঘুমিয়ে আছে এখানে সেখানে। অশেষও বাবাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

২

'বাবা তাড়াতাড়ি করো, এখুনি বাস চলে আসবে।'
-এই এসে পড়লাম। আমি আগে বসব, ভাই পরে বসবে। সোনালি প্রায় একপ্রকার জোর করেই সাইকেলে ওঠে বসে ।
রজতাভ হাসতে হাসতে সোনালিকে সাইকেলের সামনে লাগানো ছোটো সিটে বসায়।
--তর রোজই এখানে বসতে হবে মা? মাঝে মাঝে ভাইকেও বসাইবি। মিল্লামিশ্যা চলন লাগে মা।'
---না, আমি বসব না পেছনে? দা-ভাই-ই বসুক, এই দা-ভাই তুই পেছনে বস।
---আচ্ছা ঠিক আছে আমিই বসব। বাবা ছেড়ে দাও, আমি পেছনেই বসব। আমার তো পেছনে বসতেই ভালো লাগে।
সবুজ ধানক্ষেতের সরু আল দিয়ে গ্রামের স্কুলের পথ। অশেষের বেশ ভালো লাগে বাবার বুকে দুহাত জড়িয়ে ধরে হেলতে দুলতে স্কুলে যেতে।রজতাভ ছেলে মেয়ে দুজনকে গ্রামের একটা মাত্র ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে প্রতিদিন সাইকেলে দিয়ে আসত।তারপর বাড়ি এসে সুপর্ণাকে কাজে সহযোগিতা করত,তারপর দশটায় নিজে তৈরি হয়ে অফিসে চলে যেত।স্কুল ছুটির পর সোনালি -অশেষ দুই ভাইবোনকে সুপর্ণা গিয়ে নিয়ে আসত।একটু বড়ো হবার পর সুপর্ণার আর যেতে হত না,অশেষই বোনকে নিয়ে চলে আসত।এইভাবেই তাদের ছোটো সংসার বেশ ভালোই চলছিল। গ্রামের স্কুলের প্রাথমিকের পর আর পড়ার জন্য বড় স্কুল নেই।
'জানো বাবা,আমার স্যার বলেছে ক্লাস ফাইভের পর শহরের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে।'
--সে তো দিয়নই লাগব রে বাবা, ইখানের স্কুলে কেলাস ফাইভের পরে আর পড়োন যাইত না।'
গ্রামের ইংরেজি স্কুলে পড়ে সোনালি আর অশেষ শিখে গেছে সুন্দর করে কথা বলতে। পড়াশোনায়ও ভালো। তাই রজতাভের ইচ্ছে সে তার ছেলেমেয়েদের পড়াবে। আর এর জন্য সে রাতদিন পরিশ্রম করে। সকালে নিজের জমিতে কাজ করে, দশটা পাঁচটা গ্রামের ডি এম অফিসে খাতাপত্র নেওয়া দেওয়ার কাজ করে।

সেদিন রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেলে রজতাভ ও সুপর্ণা দুজনে চিন্তা করে এই অবস্থায় কী করা যায়। শেষে একদম আঙ্গ কস্মিকভাবেই রজতাভ বলে, 'আর কয়টা দিন পরেই পোলাডার পরীক্ষার ফল দেবে, গেরামের এই স্কুলে তো আর পড়ান যাইত না, অখন হে রে বড়ো স্কুলে ভর্তি করাইতে হইব। সুপর্ণা তুমি বাবুরে নিইয়া শহরে চইলা যাইও। আমি মাইয়াডারে লইয়া ইখানে থাকুম। ফাইভের পরে আমাগো জমির ঋণ ও শেষ হইয়া যাইব, তখন মাইয়াডারে ও বাবুর লগে ইক স্কুলে ভর্তি করাইয়া দিমু। দরকার পরলে একটুকরা জমি বেইচা দেমু।
---ইডা কিতা কথা কইলে তুমি ?সারাদিন তুমি থাকবে অফিসে আর মাইয়াডা একলা বাড়িতে থাকব, এটা কি হয়? তার চেয়ে মাইডারেও দেখো বাবুর লগে ভর্তি করান যায় কিনা?
-তুমি যে কিতা কও ? আমি একলা কেমনে পারুম শহরের স্কুলে দুইডারে পড়াতে?স্কুলের বেতন, ভাড়া বাড়ির টাকা কই পামু?
--সব হইয়া যাইব ,অত চিইন্তা কইরো না।তুমি বেডা মানুষ একলা যিখানে রাইত ইকানে কাইত। তাই মাইডারে আমার লগে লইয়া গেলে তোমারও টেনশন কম হইব।

অনেকটা রিস্ক নিয়ে সোনালি আর অশেষকে শহরের স্কুলে ভর্তি করায় রজতাভ। অশেষ যেতে চায়নি রজতাভকে ফেলে। তার এক কথা,আমি বাবাকে ছেড়ে যাব না।আমি বাবাকে ছাড়া কী করে ঘুমাব ?
অশেষের অবুঝ মন হেরে যায় ভবিষ্যৎ-এর কাছে। বাবার স্নিগ্ধ আদর, মিষ্টি প্রশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় সোনালি আর অশেষ। একটা সংসার ভাগ হয়ে যায় দুটোতে। খরচ বাড়ে, আয় কমে, তবে পরিশ্রম বাড়তে থাকে রজতাভর। হার মানে না রজতাভ। দিন রাত পরিশ্রম করে দুটো ছেলে মেয়ের জন্য। নিজে আধপেটা খেয়ে গ্রামের তাজা সতেজ ফল সবজি শহরে ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে আসে। সোনালি এম এস সি পাস করে। অশেষ ব্যাঙ্কের চাকরিতে জয়েন করে। সময়টা ধীরে নয় আচমকাই ঘুরে যায়। গ্রামের বাড়ি বিক্রি করে শহরের ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দা রজতাভের সংসারে আর কোনো অভাব নেই।
তবে বাবাকে জড়িয়ে ধরে আর ঘুমানো হয়নি অশেষের, অথচ কতদিন ইচ্ছে হয়েছিল বাবার গলা জড়িয়ে ঘুমাতে, বাবার সঙ্গে ধানক্ষেতের আল ধরে হেঁটে যেতে, বৃষ্টির দিনে ক্ষেতের জমা জলে মাছ ধরতে। বাবা কি সুন্দর ছোট কনুই জাল দিয়ে মাছ ধরত, আর অশেষ একটা বালতি নিয়ে পেছনে পেছনে ছুটত।

শহরে আসার পর বাবার সঙ্গে আর পূজা দেখা হয়নি। অথচ গ্রামে বিকেল হলেই নতুন জামা পরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ত বাবার সঙ্গে পূজা দেখতে।
শহরে আসার পর বাবা আসত মাসে একবার। প্রথম প্রথম বাবা এলে বাবার সঙ্গে খাওয়া, ঘুম, চললেও যেদিন থেকে অশেষ বুঝতে পারল বাবা শুধু তাদের নয়, মা'রও প্রয়োজন বাবাকে।

সেদিন থেকে বাবার সঙ্গে এক সঙ্গে খাওয়া চললেও ঘুমাবার বায়না করত না ।
মা চলে যায় একদিন। অশেষও ততদিনে অনেক বড়ো। নিজের একটা পারসোনাল স্পেস হয়ে যাওয়াতে আর ঘুমানো হল না বাবার সঙ্গে।

---অশেষ, এই অশেষ ওঠ, সোনালি চলে এসেছে। মেসোকে এখন নিয়ে যেতে হবে। এমনিতে অনেকক্ষণ হয়ে গেল।
পাশ থেকে কেউ একজন বলল ,বাসি মরা , আর দেরি করা যাবে না।
-- প্রায় দুদিন হয়ে গেল।
-- হায়রে , আজ মরলে কাল দু'দিন ।
-- সোনালি এখন কই থাকবে, মেয়ে তো বাবার বাড়ি থাকতে পারবে না।
--- মেয়েরা তিনদিনে জলদান করবে।
---মেয়েরা তিল দান করে খ
---আহারে ছেলেটার কি হবে, বড়ো একা হয়ে গেল।
পরস্পরের কথাগুলো শেলের মতো বিঁধছিল অশেষের শরীরে।
বাবার পেট থেকে হাতটা সরিয়ে ওঠে বসে অশেষ। বুকটা ফেটে যাচ্ছে। তবুও শুভাকাঙ্খীদের মুখ ফুটে বলতে পারছে না। সোনালি আমার সঙ্গেই থাকবে, তার নিজের বাড়িতে। কোনো শাস্ত্রে এইসব লেখা নেই যে বাবাকে দাহ করার পর মেয়ে থাকতে পারবে না।
কিন্তু পারল না বলতে।কোথায় যেন একটা বাধা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। সে মুখ খুলতে পারছে না। তার চোখের সামনে নিয়ম কানুনের নামে বাবার মৃতদেহে মুখাগ্নি করল অশেষ, বোনকে অশেষের বন্ধু জয়েশের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল। একা বিধ্বস্ত অশেষ বাড়ি ফিরে এল। কাকা, জেঠুরা মাটিতে খড় বিছিয়ে বিছানা করে দিল।বলল আগামী তেরোদিন শুধু ফল সাগু খেয়ে থাকতে হবে।দুদিন শুধু জাউভাত রান্না করে খেতে পারবে।
এর অন্যথা হলে বাবার আত্মা কষ্ট পাবে।তাঁর অমঙ্গল হবে।
অশেষ যে যা বলল সব চুপচাপ মানতে লাগল।অশেষ জানে না কেন সে এত ত্যাগ কষ্ট করছে।বাবার জন্য না তাঁর আগামী জীবনে ভালো থাকার জন্য?

তবে তার বুকের ভেতর একটা ঝড় বয়ে যেতে থাকল। তার যুক্তিবাদী মন কিছুতেই এই লৌকিক সংস্কার মানতে পারছিল না আবার অন্যদিকে সামাজিক রীতিনীতিকেও সে অবহেলা করতে পারছিল না। তার আপাত সফল জীবন সরণিতে বার বার ফিরে ফিরে আসছে অনিঃশেষ এক শূন্যতার অনুভূতি। সম্পর্কের এক একটা টানাপোড়েন উঁচু উঁচু ইট পাথরের দালান কোঠায় হয়তো নীরবে, নিভৃতে কাঁদছে, বিড়ম্বিত জীবন থেকে পালানোর পথ খুঁজছে।পথ কোথায়?
অশেষ খুঁজছে এক টুকরো আলো যা তাকে এই অন্ধকার থেকে বের করে দাঁড় করাবে এক অনাবিষ্কৃত আলোকিত পৃথিবীতে।
অস্থির চঞ্চল অশেষ কোনো কিছুই ঠিক মতো করতে পারছে না।এটা কি নিয়ম? সাতসকালে ফল কেটে বাবাকে রাস্তার মাথায় দিয়ে বলতে হয়,আসো বাবা আসো খেয়ে যাও।ওফ্‌ফ, অশেষ আর নিতে পারছে না।
সমাজের কথা শুনবে ও না মনের কথা?এই দুইয়ের টানাপোড়েনে পড়ে অশেষ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে কোন পথে যাবে। এই সময়ে যাকে তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তিনিই আজ অনেক দূরে, ধরাছোঁয়ার বাইরে।সব সমস্যার সমাধান সোনালি করে দিল।
সোনালি তিনদিনের কাজ শেষ করে অশেষের কাছে আসে।

দেখ দাদা তুই এইসব কেন তোর মনের বিরুদ্ধে করছিস?
কী করব বল? সবাই বলছে মাটিতে ঘুমাতে হবে,ফল সাগু খেতে হবে। কিন্তু দাদা তুই তো ভাত ছাড়া থাকতে পারিস না।ফল তুই পছন্দ করিস না,তারমানে এই তিনদিন তুই কিছুই খাসনি?
একটা দুটো কলা আর জল।
দাদা তুই তো অসুস্থ হয়ে পড়বি।এমনভাবে না খেয়ে থাকলে?তুই নিজে একজন যুক্তিবাদী হয়ে শেষে তুইও এইসব নিয়মকানুনগুলো মানিস? বাবা কি বলেছে তোকে না খেয়ে এইসব নিয়মগুলো মানতে? বাবা পড়াশোনা না জানলেও এইসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন।
জানি তো বোন, বাবা আমাদের কাজের খুব প্রশংসা করতেন।
তাহলে তুই কেন এইসব ফালতু নিয়মের চক্করে পড়ে নিজের শরীর আর মনকে কষ্ট দিচ্ছিস? বাবাকে তো তুই কোনো অযত্ন করিসনি, তাহলে এখন এইসব কাজ করে বাবার মনে কষ্ট দিচ্ছিস দাদা?
-তাহলে কী করব তুই বল খ
তুই বলে দে সবাইকে, আর বলতেও হবে না, তুই তোর মতো চল, কাউকে কিছু বলতে হবে না। আমাদের ভালোটা কি অন্যেরা বলে দেবে নাকি? না আমরা অসুস্থ হলে তারা কষ্ট পাবে? আমরাই তো পাব ,তাহলে আমরা কেন অযথা নিয়মের বেড়াজালে পড়ে সকল কাজ কর্ম বিসর্জন দিয়ে দুঃখপ্রকাশ করব ?
আজই আমরা সোনাঝুরি গ্রামে যাব ,সেখানকার লোকেরা পুষ্টিকর খাবারের ও পানীয় জলের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে,সেখানে ক্যাম্প করব,তাদের সচেতন করব , সঙ্গে তাদেরকে দুদিন ভরপেট খাওয়াব।
কী বলিস যাবি তো?
দাদা বাবার কথা মনে আছে তোর,বাবা বলতেন,সত্যের পথ সহজ নয়,তা জয় করতে হয় অনিঃশেষ কষ্ট দুঃখের মধ্যে দিয়ে।
--সব মনে আছে। কিন্তু বাস্তব যে জ্বলন্ত, বড়ো কঠিন।
--সেই কঠিনকে সহজ বানাবার জন্যই তো তোদের পথ চলা,তা মাঝপথে তো থামানো যাবে না। তুইই প্রথম আমাদের চারপাশে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রীতিনীতির নামে মিথ্যা সংস্কার বিরুদ্ধ রুখে দাঁড়া, তারপর দেখবি আরো অনেক আসবে। একজন না একজনকে তো শুরু করতে হবে দাদা,তোর থেকেই হোক এটার শুরু।
--ঠিক বলেছিস। আমিই শুরু করব।

অশেষ সোনালিকে অবাক চোখে দেখে। তার ছোটবোনটি অনেক বড়ো হয়ে গেছে । ভোরের সূর্যের মতো নরম আলো অশেষের মনে শরীরে স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দিল।আর কোনো দ্বিধা শংকা ভয় নেই।

সাহিত্য মরে ‘না’ পুজোসংখ্যার চাপে

তরুণ চক্রবর্তী

ফ্যানডোমিক। একটি শব্দ। শব্দটি আমায় ভাবায়। দারুনভাবে ভাবায়। আমি জানি না এই শব্দের ডিকশনারিগত কোনো অর্থ আছে কিনা। তবু ভাবায়। ধরে নিই, ফ্যানডোমিক শব্দের অর্থ ফ্যান বা ভক্তদের উন্মাদনা। সেলেবদের নিয়ে পাগলামি। পাগলামিটা প্রিয়জনেদের নিয়েও। আমরা সকলেই সেই দিক থেকে ফ্যানডোমিক নই কি ! প্রজন্মের পর প্রজন্ম, কমবেশি ফ্যানডোমিকের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। এই ফ্যানডোমিক শব্দটি আমার কপালে জুটেছে পুজো সংখ্যার হাত ধরে।

পুজো মানেই সেই কৈশোর থেকেই পুজো সংখ্যা। পুজোর গান। পুজোর বেড়ানোও। সঙ্গে অবশ্যই নিখাদ আড্ডা। বহুকাল ধরেই বঙ্গ জীবনের অঙ্গ হয়ে রয়েছে শারদের এই অলস দিনগুলিতে একটু অন্যরকমভাবে জীবন ও যাপন। শুধু ধর্মীয় উন্মাদনা নয়, সঙ্গে উৎসব। সেই উৎসবেও বড়ো জায়গা জুড়ে

থাকে ফ্যানডোমিকের প্রকোপ। পরনিন্দা বা পরচর্চার বাইরেও সেলেবদের নিয়ে বাঙালির উচ্ছাস বা পাগলামো বোধহয় সাদা মানুষদের সঙ্গেও টেক্কা দিতে পারে। ওলিম্পিকে পদকও নিশ্চিত ছিল এই পাগলামির হাত ধরে। বাঙালির ম্যাটিনি আইডল উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন থেকে শুরু করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে। প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা থেকে সৌরভ-সুনীল ছেত্র, তালিকাটা বেশ বড়। আরও বড় তাঁদের নিয়ে বাঙালির পাগলামো। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল তো আছেই, ইলিশ আর চিংড়ির মধ্যেও রয়েছে একঝাঁক তারকা-বিলাস। তাই ফ্যানডোমিকের প্রভাব বাঙালির সমাজজীবনে নতুন কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায় থেকে ঋত্বিক ঘটক, বাঙালি পাগল ব্যক্তি পুজোয়। তাই তো ভীড় উপচে পড়ে বিগ-বি অমিতাভ বচ্চন বাংলায় পা দিলে, একই ভীড় কিং খান শাহরুখকে ঘিরেও। তাঁদের নিয়ে এই উচ্ছাসের নামই বোধহয় ফ্যানডোমিক।

ফ্যানডোমিক শব্দটি আমার কাছে মাত্র দুবছরের পুরনো। হঠাৎ করে পাওয়া। পুজো সংখ্যা পড়ার নিয়মিত অভ্যাস গত হয়েছে বেশ কয়েক বছর। কবির সুমনের গানের কলি শুনে নয়, সময় ও সুযোগ দুটোই অজুহাত। সঙ্গে অবশ্যই পুজো সংখ্যার চেহারা। এতো ভারী একটি বই এখন, বার্ধক্যের দৌড়গোরায় দাঁড়িয়ে পড়তে কষ্ট হতো। সেইভারী বইয়ের বোঝা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে, প্যানডোমিকের অলস জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে পুজো সংখ্যা পড়ার পুরনো অভ্যাস। তখনই পরিচিত হলাম নতুন শব্দ, ফ্যানডোমিক-এর সঙ্গে। মনে গেঁথে গিয়েছে শব্দটি। কেন? জানি না। উচ্ছসিত শব্দটির ব্যবহারে। ফ্যানডোমিক শব্দটিরও আমি একজন ফ্যানডোমিক হয়ে উঠেছি।

তখন 'প্যানডোমিক' চারিদিকে। ঘরবন্দি। অতিমারির শাসনে লন্ডভন্ড স্বাভাবিক জীবন এবং যাপন। সেই সময়ই হাতে পেলাম এই নতুন শব্দ 'ফ্যানডোমিক'। সৌজন্যে আজকাল-এর পুজো সংখ্যা। লেখিকা মৌ রায়চৌধুরি। তখনও ভালো করে আলাপ ছিলো না তাঁর সঙ্গে। তবু গোগ্রাসে গিললাম সেই লেখা। প্যানডোমিক-এ নাকাল মানুষদের সামনে উঠে এলো ফ্যানডোমিক-এর নিখাদ উচ্ছাস। মৌ লিখলেন সাবলিল ভাবেই নিজের জীবনের গল্পো। তুলে ধরলেন সেলেবদের নিয়ে তাঁর সেই অতি ভালোবাসার বর্ণময় ছবি। তাঁর লেখায় ভর করে কৈশোরে ফেলে আসা নিজের রঙিন দিনগুলিও উঠে এলো। চোখের সামনে ভেসে উঠল সাত বা আটের দশকে সেলেবদের নিয়ে সেই উন্মাদনা। ধরা রইলো তারকাদের নিয়ে বাঙালির উন্মাদনার দিনলিপি। মিঠুন চক্রবর্তী বা মান্না দেকে ঘিরে এক কিশোরীর উন্মাদনা বা পরিণত বয়সেও মারাদোনাকে ঘিরে বাঁধভাঙা আবেগের উচ্ছাস আমাকে মোহিত করে। মৌ রায়চৌধুরির চোখ দিয়ে দেখতে সেখায় অতীত, আবেগের তো কোনও অভিধান নেই!

এই মৌ রায়চৌধুরীর হাত ধরেই আজকাল-এর পুজো সংখ্যা আরও

আধুনিক হয়ে উঠেছিল। আজকাল পুজো সংখ্যার পাশাপাশি তাঁর লেখার প্রতিও বাড়তে থাকে টান। তাঁর সঙ্গেও অল্পবিস্তর পরিচয়ের সুযোগ পাই। কিন্তু সেটা খুবই সামান্য সময়ের জন্য। কারণ কয়েকটি মাত্র মন ভালো লেখা উপহার দিয়েই অকালে চলে যান তিনি। জানতে পারি, বারবার মৃত্যুকে বুড়ো আঙুল দেখানো মৌ রায়চৌধুরীর ব্যক্তিজীবনও ছিল ফ্যানডোমিকে ভরা। মানুষ ভালবাসতেন তিনি। সেই ভালোবাসাই তো তাঁকে ফ্যানডোমিক-এ আক্রান্ত করেছিল। ফ্যানদের পাগলামির নামই তো ফ্যানডোমিক! বলতে দ্বিধা নেই, পুজো সংখ্যায় তাঁর লেখাই আমাকে মৌ রায়চৌধুরীর প্রতি ফ্যানডোমিক করে তুলেছিল। ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। জানি না সাহিত্য হিসাবে সেইসব লেখা কালের গর্ভে আদৌ স্থান পাবে কিনা। সেটা বিচার করা লেখক বা লেখি কার কাজ নয়। পাঠকেরও সেই দায় নেই। কিন্তু সেই পুজো সংখ্যা আমাকে ফের ফ্যানডোমিক হতে সাহায্য করেছিল। আজও শরতের মেঘ-রোদ্দুরের দোলাটান ডাক দেয় নতুন কিছু পড়ার। খবর নয়, অন্য কিছু।

ফ্যানডোমিকের মায়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে যাই শুরুর সেই গানের কলিতে। মাথার ভিতর পাক খাচ্ছে একঝাঁক প্রশ্ন, সাহিত্য কি মরে? সত্যিই কি সাহিত্যের মৃত্যু হয়? কঠিন প্রশ্ন। সেই প্রশ্নও বহুদিন ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। কানে বাজছে, সুমন চট্টোপাধ্যায়, পরবর্তীতে কবির সুমনের 'সাহিত্য মরে পুজো সংখ্যার চাপে...'।

ইদানিং কালেও বেশকিছু ভালো লেখা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তার বেশ কয়েকটিই পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত। সেই লেখাগুলিও কিন্তু আমাকে আগের মতোই আনন্দ দিয়েছে। ভাবিয়ে তুলেছে চেতনাকে। নবীন ও প্রবীণ সকলের লেখাই বেশ সাবলীল মনে হয়েছে। কালের গর্ভে কে টিকবে আর কে টিকবে না, সেটা বিচারের ভার এই অধমের নয়। আমার যেটা ভালো লাগে সেটা অন্যের নাও লাগতে পারে। পুজো সংখ্যাতেই তো বহু কালজয়ী লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বাস করি, আজও হয়। চাপ থাকার সঙ্গে ভালো সাহিত্যের কোনও সংঘাত আছে বলেও বিশ্বাস করি না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বড় প্রমাণ। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তিনি নিজেকে যেভাবে ব্যস্ত রাখতেন সেটাও কম চাপের ছিলো না। প্রতিনিয়তই তিনি রচনা করতেন কবিতা, গান, নাটক, গল্প বা উপন্যাস। পাশাপাশি রং-তুলিতে ক্যানভাস ভরাতেন নিজের চেতনায়। সেই ধারাই তো ধরা পড়ে সমরেশ বসু বা হুমায়ুন আহমেদদের অগণিত সৃষ্টিতে। সাহিত্যের মৃত্যু নেই। কালের গর্ভে ঠাঁই পাবে কিনা সেটাও মোটেই বিচার্য নয় সাহিত্যস্রস্টার। মানুষের মনে দাগ কতোটা গভীর হতে পারে সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। তার দায়ও সাহিত্য-স্রস্টার নয়। দায় নয় পুজো সংখ্যারও। তাই সদর্পে এগিয়ে চলেছে পুজো সংখ্যা। আজও মানুষ খুঁজে নিচ্ছেন নিজেদের মননের পুষ্টি। কখনও মেলে, কখনও মেলে না। মিললে ভালো। না মিললেও ক্ষতি নেই। 'পদ্যের দায় নেই হিসেব দেবারখ!'

ইদানিং কলকাতায় যেমন দুর্গা পুজো পঞ্জিকায় বর্ণিত নির্ঘণ্টের অনেক আগেই শুরু হয়, তেমনি পুজো সংখ্যার প্রকাশেরও আশ্বিনের জন্য প্রতিক্ষা করার পাঠ বহু আগেই শেষ করে দিয়েছে। এপারে পুজো, আর ওপারে ঈদ সংখ্যার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সংখ্যার পাশাপাশি বাড়ছে ওজনও। এখন আবার ই-পুজো বা ই-ঈদ সংখ্যাও দুর্লভ নয়। নতুন নতুন লেখায় ভর করে দুই বাংলাতেই সাহিত্য চর্চার নতুন জোয়ার লক্ষ্য করা যায়। প্রযুক্তি তাতে অন্য চেহারা দিয়েছে।

ডিজিটালিও পাঠক, দর্শক ও শ্রোতা তৈরি হয়েছেন। ফলে সৃষ্টি ঠিক খুঁজে পাচ্ছে তার গন্তব্য, এটাই বড় বিষয়।

বাংলা সাহিত্যচর্চার এখন ভরকেন্দ্র বোধহয় পুজোসংখ্যা বা ঈদ সংখ্যাই। বইমেলা দুই বাংলার সাহিত্যপ্রেমীদের প্রাণের উৎসব হলেও পুজো বা ঈদকে কেন্দ্র করে উৎসব সংখ্যায় লেখা ও পড়ার আলাদা মাদকতা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কাজি নজরুল ইসলামের মতো লেখকরাও নিয়মিত পুজো বা ঈদ সংখ্যায় লিখতেন। এখনকার নামী লেখকদেরও সমান আগ্রহ চোখে পড়ে। দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে হাজার পাঁচেক পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি বারোয়ারি পুজো কমিটিই প্রকাশ করে তাঁদের 'সুভেনির'। বিজ্ঞাপন সেখানে মূল লক্ষ্য হলেও প্রচুর ভালো লেখা পাওয়া যায় সেখানেও। বেশ কয়েকটি শারদ-সংখ্যা বেশ চিত্তাকর্ষকও। মফঃশ্বলও এবিষয়ে পিছিয়ে নেই। এছাড়া বাংলার লিটল ম্যাগাজিনেও দুর্গাপুজো বা শরৎ বন্দনার উচ্ছাস ধরা পড়ে। সবমিলিয়ে পুজো সংখ্যার প্রকাশ এবং প্রসার বেড়েছে। বেড়েছে এই ধরনের উদ্যোগের হাত ধরে সাহিত্যচর্চাও।

বাংলায় পুজো সংখ্যার যাত্রা শুরু ১২৭৯ বঙ্গাব্দ বা ১৮৭২ সালে। কেশবচন্দ্র সেনের হাত ধরে 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা বার করে বাংলার প্রথম পুজো সংখ্যা 'ছুটির সুলভ'। এরপর একে একেসাধনা, ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী, আনন্দবাজার প্রভৃতি আত্মপ্রকাশ করে পুজো সংখ্যার প্রকাশক হিসাবে। আঃ নন্দবাজার পত্রিকাব১৯২৬ সালে প্রথম শারদীয় সংখ্যা বের করে ।প্রথম শারদ উপন্যাস ছাপা হয় শারদীয় বসুমতীত ।মুদ্রণ শিল্পের অগ্রগতির হাত ধরে পুজো সংখ্যারও জৌলুস বাড়তে থাকে। সেইসঙ্গে বাড়তে থাকে প্রকাশকও। শুধু কলকাতাই নয়, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাঙালিরা পুজো সংখ্যা প্রকাশ করেন। সময়ের বিচারে বহু কালজয়ী লেখার জন্ম দিয়েছে পুজো সংখ্যা। বলা ভালো, আজও দিয়ে চলেছে।

পুজো সংখ্যার বয়সের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে ঈদ সংখ্যা। বাংলাদেশের সাংবাদিক ও গবেষক সামসুদ্দোজা সাজেনের লেখা থেকে জানা যায়, ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে প্রথম প্রকাশিত ঈদ সংখ্যা 'আল্ ইসলাহ'। মাসিক আল্ ইসলাহ ছিল সিলেট থেকে প্রকাশিত সেই সময়ের একটি অন্যতম জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রকাশিত এই সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নূরুল হক। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর ঈদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মিল্লাত পত্রিকা তাদের ঈদ সংখ্যা প্রকাশ শুরু করে ১৯৪৬ সালে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও দার্শনিক আবুল হাশিম এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক কাজী মোহাম্মদ ইদরিস। ১৯৪৫ সালের ১৬ নভেম্বর

ঈদুল আজহার দিনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক মিল্লাতের যাত্রা শুরু হয়। তবে মুসলিম লীগের মুখপত্র হলেও প্রথম থেকেই বামপন্থী চিন্তাধারাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে মিল্লাত। তারপর থেকেই বাংলাদেশে সব ঈদ সংখ্যাই হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারক ও বাহক। দেশের রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের কলম গর্জে ওঠে ঈদ সংখ্যাতেও। উৎসবের দিনগুলিতেও সমাজ চেতনার ভার তুলে নেয় বাংলাদেশের প্রকাশকরা। এখন বাংলাদেশের প্রতিটি সংবাদপত্র প্রকাশনা গোষ্ঠীই ঈদ সংখ্যা প্রকাশ করেন। সেইসব সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিতদের পাশাপাশি তরুণ লেখকদের অসাধারণ সাহিত্য-সৃষ্টি ধরা পড়ে। পাঠকরাও মুখিয়ে থাকেন পুজো সংখ্যার জন্য। এপার বাংলায় যেমন আনন্দবাজার, আজকাল, বর্তমান, প্রতিদিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংবাদপত্র গোষ্ঠী প্রকাশ করে তাঁদের পুজো সংখ্যা, ওপার বাংলায় তেমনি ঈদ সংখ্যা প্রকাশ করে প্রথম আলো, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ প্রভৃতি। পুজো সংখ্যা বা ঈদ সংখ্যা নিয়ে নিন্দুকেরা যাই বলুন না কেন, এখনও পাঠকদের কাছে আকর্ষণ কিন্তু কমেনি। অনেকেই বহুদিন ধরে প্রতিক্ষায় থাকেন নামী প্রকাশনার উৎসব সংখ্যার। দাম বাড়লেও পাঠক কিনতে পিছুপা হন না। বিজ্ঞাপনদাতারাও ঢেলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন পুজো বা ঈদ সংখ্যায়। ফলে বানিজ্যিকভাবে পুজো বা ঈদ সংখ্যা বেশ সফল। দিন দিন লেখকদের পারিশ্রমিকও বাড়ছে। চাপও বাড়ছে লেখার। প্রচুর লিখতে হয় লেখকদের। এটা ঠিক। কিন্তু সেই চাপে কি সাহিত্যের অকাল মৃত্যু হচ্ছে? কঠিন প্রশ্ন। কারণ এই পুজো বা ঈদ সংখ্যা থেকেও তো উঠে আসছে কালজয়ী কবিতা কিম্বা উপন্যাস। পুজো বা ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত বহু লেখাই পরবর্তীতে বই আকাড়ে প্রকাশিত হয়ে মন কেড়েছে পাঠকের। সিনেমাও হয়েছে। ফলে কবির সুমনে 'সাহিত্য মরে পুজো সংখ্যার চাপে', কথাটি বোধহয় ঠিক নয়। এপারে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় থেকে প্রচেত গুপ্ত, ওপারে ইমদানুল হক মিলন থেকে মোস্তাফা কামাল, সকলের লেখাই আজও পাঠকের মনে দোলা দেয়। আজও জনপ্রিয়। আজও 'ফ্যানডোমিক'-এর মতো একটি শব্দ দাগ কেটে যায় পাঠক মনে। 'নিষাদ' এসে বিদ্ধ করে পাঠকের হৃদয় ।মননে উঁকি দেয় বহুকাল আগে পড়া 'কমরেড কথা কও' অথবা 'মনোরমের উপন্যাস'। সাহিত্যের আদৌ কি মৃত্যু আছে? সব সাহিত্যই কি তাহলে অমর? 'প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা'!

থ্রিলার

কান্তার মরু

কাজী আনোয়ার হোসেন

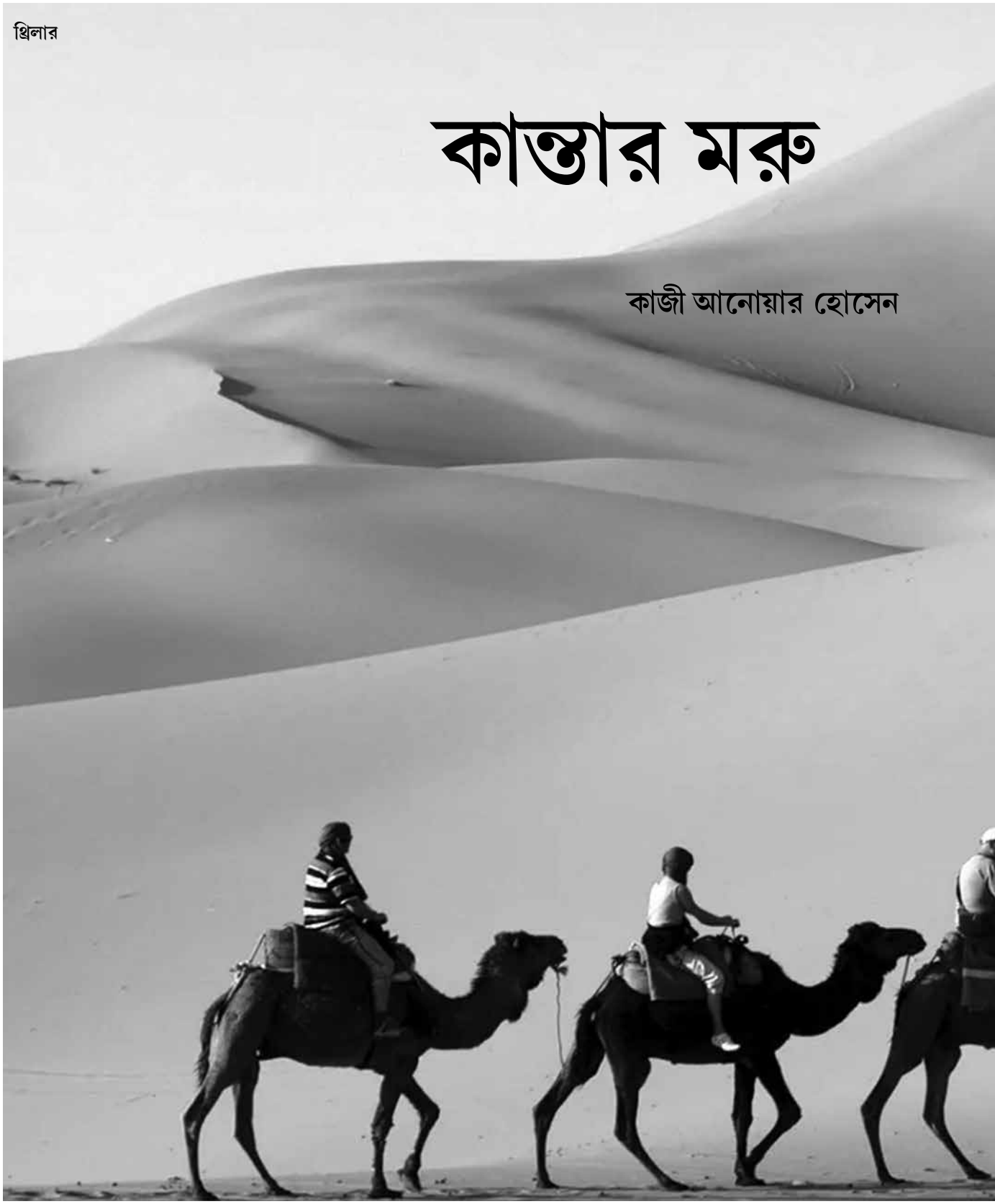

এক

বিসিআই হেডকোয়ার্টার, মতিঝিল, ঢাকা

‘এটা একটা খাপছাড়া ব্লাইন্ড মিশন, রানা, পুরোপুরি অফিশিয়ালও বলা যায় না।’ চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন রাহাত খান। সুপরিসর কামরায় বিশাল ডেস্কটার পেছনে বসে তিনি। দপদপ করে লাফাচ্ছে কপালের শিরা, ‘খবর পেয়েছি, মোট তেইশটা মিসাইল আর নিউক্লিয়ার ও অরহেড চুরি গেছে। ইথিওপিয়ায় রয়েছে এখন সেগুলো।’

‘মিসাইলগুলো কাদের, স্যার?’

‘এক কথায় বলতে গেলে সবার। আমেরিকা, রাশিয়া, মিশর, ইসরাইল, সিরিয়া এমনকি ইরাকেরও। সবচেয়ে মারাত্মক কথা, এ দেশগুলো একে অন্যকে সন্দেহ করছে। আমেরিকা মনে করছে রাশিয়া কিংবা লিবিয়া তার মিসাইল চুরি করেছে, রাশিয়া মনে করছে আমেরিকা। ইসরাইল মনে করছে মিশর আর মিশর ভাবছে ইসরাইল। ইরাক সন্দেহ করছে আমেরিকাকে । মিশর ছোট থেকে মাঝারি পাল্লার পাঁচটা মিসাইল খুইয়েছে। ইসরাইল থেকে চুরি গেছে এমনি আরও ছ'টা। আমরা জানি, এরা কেউই কারও জিনিস চুরি করেনি, অথচ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে এদের দেরি হবে না। এবং খুব শিগগিরিই ঘটবে সেটা।’

‘স্যার, চুরিটা কারা করল?’ রানা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

‘মালদিনি। রবার্তো মালদিনি। দুর্দান্ত প্রকৃতির এক অর্ধোন্মাদ। বহুদিন ধরে ওর ওপর নজর রাখছি আমরা। মিসাইলগুলো এখন ওর হাতে আছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরেক নিও-ফ্যাসিস্ট ব্রুনো কন্টি। ম্যাকলিন নামে নিজেকে পরিচয় দেয় সে ইদানীং। দুজনই ড্রাগের সঙ্গেও জড়িত। সরাসরি কিনা জানি না, তবে উৎপাদন করছে ওরা কোথাও, এটা প্রায় নিশ্চিত। অনেক দেশে যোগাযোগ করেছি, কিন্তু সাবধান করার পরও কেউ তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। অথচ আমি ব্যাপারটাকে মোটেই হালকাভাবে নিতে পারছি না, রানা। মালদিনি সারা দুনিয়ায় যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে। তোমাকে ডেকেছি আলোচনার জন্যে। কী মনে হয় তোমার? বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করছি?’

‘জ্বী, স্যার,’ দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। লক্ষ করল গম্ভীর হয়ে উঠেছে রাহাত খানের মুখের চেহারা। চট করে বলল, ‘আপনার যখন সন্দেহ হয়েছে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার। তাছাড়া, মালদিনির কিছু কিছু খোঁজ-খবর রানা এজেন্সির মাধ্যমেও জানা গেছে। আমরা জানি ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।’

‘এবার তাহলে বলা যায়,’ নড়েচড়ে বসলেন রাহাত খান। আশ্বস্ত দেখাল বুড়োকে। রানা ভাবল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে যাচ্ছে নাকি বুড়ো! ‘আগে বুঝতে হবে ওর উদ্দেশ্যটা কি। বুঝতে হলে কাউকে না কাউকে যেতে হবে ব্লাইন্ড মিশনে। তোমার কথাটাই সবার আগে মনে পড়ল আমার। বেশ কিছুদিন আফ্রিকায় ছুটি কাটিয়েছ তুমি। কাজেই ওখানকার পরিবেশ তোমার ভাল জানা থাকার কথা। যাই হোক, চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন বৃদ্ধ। ‘ও যদি জানান না দিয়ে বিভিন্ন দেশে মিসাইল ছুঁড়তে থাকে কি ঘটবে বুঝতেই পারছ। এক দেশ ঝাঁপিয়ে পড়বে আরেক দেশের ওপর। কাজেই যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে ওকে।’

ডেস্ক থেকে ‘টপ সিক্রেট’ লেখা একটা ফোল্ডার তুলে নিলেন বৃদ্ধ। পেপারগুলোয় চোখ বুলিয়ে বলতে শুরু করলেন, ‘সত্তর দশকের শেষভাগে নিও- ফ্যাসিস্ট হিসেবে ইতালিতে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল রবার্তো মালদিনি। রাজনীতি ও সংগঠন নিয়ে যতদিন ব্যস্ত ছিল তার ব্যাপারে কারও মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু পরে সে সহিংসতার পথ বেছে নেয়। ইতালিয়ান পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করার আগেই লিভর্নো থেকে দেশান্তরী হয় সে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ করে একেবারে নিখোঁজ হয়ে যায় লোকটা।’

‘স্যার, চাইনিজরা বা অন্য কোন দেশ, যেমন উত্তর কোরিয়া, ওর সাথে জড়িত নয় তো? ওদের তো মিসাইল খোয়া যায়নি।’

‘এক কথায় না বলা যাচ্ছে না, কিন্তু আমার অন্তত ধারণা---মালদিনি একাই করছে এসব।’ চুরুটের ধোঁয়ায় বুকটা ভরে নিলেন বৃদ্ধ।

‘ইথিওপিয়ার কোথায় রয়েছে ও?’

‘ডানাকিলে, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স খোঁজ বের করতে পেরেছিল ওর। কিন্তু ওই পর্যন্তই । দু’মাস আগে ওদের এজেন্ট স্রেফ উধাও হয়ে যায়।’
তডানাকিল, সে তো মরুভূমি, স্যার।’
‘ঠিক। সাইনাইয়ের মত ওটাও একটা ওয়েইস্টল্যান্ড, রানা। ইথিওপিয়ানদের ওটার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আর মালদিনি যে ওখানে ঘাঁটি গেড়েছে একথা ওরা বিশ্বাসই করতে চাইছে না। সে যাকগে, ডানাকিলের বাসিন্দারা অচেনা লোক দেখলে খুন করতে দ্বিধা করে না। ইথিওপিয়ার মানচিত্রে রয়েছে জায়গাটা, কিন্তু আমহারিক উপজাতি, যারা এখন ক্ষমতায়, ওটাকে সভ্য করে তোলার কোন উদ্যোগ আপাতত নিচ্ছে না। বড় বিশ্রী জায়গা, রানা।’
‘এখন তুমি কি বলো, রানা? ইথিওপিয়ায় যাবে একবার ? দেখবে পরিস্থিতি আদতে কতখানি ঘোলাটে?’
‘যাব, স্যার।’
‘এক বাঙালি বিজ্ঞানী আছে মালদিনির সঙ্গে ; আমার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়,’ বললেন রাহাত খান। ‘কুদরত চৌধুরী। বর্তমানে ড্রাগ অ্যাডিক্ট। ডানাকিলে যাবার পর তাকে অ্যাডিক্ট হতে বাধ্য করেছে মালদিনি। আমাকে অনেক ইনফর্মেশন যুগিয়েছে সে। তুমি গেলে তার সাহায্য পাবে।’ ফাইলটা সামনের দিকে ঠেলে দিলেন বৃদ্ধ। অর্থাৎ যেতে পারো তুমি এবার। যতটা নরম ভাবছিল ততটা বুড়ো এখনও হয়নি বুড়ো, পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা।
পরবর্তী সপ্তাহে ডানাকিল সম্পর্কে পড়াশোনা করে যা জানল তাতে মোটেও আশ্বস্ত হতে পারল না রানা। এমনকি ওর যে পরিচয় খাড়া করা হল, সেটাও ওর মনে ধরল না। আমেরিকা অভিবাসী এক বাঙালি মুসলমান সে। নাম আলী আকবর। এই পাবলিক ওঅর্কস এঞ্জিনিয়ারটিকে মার্কিন মুলুকের প্রতিটি সাবডিভিশন কালো তালিকাভুক্ত করেছে। দোষ কি তার? না, সে বেচারা ওখানে গিয়েও বাঙালিয়ানা ছাড়তে পারেনি। কন্ট্রাকটরদের কাছ থেকে দেদার ঘুষ খাওয়ার বদনাম রয়েছে লোকটার। নরওয়েজিয়ান এক ফ্রেইটারে এখন সীট বুক করেছে সে। গন্তব্য মাসাওয়া। রাস্তা নির্মাণ করতে পারে এমন লোকের দরকার পড়েছে ইথিওপিয়ায়। কাজেই ঠিক হল ওয়াশিংটন হয়ে মাসাওয়া যাচ্ছে মাসুদ রানা।
এয়ারপোর্টে ডাফল ব্যাগ ও গোপন কম্পার্টমেন্টসমৃদ্ধ তোবড়ানো সুটকেসটা খুঁজে নিল রানা। গোপন কুঠুরীতে স্থান পেয়েছে প্রচুর গোলা-গুলি ও চমৎকার এক ট্র্যাঙ্গিভার। এবার ট্যাক্সি ডাকল। রানার সস্তাদরের গুডউইল সুটটা এক নজর দেখে নিল ড্রাইভার।
’বারো ডলার হবে তোমার কাছে?’
’হ্যাঁ,’ বলল রানা। ‘কিন্তু মিটারটা ইউজ করো। নইলে প্রথমে আধমরা করব তারপর অভিযোগ দায়ের করব, বোঝা গেছে?’
রানার দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিক্ষেপ করল লোকটা। আলী আকবরের ছদ্মবেশ ছেড়ে বোধহয় বেরিয়ে আসতে চাইছে মাসুদ রানা, তবে তর্কাতর্কি করতে গেল না ড্রাইভার, নৌ-কাস্টমসে নামিয়ে দিল। বিনা বাধায় কাস্টমস্ পার হতে পারল ও। একজন ট্রাক ড্রাইভার ওকে পৌঁছে দিল ‘শেপ মাইয়ার’ জাহাজে।
কোঁকড়া, কালোচুলো স্টুয়ার্ড, ববি মুর, রানাকে দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে মনে হল না। হয়তো একটা কারণ, রাত দুটো বাজে এখন, আর নয়তো ওর বেশভূষা। কেবিনটা দেখিয়ে দেয়ায় লোকটাকে বকশিশ দিল ও ।
’ওয়ার্ডরুমে সাতটা থেকে নটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট পাবেন,’ বলল লোকটা। ‘মই দিয়ে নেমে এক নম্বর ডেকে।’
’হেড কোথায়?’
’প্যাসেঞ্জার কেবিনগুলোর সামনেই। শাওয়ারও পাবেন। দেখবেন, ভদ্রমহিলাদের ভয় পাইয়ে দেবেন না যেন ।’
লোকটা চলে গেলে কোট খুলে সুটকেসে অস্ত্রগুলো চালান করল রানা, তারপর দরজা বন্ধ করে খুদে কেবিনটা পরখ করে নিল। মেন ডেকমুখী এক পোর্টহোলের পাশে সিঙ্গল বাঙ্ক। মেন ডেকটার অবস্থান পোর্ট সাইডে। ডকটাও ওদিকে। দেখা গেল পাতলা পর্দা উজ্জ্বল আলোর প্রবেশ ঠেকাতে পারছে না । ফরোয়ার্ড বাল্কহেডে রয়েছে সিঙ্ক । সঙ্গে লাগোয়া কম্বিনেশন ক্লজিট ও চেস্ট অভ ড্রয়ার্স। সকালে মালপত্র খুলে সাজাবে সিদ্ধান্ত নিল রানা ।
বিসিআই জানিয়েছে প্যাসেঞ্জার লিস্ট আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ । তবে সময়াভাবে সেভাবে নাকি খতিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি। সাবধান থাকতে বলা হয়েছে ওকে।
সাবধান থাকতে বলা হয়েছে ভাল কথা, ভাবল রানা, কিন্তু কি থেকে কিংবা কার কাছ থেকে? বাতি নিভিয়ে বুকে হেঁটে বাঙ্কে উঠে পড়ল রানা। ঘুমটা মোটেও ভালো হল না ওর ।

দুই

যে কোন জাহাজ সাগরে ভাসানো এক ঝকমারি, কিন্তু শেপ মাইয়ার-এর ক্রুরা যেন পণ করেছে হুল্লোড় করে যাত্রীদের জ্বালিয়ে মারবে। হাতঘড়িতে নজর বোলাল রানা। সাতটা। সিদ্ধান্ত নিতে হয় এখন। স্টিলেটো সঙ্গে নেবে? আলী আকবরের কাছে ছুরি থাকলে মানাবে? মনস্থির করতে পারল না। সুটকেসের গোপন কম্পার্টমেন্টে শেষতক লুগার ও খুদে গ্যাস বোমাটাকে সঙ্গ দিতে রয়ে গেল ওটা। আজ সকালে ঘুমকাতুরে এক স্টুয়ার্ড নয়, অনেক মানুষের কৌতূহলী চোখের সামনে পড়তে হবে ওকে ।
রানা সামনে গিয়ে, হেড ব্যবহার করে, শাওয়ার নিল। তারপর কেবিনে ফিরে এসে কাপড় বাছাই করল। শেপ মাইয়ারে ফর্মালিটির কোন প্রয়োজন নেই। ফ্লানেল শার্ট, ওঅর্ক প্যান্ট আর ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট গায়ে চড়াল রানা। এবার ব্রেকফাস্টের পালা ।
ছিমছাম এক ওয়ার্ডরুম। দশ জনের মতো বসার আয়োজন, তার মানে জাহাজে যাত্রী বেশি নেই। স্টুয়ার্ড ববি মুর রানাকে জুস, স্ক্র্যাম্বলড্ এগ, বীফ ও কফি পরিবেশন করল। ওর খাওয়া প্রায় সারা এসময় বয়স্ক দম্পতিটি ঘরে প্রবেশ করলেন।
ইংরেজ এঁরা--জ্যাক ও ডেবি চার্লটন। ভদ্রলোকের একহারা গড়ন ও ফ্যাকাসে গায়ের রং দেখে কেরানি মনে হয়, এবং ছিলেনও নাকি তাই, লটারিতে বাজি মেরে দিয়ে এবং তারপর বুদ্ধি করে টাকাটা খাটিয়ে

দাঁড়িয়ে গেছেন। ভদ্রমহিলার মোটাসোটা গিন্নী-বান্নি চেহারা। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পঞ্চাশের কোঠায়, হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়াতে ভ্রমণ পিপাসু হয়ে উঠেছেন। এবং দু'জনেই বাক্যবাগীশ ।

'আপনি নরফোকের লোক, মিস্টার আকবর?' জ্যাক প্রশ্ন করলেন।

'না,' বলল রানা। 'বাংলাদেশী। ওপি ওয়ানে আমেরিকা এসেছি।'

'ও, তাই নাকি,' সুর তুললেন মিসেস চার্লটন। 'আপনাদের বাংলাদেশ সরকার কিন্তু ট্যুরিজমে মোটেও মনোযোগী নয়। দু'বছর আগে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম আমরা। কক্সবাজার, সুন্দরবন এসব জায়গা খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার প্রশংসা করতে পারছি না, দুঃখিত, আর...'

ভদ্রমহিলার বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত হওয়ার জন্যে রানাও খানিকটা দায়ী। আলী আকবর হিসেবে ওকে শুনে যেতে হবে, কিন্তু মাঝেমধ্যে হুঁ, হাঁ করা ছাড়া কথোপকথনে ওর আর কোন অংশগ্রহণ থাকবে না। আলী আকবর প্যাচাল শুনবে তার কারণ বড়লোক সহযাত্রীদের কাছ থেকে ড্রিঙ্ক খসানোর তালে থাকবে সে। এবং সম্ভব হলে ডলারও।

অবশেষে, অবশ্যম্ভাবী সেই প্রশ্নটা করলেন মিসেস। 'এই জাহাজে কেন উঠেছেন, মিস্টার আকবর?'

'ইথিওপিয়া যাচ্ছি।'

'কেন জানতে পারি?'

'কাজে। আমি একজন এঞ্জিনিয়ার। রাস্তা-ঘাট, ড্রেনেজ সিস্টেম এসব তৈরি খ'

'বাহ, খুব ইন্টারেস্টিং কাজ মনে হচ্ছে?'

'ডাল-ভাত জুটে যায় আরকি।'

রোডবিল্ডিং সম্বন্ধে বিশেষ জানার কথা নয় কেরানীর কিংবা গৃহবধূর, কাজেই চার্লটনদেরকে নিজ পরিচয় যা দিচ্ছে তা নিয়ে চিন্তা নেই রানার। ও প্লেনে করে আদ্দিস আবাবা যেতে চেয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ আমেরিকার বোমা চুরির খবর পেয়ে মত পাল্টেছেন জেনারেল। এই জাহাজে উঠতে বলেছেন রানাকে। তাছাড়া রানার কভারের সঙ্গে নাকি চমৎকার খাপ খেয়ে যায় এই সুলভ ভ্রমণ।

মিসেস চার্লটনের জেরা ও একতরফা বকবকানি মার খেয়ে গেল ওয়ার্ডরুমে ফ্রেইটারের আরেক যাত্রী প্রবেশ করতে। দরজা দিয়ে যুবতীটি ঢুকতেই রানার মনের ক্যাবিনেটে ফাইল কার্ড ওল্টানো শুরু হয়ে গেল । লম্বা, কুচকুচে কালো চুল, অপূর্ব সুন্দর দেহবল্লরী, আকর্ষণীয় মুখশ্রী---কোথায় দেখেছে একে রানা?

'আমি জেন এসেক্স,' বলল মেয়েটি। পরিচয় দিতেই রানা চিনে ফেলল ওকে। সিআইয়ের এজেন্ট। এ-ই সম্ভবত ব্রিফ করবে ওকে।

চার্লটন দম্পতি নিজেদের পরিচয় দিলেন। রানার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েটির হাত ঝাঁকিয়ে দিল ও।

মুখের অর্গল খুলে দিলেন আবারও মিসেস চার্লটন। বিনীতভাবে শুনে গেল জেন, কিন্তু রানা নিশ্চিত ওর মতো সে-ও এর কিছুই মনে রাখবে না। এবার ভদ্রমহিলার তদন্তের পালা ।

'কী করো তুমি?' প্রথম প্রশ্ন মিসেস চার্লটনের।

'আমি ফ্রীল্যান্স জার্নালিস্ট।'

'বাহ, উইমেন্স লিবে বিশ্বাস করো বুঝি?' মিস্টার চার্লটন।

তকরি। তবে সাংবাদিকতা করি নিছক অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে।' রানার দিকে চাইল যুবতী ।

'আপনাকে চেনা চেনা লাগছে, মিস এসেক্স,' বলল রানা। 'আমি যদিও পত্রিকা-টত্রিকা পড়ি না তেমন একটা।'

'পুরুষদের ম্যাগাজিন তো পড়েন, তাই না, মিস্টার আকবর?' বলল মেয়েটি।

তত পড়ি।

ততাহলে ওখানেই দেখেছেন। এডিটরদের ধারণা, একা একা কোন মেয়ে কোথায় কি অ্যাডভেঞ্চার করল খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে পুরুষরা। পিক্স সহ বেশ কয়েকটা স্টোরি ছাপা হয়েছে আমার। তাই মনে হয় চেনা চেনা লাগছে।'

'তাই হবে,' বলল রানা।

'পিক্স?' মিসেস চার্লটন শুধালেন। 'পিকচার, মানে ছবি?'

'শিয়োর। এই যেমন ধরুন, প্রতিনিধি রিওতে স্নান করছে। ব্যাঙ্ককের পাতায়া বীচে নগ্ন হয়ে গায়ে রোদ মাখছে। এইসব আর কি।'

মেয়েটির সম্পূর্ণ ডোশিয়ে মুখস্থ রানার। সিআইএ কখনোই নিশ্চিত হতে পারেনি জেন এসেক্স এজেন্ট হিসেবে কোন মানের --- ভাল না মন্দ। ওকে সামনাসামনি দেখে বিভ্রান্তির কারণটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে রানা। চার্লটন দম্পতি, বলাবাহুল্য, মনে রাখবেন ওকে, চোখ-মুখ লাল করে এইমাত্র ওয়ার্ডরুম ত্যাগ করলেন তাঁরা। কিন্তু মেয়েটি এ-ও নিশ্চিত করল ওকে আর বিরক্ত করবেন না স্বামী-স্ত্রী। চালটা চেলে চালাকির পরিচয় দিয়ে থাকতে পারে জেন, কিংবা বোকামিরও। রানা বুঝতে পারল না কোন্টা ।

'আপনাকে নিয়ে হয়তো একটা স্টোরি করা যায়, মিস্টার আকবর,' বলল জেন। 'আপনি এই ফ্রেইটারে কেন?'

সেই রাস্তা-ঘাট বানানোর গপ্পো ফাঁদতে হল রানাকে ।

'গেলেই কাজে জয়েন করতে পারবেন?'

তহ্যাঁ। মাসাওয়ার জেটিতে লোক থাকবে আমার জন্যে ।

'বাজে দেশ, ইথিওপিয়া---দেখবেন চাকরি না খেয়ে দেয়।'

তসাবধান থাকব আমি।'

আর যাদের চোখেই দিক না কেন, পরস্পরের চোখে ধুলো দিতে পারেনি ওরা। কিন্তু সবার সামনে মুখ খুলতে আপাতত রাজি নয় কেউ। কাজেই ওয়ার্ডরুম থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজের ছোট্ট লাইব্রেরিটায় গেল রানা। গোটা দুই পেপারব্যাক বাছাই করে ফিরে এল কেবিনে ।

জ্যাক চার্লটনের সঙ্গে প্রথম দু সন্ধে দাবা খেলে কাটানর চেষ্টা করল রানা। একটা করে নৌকা আর গজ দান করে প্রায় পঁয়ত্রিশ চাল পর্যন্ত খেলাটাকে টেনে নিয়ে গেল, তারপর নির্বোধের মতো মাত হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। সুতরাং দাবা ছেড়ে এরপর ব্রিজ ধরতে হল। চরিত্র বিশ্লেষণে আসলে সময়টা কাজে লাগাল রানা। চার্লটন দম্পতি নিপাট ভালো মানুষ উপলব্ধি করছে ও, দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে তারপর গল্পের ঝাঁপি নিয়ে বসে, প্রতিবেশীদের তাক লাগিয়ে দেবে। ওদিকে ধাঁধা

হয়েই রইল জেন। তাস খেলায় রানার জুটি হয় সে, কখনও আমীর রানার আবার কখনও ফকির রানার।

যাত্রার তৃতীয় দিন সকালে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উত্তাপের আঁচ পাওয়া গেল। ওয়ার্ডরুমের চার্ট জানাচ্ছে, উইন্ডওয়ার্ড চ্যানেলে রয়েছে ওরা। স্পিড রেকর্ড সেট করেনি শেপ মাইয়ার । এ মুহূর্তে, কিউবার ঘন নীল জলের বুক চিরে, ঈষৎ টলমল করতে করতে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। সেদিন সন্ধের দিকে জর্জটাউন পৌঁছানোর কথা ওদের। সাতটার আগে বাঙ্ক ছেড়ে ব্রেকফাস্ট সারতে ওয়ার্ডরুমে গেল রানা। রাতে ঘুম ভালো হয়নি ওর। জাহাজের এয়ারকন্ডিশনিং ব্যবস্থা মোটেও জুতসই নয়।

চার্লটনদের কিংবা জেনের দেখা নেই। একটা ডেক চেয়ার টেনে নিয়ে, যাত্রীদের জন্যে নির্দিষ্ট ডেকের ছোট্ট অংশটায় বসল রানা। হঠাৎ খ-র্খ শব্দ শুনে চোখ তুলতে জেনকে দেখতে পেল। আরেকটা ডেক চেয়ার টেনে আনছে ইস্পাতের ডেক প্লেটের ওপর দিয়ে ১

'আমাদের ইংরেজ বন্ধুরা মনে হয় সকালের রোদ পছন্দ করে না,' বলল যুবতী। জবাবে মুচকি হাসল কেবল রানা। কাটঅফ জিনস ও ব্যাকলেস হল্টার পরনে জেনের, উন্মুক্ত গায়ের চামড়া রোদে পোড়া তামাটে। ডেক চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসল ও, স্যান্ডেল লাথি মেরে খসিয়ে সিগারেট ধরাল।

'মাসুদ রানা, এখন অভিনয় ছেড়ে বোধহয় কথাবার্তা বলা যায়।'

'তথাস্ত । এরজন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'বিসিআই তোমাকে অনেক কিছুই জানায়নি।'

'অনেক কিছু বলতে?'

'রবার্তো মালদিনি সম্পর্কে ইনফর্মেশন। দায়িত্বটা সিআইএ আমার ওপর চাপিয়েছে। লেটেস্ট খবর হচ্ছে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট মারা পড়ার আগে একটা রিপোর্ট ফাইল করে গেছিল। আমরা সেটা ইন্টারসেপ্ট করি । আমাকে বলা হয়েছে জিওনিস্টদের নতুন একজনের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে চলতে । কিন্তু ইথিওপিয়া পৌঁছানোর আগে পরস্পরকে চিনব না আমরা।' সিগারেটটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল জেন। 'কিন্তু আমি বাজিয়ে দেখে বুঝে ফেলেছি, সেই এজেন্ট হচ্ছে এই জাহাজের স্টুয়ার্ড।'

'আগে মালদিনির কথা বলো,' বলল রানা ।

'ধীরে, আকবর, ধীরে---ইংরেজ বন্ধুদের সম্বন্ধে দেখছি ভুল ধারণা করেছিলাম।'

ধচার্লটন দম্পতি ডেক চেয়ার হিচড়ে আনছেন। রানার সঙ্গে বই রয়েছে, কিন্তু পড়ার ভান করল না। ক্যামেরা আউটফিট রাখার খুদে বীচ ব্যাগটার ভেতর হাত ভরে দিল জেন। ৩৫ এমএম-এ টেলিফটো লেন্স পেঁচিয়ে ফেলল ত্রস্ত হাতে, উড়ুক্কু মাছের রঙিন ছবি নেয়ার চেষ্টা করবে বলে ঘোষণা করল। ক্যামেরা স্থির রাখতে রেলের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে।

রানার মাথায় তখন পাক খাচ্ছে নানান চিন্তা। ববি মুর, শেপ মাইয়ারের স্টুয়ার্ড, জিওনিস্টের এজেন্ট! বিসিআই তথ্যটা ওকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছে, নাকি চেয়েছে রানা জেনের কাছ থেকে জানুক? রাহাত খ

ানের ভ্রূ দেখতে পেল রানা মনের চোখে। ইচ্ছে করেই ওকে ব্লাইন্ড মিশনে পাঠানো হয়েছে? বুকের মাঝে অভিমান উথলে উঠল ওর। পরমুহূর্তে নিজেকে ছিছি করল । জেনে-বুঝে কখনোই ওকে এরকম ফাঁকি দেবেন না বস। বিসিআই তথ্যটা তাঁকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছে এছাড়া ব্যাপারটার আর কোন ব্যাখ্যা নেই। যাই হোক এই মিশনে রানার পাশাপাশি কাজ করতে পাঠানো হয়েছে সিআইএ এজেন্ট জেন এসেক্সকে। এবং মালদিনি সম্পর্কে আরও জানতে হলে রানাকে নির্ভর করতে হবে মেয়েটির ওপর । তেমনভাবেই সাজানো হয়েছে সেটআপটা। সাজিয়েছে সিআইএ। অগত্যা স্বামী- স্ত্রীর ভ্যাজর ভ্যাজর হজম করে সকালটা পার করতে হল ওকে ।

সন্ধে নাগাদ জর্জটাউন পৌঁছল ওরা। কিন্তু রানা মনস্থির করল তীরে নামবে না। আলী আকবরের পকেটে টান পড়েছে এবং ভ্রমণের ক্লান্তিতে বড্ড বিরক্ত বোধ করছে সে। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের কাছে মাসুদ রানার নামে একটা ফাইল আছে। কী আছে ওতে জানে না রানা, কিন্তু ববি মুর সম্ভবত শনাক্ত করতে পেরেছে ওকে। স্থানীয় ইসরাইলী এজেন্টকে একটা খবর দিলে খুন করে গুম করে ফেলবে রানাকে। আলী আকবর নামে জনৈক আমেরিকান অভিবাসী যদি হঠাৎ উধাও হয়ে যায়, কেউ আটকে রাখবে না শেপ মাইয়ারকে।

'সাইটসিয়িঙের জন্যে যাবেন না?' মিসেস চার্লটন প্রশ্ন করলেন।

'না, মিসেস চার্লটন,' বলল রানা। 'সত্যি বলতে কি, ভ্রমণ তেমন একটা ভালবাসি না আমি । তাছাড়া সঙ্গে টাকা-পয়সাও বিশেষ নেই। ইথিওপিয়া যাচ্ছি যদি একটা হিল্লে হয়। প্রমোদভ্রমণে আসলে বেরোইনি আমি। টাকা-পয়সা থাকলে...'

ত্বরিত নিষ্ক্রান্ত হলেন ভদ্রমহিলা, স্বামীকে পেছনে হিড়হিড় করে টানতে টানতে। এই লোককে খাওয়ার ও ব্রিজ খেলার সময় তিতিবিরক্ত করে মারা যায়, কিন্তু তাই বলে উপকূলে নামতে রাজি করাতে একটির বেশি দুটি শব্দ খরচ করতে বয়েই গেছে তাঁর। হায়রে, সবই আলী আকবরের কভারের দোষ, তেতো মনে ভাবল রানা । শালার অভাবী মানুষকে সবাই ডরায়।

জেন তীরে গেছে। কভার বজায় রাখতে হলে যেতেই হবে, রানাকে যেমন বসে থাকতে হবে জাহাজে। মালদিনির ব্যাপারে একান্তে কথা বলার সুযোগ এখনও পায়নি ওরা, কখন পাবে তাই বা কে জানে। ক্যাপ্টেন আর সেকেন্ড মেট বাদে জাহাজের বাদবাকি অফিসাররাও ডিনারের সময় তীরে নেমে গেছে। অফিসার দু'জনের সঙ্গে সাত-পাঁচ গল্প করে সময় পার করল রানা; যদিও জমাতে পারল না।

ডিনার-পরবর্তী কনিয়্যাক পান শেষে, তীরে যাওয়ার জন্যে ক্যাপ্টেনের অনুমতি চাইল ববি মুর।

.. 'জাহাজে প্যাসেঞ্জার রেখে তুমি...'

'কোন অসুবিধা নেই আমার,' বলে উঠল রানা। 'ব্রেকফাস্টের আগে আমার আর কিছু লাগবে না।'

'আপনি যাচ্ছেন না, মিস্টার আকবর?' জানতে চাইল ববি মুর।

'না,' বলল রানা, 'আসল কথা, ট্যাক খালি।

'জর্জটাউন কিন্তু ভারী সুন্দর জায়গা, পরে পস্তাবেন,' বলল ও।

ব্যাটার সাফাই শুনলে খুশির সীমা থাকবে না জর্জটাউন ট্যুরিজমের, কিন্তু রানা আগ্রহ দেখাল না। রানাকে উপকূলে চাইছে ববি মুর, কিন্তু এ ব্যাপারে চাপাচাপি করতে ভয়ও পাচ্ছে। যদি সন্দেহ করে বসে রানা। সে রাতে লুগার আর স্টিলেটোটা হাতের কাছে রাখল রানা।

পরদিনও চোখের আড়ালে থাকল ও। সাবধানতাটুকু সম্ভবত বৃথা গেল । ববি মুর তীরে নেমেছিল তেল আবিবকে জানাতে, রানা মাসাওয়া যাচ্ছে। আর সেজন্যে যদি নেমে না থাকে তাহলে চিনতে পারেনি ওকে। চিনতে পারলেও রানার করার কিছু নেই ।

'জর্জটাউনে আকর্ষণীয় কোনো স্টোরি পেলে?' সে রাতে ডিনারে বসে জেনকে জিজ্ঞেস করল
রানা ।

'নাহ্, কিচ্ছু লাভ হয়নি নেমে।'

ডিনারের পর কেবিনের দরজায় মৃদু একটা আওয়াজ হবে আশা করছে রানা। দশটা বেজে সাত। চার্লটনরা আজ অন্যান্য দিনের চাইতে আগেভাগে কেবিনে আশ্রয় নিয়েছে, স্পষ্টতই ক্লান্ত । গত রাতের সাইটসিয়িঙের ধকল । জেনকে ঢুকতে দিল রানা। সাদা স্ল্যাক্স ও বডিশার্ট পরনে ওর ।

'ববি মুর তোমাকে চিনে ফেলেছে মনে হচ্ছে,' বলল ও। রানাকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'মেন ডেকের সুপারস্ট্রাকচারের কাছে দেখা করতে বলেছে আমাকে। রাত একটায়।'

ততুমি চাইছ তোমাকে কাভার করি আমি?'

'সেজন্যেই সাদা কাপড় পরেছি। আমাদের রেকর্ডে বলে, ছুরিতে তোমার নাকি হাত চালু, আকবর।'

'অপেক্ষা করব আমি, আমাকে খোঁজার দরকার নেই,' বলল রানা । সায় দিল জেন।

নিঃশব্দে দরজা খুলে নগ্ন পায়ে প্যাসেজওয়েতে মিশে গেল মেয়েটা । স্টিলেটো তুলে নিল রানা। ঘরের বাতি নিভিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর সন্তর্পণে প্যাসেজওয়েতে ঢুকে পথ করে দরজাটার কাছে চলে এল, মেনডেকের পোর্টসাইডের দিকে খোলে এটা। আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

বেশিরভাগ কার্গো শিপের মত শেপ মাইয়ারেরও বিশৃঙ্খল অবস্থা। সুপারস্ট্রাকচার লাগোয়া ডেকে তেরপলের ছড়াছড়ি। রানা সাবধানে গোটা দুই জড়ো করে কার্গো বুমের বেস ঘিরে স্তূপ করে রাখল। এবার বসে পড়ল ওগুলোর আড়ালে। ববি মুর এগুলোকে কুশন না বানালেই বাঁচি, বলল মনে মনে ।

ওয়াচ-অ্যাফট বসানোর ধার ধারেনি শেপ মাইয়ার। ক্রুদের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে ব্রিজে এসে মিশেছে ইনবোর্ড প্যাসেজওয়ে, রেডিও শ্যাক, এঞ্জিন রুম আর গ্যালি। রানার ধারণা হল ব্রিজের লুকআউট ঘুমাচ্ছে, এবং অটোমেটিক পাইলটে চলছে জাহাজ। তবুও, আড়াল ছাড়ল না ও ।

ঠিক একটায় দেখা দিল ববি। মেস জ্যাকেট পরে রয়েছে এখনও, আবছা সাদাটে দেখাচ্ছে রাতের অন্ধকারে। বাঁ আস্তিন হাতড়াতে দেখল ওকে রানা, সম্ভবত ছুরি লুকানো আছে। এবার উদয় হলো জেন। রানার ডান হাতে উঠে এল স্টিলেটো।

কথোপকথনের টুকরো-টাকরা কেবল বাতাসে ভেসে আসছে ওর কানে।

'তুমি আমাদের ডাবলক্রস করেছ,' বলল লোকটা।

জেনের জবাবটা উড়ে গেল বাতাসে ।

'ও জাহাজে ওঠার সময়ই চিনতে পেরেছি,' বলছে ববি। 'তেল আবিব থোড়াই পরোয়া করে মাসুদ রানা মাসাওয়া পৌঁছল কি না।'

'আমি করি।'

উত্তর শোনা গেল না লোকটার।

উত্তপ্ত বাদানুবাদ চলছে বোঝা যায়, এবং সেই সঙ্গে মৃদুতর হচ্ছে ওদের কণ্ঠস্বর। রানার দিকে পিঠ দিয়ে জেনকে মেটাল সুপার স্ট্রাকচারটার উদ্দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ববি, ব্রিজের যে কারও চোখের আড়ালে। আলগোছে তেরপল তুলে বেরিয়ে এল রানা, প্রায় হামাগুড়ির ভঙ্গিতে। হাতে স্টিলেটো তৈরি ওর, গুড়ি মেরে এগোল ওদের উদ্দেশে।

'তোমার সাথে কাজ করব না আমি,' বলল ববি।

'মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?'

'তুমি ডাবলক্রস করেছ আমাকে আর নয়তো তোমার প্রভুরা। আগে তোমাকে খতম করব, তারপর রানাকে। সাগরে কেমন সাঁতরাতে পারে শালা মুসলমানের বাচ্চা দেখা যাক।'

আস্তিনের কাছে হাত চলে গেল ওর। পা টিপে দৌড়ে এসে পেছন থেকে ছুরি-ধরা বাঁ হাতে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল রানা, রুদ্ধ করে দিল চেঁচানোর সুযোগ। তারপর এক ঝটকায় ঘুরিয়ে দিয়ে পরপর দুটো বিরাশি সিক্কার ঘুসি ঝাড়ল লোকটার নাক বরাবর। মাথা ঘুরে টলে উঠতে, মেস জ্যাকেট থাবা মেরে ধরে রেইলের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল শরীরটা। জোর বাতাসে চাপা পড়ে গেল লোকটার আর্তচিৎকার।

'ঝপাৎ শব্দটা নিশ্চিন্ত করল রানাকে। মাত্র ক'মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল পুরোটা।

ব্রিজ থেকে কোন শোরগোল উঠল না। পায়ের নিচে জাহাজের আফ্রিকাগামী এঞ্জিন ধড়ফড় করছে। স্টিলেটো খাপে ঢুকিয়ে জেনের কাছে এল ও। সুপারস্ট্রাকচারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সে।

'থ্যাঙ্কস, রানা...ইয়ে আকবর।'

'পুরোটা শুনতে পাইনি,' জানাল রানা। 'ও কি তেল আবিবে রিপোর্ট করেছিল আমার সম্পর্কে?'

'কিছু বলেনি আমাকে।'

'শুনলাম মাসাওয়া গেলাম কি গেলাম না তাতে নাকি তেল আবিবের কিছু আসে যায় না।'

তহ্যাঁ, কিন্তু খুব সম্ভব ও কোন রিপোর্ট তৈরি করেনি।' একটুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, 'রানা ...আকবর, ওকে কি মেরে ফেলেছ?'

মৃদু হাসল রানা, মাথা নাড়ল। 'জানি না। কপাল ভাল থাকলে বেঁচেও যেতে পারে।

'জবর দেখিয়েছ কিন্তু,' বলল জেন। একটু আগে যে মরতে বসেছিল তার কোন ছাপ দেখা গেল না মেয়েটির আচরণে। যেন এমনি ঘটনা ওর জীবনে হরহামেশাই ঘটছে। 'তোমার কেবিনে চলো, কথা আছে,' শেষমেশ রানাকে বলল ও ।

তিন

'এই জাহাজে ঘাপলা আছে,' কেবিনে ঢুকে মূর্তি হয়ে বসল জেন । 'স্পিড কম। এয়ারকন্ডিশনিং ঠিক মতো কাজ করে না। আর ববি মুর জঘন্য কফি বানাত, এই বলবে তো?'

'না।'

ওকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিতে অপেক্ষা করছে রানা।

'রানা,' বলল মেয়েটি, 'শেপ মাইয়ার সম্পর্কে বিসিআই তোমাকে কি কি জানিয়েছে বলবে আমাকে?'

'একসময় না একসময় জাহাজটা মাসাওয়া পৌঁছবে। এবং প্যাসেঞ্জার লিস্টে সম্ভবত কোনো গণ্ডগোল নেই।'

'ক্রুদের সম্পর্কে কিছু বলেনি?'

'ববি সাহেবের কথা জানা ছিল না,' বলল রানা।

'সিআইএ আমাকে বলেছে তোমাকে জানাতে। আর আমার ওপর আরও একটা দায়িত্ব চাপিয়েছে। তিনটে মিনিটমেন মিসাইল ট্র্যাক করতে হবে। খোয়া গেছে ওগুলো।'

'কমপ্লিট মিসাইল?'

'না---অংশবিশেষ। সঙ্গে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড রয়েছে।'

'কোথায় ওগুলো?'

'ব্রিজের পেছনে এক নম্বর ডেকে, দড়ি বাঁধা হয়ে বসে আছে কন্টেইনারগুলোর মধ্যে। '

'তুমি ঠিক জানো?দ

'ফেয়ারলি ।

'মালদিনির কাছে চালান করা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, ববি মুর বেশি বেশি মাতব্বরী ফলাচ্ছিল। আমার বিশ্বাস মাসুদ রানাকে খতম করার চাইতে ওই মিসাইলগুলো অকেজো করাটাই জিওনিস্টের জন্যে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট ছিল।'

'তার মানে আমাদের এখন ইসরাইলী সহযোগিতা ছাড়াই কাজটা করতে হবে,' বলল রানা। 'যাকগে, রাতটা থেকে যাও এখানে।'

'আর আমার চরিত্র ধ্বংস হোক?'

'তখন চার্লটনদের সামনে যা বললে তারপর আর ধ্বংস হতে বাকি আছে কিছু ? '

হেসে ফেলল জেন । বলল, 'তবু আমার কেবিনেই শোবো আমি।'

এখন অবধি অল্প কিছু ক্রুর সঙ্গে দেখা হয়েছে রানার। ওদের কথাই ভাবছে। যাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করে না তারা। ডিনারে ক্যাপ্টেন জোহানসনের সঙ্গে গল্প করেছে রানা। মিস্টার ম্যাকলিন সেকেন্ড মেট, শুনেছে। ফার্স্ট মেট, মিস্টার জন কেয়ার, মাঝেমধ্যে খোঁত-খাঁত করে অভিবাদন জানিয়েছে এবং পাতে আরও আলু চেয়েছে, কিন্তু বাহ্যত একবারও মনে হয়নি যাত্রীরা বাঁচল না মরল তাতে কিছু এসে যায় তার। পার্সার, মিস্টার বর্গ, রানাদের খাওয়ানোর দায়-দায়িত্ব ববি মুরের ঘাড়ে চাপিয়ে, চুপচাপ দৈনন্দিন পাঁচ হাজার ক্যালোরি হজম করে গেছে। রেডিও অপারেটর, লম্বা, সোনালি চুলের লিকলিকে মেয়েটি সুইডিশ; মেরী এন্ডারসন। ফার্স্ট মেটের মতোই চাপা স্বভাবের। এক কথায়, ওয়ার্ড রুমে সামাজিকতার কোন বালাই নেই ।

রানা কান খাড়া রাখল যদি ববির খোঁজে হৈ-চৈ পড়ে জাহাজে। কোনমতে রাত কাবার করে, সকালে জেনকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে এল প্যাসেজওয়েতে। আরেকটু হলেই ধাক্কা খেত ওরা মেরী এন্ডারসনের সঙ্গে।

'ববি মুরকে তোমরা কেউ দেখেছ?' প্রশ্ন করল ও।

'ডিনারের সময় দেখেছি,' বলল রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল জেন, সে- ও তখনই শেষবার দেখেছে।

মেরী এন্ডারসন ওদের ওপর সন্দেহের দৃষ্টি বুলিয়ে চলে গেল পাশ দিয়ে। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিল একবার ওরা।

'দশ মিনিট পর আমার কেবিনে এসো,' বলল জেন। একসাথে নাস্তা করব আমরা।' সানন্দে রাজি হল রানা।

কেবিনে ফিরে এসে তৈরি হয়ে নিল রানা। অস্ত্র সঙ্গে রাখার বিষয়ে আরেকবার মাথা ঘামাল। এই জাহাজে করে তিনটে মিনিটম্যান আইসিবিএম তৈরির মাল-মশলা চলেছে, জেনের এ থিয়োরি বলছে ঠিকই করেছে রানা । কোডেড মেসেজ পাঠানোর জন্যে রেডিও ব্যবহার না করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। ক্রুরা হয়তো জানে না কি বহন করছে তারা, কারণ কার্গো শিপে কন্টেইনার খোলার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু যদি জানা থাকে ওদের? তবে কি এখন থেকে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা আরম্ভ করবে রানা?

খানিকটা অনুতাপের সঙ্গে লুগার আর স্টিলেটো সুটকেসের গোপন কুঠুরীতে রেখে দিল রানা, খুদে গ্যাস বোমাটা আর ট্র্যান্সিভারও রয়েছে ওখানে। এ জাহাজ ঠিকঠাকমত ইথিওপিয়া গেলে তো ভালই, নইলে একটামাত্র লুগার নিয়ে এতবড় ঝামেলা এড়ানো যাবে না। জাহাজের এঞ্জিনিয়ারদের কারও দেখা পায়নি ভেবে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে রানা। ববি মুর জানিয়েছিল মিসেস চার্লটনের প্রশ্নের জবাবে, তারা নাকি নিচে থাকতে ভালবাসে, যাত্রীদের দেখা দেয় না। ওর ব্যাখ্যা তখন মেনে নিয়েছিল রানা। কিন্তু এখন কেমন যেন খুঁত-খুঁত করছে মনটা। তালা বন্ধ সুটকেসটার দিকে আবারও চাইল রানা। জ্যাকেট পরে ঢাকা দেয়া যায় লুগার। এর চাইতে ছোটখাটো কিছু পরে লুগার গোপন করার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু এই পচা গরমে জ্যাকেট পরলে জাহাজের সবচাইতে সরল সাদাসিধে ক্রুটিও সন্দিহান হয়ে উঠবে। এবং জাহাজে সরল মনের ক্রু আদৌ কেউ আছে কিনা ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে ওর।

প্যাসেজওয়েতে পা রাখল নিরস্ত্র রানা, দরজা লক করে ক'গজ দূরে জেনের কেবিনের উদ্দেশে এগোল। আলতো টোকা দিল ও। জেন ভেতর থেকে ডাকতে ঢুকে পড়ল ।

... মেয়েলি অগোছাল দৃশ্য চোখে পড়বে ভেবেছিল রানা, কিন্তু তার বদলে দেখতে পেল ছিমছাম এক কেবিন। বাঙ্কের নিচে জেন সযত্নে ঢুকিয়ে রেখেছে লাগেজ, ওপেন ক্লজিটে নিরাপদ ওর গ্যাজেট ব্যাগ। রানা ভেবে পেল না ওর ক্যামেরা ২২ সিঙ্গল শট ধারণ করছে কিনা, কোন একটা লেন্সে।

জেন পরে রয়েছে ব্লু হল্টার আর ডেনিম কাটঅফ। পায়ে আজ স্যান্ডেলের বদলে স্নিকার। একটা ব্যাপার নিশ্চিত, অস্ত্র বহন করছে না যুবতী। ব্রেকফাস্টের জন্যে ওয়ার্ডরুমে গেল ওরা একটু পরে। পুরোটা সময় ধরে ববি মুরের অনুপস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা চলল। মিসেস চার্লটনের ধারণা সাগরে পড়ে গেছে লোকটা। কিন্তু প্রতিবাদ করল রানা, বলল তাহলে কেউ না কেউ শুনতে পেত। কিন্তু ওর কথা কানে তুললেন না ভদ্রমহিলা। পাল্টা বললেন লুকআউট কাজ ফেলে ঘুমালে শুনবে কিভাবে? এবার আপত্তি করে উঠল পার্সার। মিস্টার কেয়ার ও মিস্টার ম্যাকলিন থাকতে দায়িত্ব পালনে গাফিলতির নাকি প্রশ্নই ওঠে না। বিস্বাদ কফি, পোড়া টোস্ট আর স্ক্র্যাম্বলড এগ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল ওরা। আজ ওদের প্রতি কেমন শীতল আচরণ করলেন চার্লটন দম্পতি। ওদের বন্ধুত্ব সম্ভবত সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না ওঁরা। একদিক দিয়ে ভালই হলো রানাদের জন্যে। ববি মুরের জন্যে পর্যাপ্ত হা-হুতাশ করে জেনের কেবিনের দিকে পা বাড়াল ওরা।

'জার্নালিস্টের ভান যখন ধরেছি তখন ববির সম্পর্কে একটু খোঁজ-খবর নিতে হয়,' রানাকে বলল জেন। তুমি কি করবে ভাবছ?'

'কি আর, পোর্ট ডেকে গিয়ে আরেকটা জেমস হেডলি চেজ ধরব।'

'এই,' আদুরে কণ্ঠে বলল জেন। 'আমার কিছু ছবি তুলে দাও।'

আঁতকে ওঠার ভান করল রানা। 'মানে জন্মদিনের পোশাকে?'

তা নয় তো কি?

'কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?' বলল রানা। এমনিতেই আমাদের মেলামেশা লোকে ভাল চোখে দেখছে না। তার ওপর আবার যখন তখন কেবিনে ঢোকা, কেমন দেখায় না?' মেয়েটার মনোভাবের হঠাৎ পরিবর্তনে বিস্মিত হয়েছে ও।

মাথা নেড়ে স্বীকার করল জেন। ওকে সান্ত্বনা দিল রানা, বলল, 'পরে সুযোগ মতো তুলে দেব। এখন চলি।' জেনকে ওর কেবিনে পৌঁছে দিয়ে চলে এল ও।

একটু পরে, ডেক চেয়ারে আয়েশ করে বসে তখন রানা, দুখটা ছায়ায় রাখার ব্যবস্থা করে সবে চোখের সামনে তুলতে যাবে বইটা, পায়ের শব্দ ও তারপর এক পুরুষকণ্ঠ কানে এল ওর। 'মিস্টার রানা, নড়বেন না।'

রানা উপেক্ষা করার ভান করল। রানা আবার কে? অন্য কাউকে বলছে হয়তো।

'মিস্টার আকবর, নড়াচড়া করবেন না।'

এবার আর গায়ে না মেখে উপায় কি? সেকেন্ড মেট ম্যাকলিনের গলা। দু'জন নাবিক, সশস্ত্র, রানার সামনে এসে দাঁড়াল। এবার দেখা দিল ম্যাকলিন, তার হাতেও অস্ত্র ।

'জেনারেল মালদিনি আপনাকে জ্যান্ত চান,' বলল সে।

'এই জেনারেল মালদিনিটা কে?'

'যাঁকে ইথিওপিয়ান সরকারের হয়ে খুঁজছেন আপনি।'

'ম্যাকলিন, জেনারেল মালদিনি না কি, তাকে চাকরি দিতে ঠেকা পড়েনি ইথিওপিয়ান সরকারের।'

'অনেক হয়েছে, মিস্টার রানা। ববি মুরকে খুন করেছেন আপনি। গাধা বেচারা ইসরাইলীরা নিশ্চয়ই খুব সস্তায় কিনেছিল ওকে।'

অমানুষকে বেহুদা অপবাদ দেয়া ঠিক নয়,' বলল রানা। 'খুঁজে দেখোগে, কোথাও হয়তো মাল টেনে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।'

কথার পিঠে কথা বলার সুরে জবাব দিল ম্যাকলিন। 'ভেবে অবাক লাগে, বাচাল বুড়িরাও মাঝেমধ্যে ফস করে কেমন সত্যি কথা বলে বসে। কাল রাতে লুকআউট ঘুমাচ্ছিল। বেশিরভাগ রাতেই ঘুমায়। কিন্তু আমি জেগে ছিলাম। ববির জন্যে জাহাজ ঘুরাতে চাইনি। জিওনিস্ট এজেন্ট পানিতে পড়লে আমার কি?'

'ইসরাইলের অনেক কিছু।'

'স্বীকার করছি আপনার নার্ভ খুব শক্ত। কিন্তু আমরা সশস্ত্র, আপনি তা নন । এ জাহাজের সমস্ত ক্রু মহান নেতা মালদিনির লোক---শুধু ববি মুর, যাকে ফেলে দিয়েছেন আপনি জাহাজ থেকে এবং ওই এঞ্জিনিয়ারগুলো ছাড়া, এঞ্জিন রুমে এখন বন্দি হয়ে আছে ওরা। আপনার ছোরাটা কই, মিস্টার রানা?'

'ববির শরীরে।'

'আমি দেখেছি ওটা ব্যবহার করেননি আপনি।'

'তুমি রাতকানা মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'কি দেখতে কি দেখেছ।'

'যাকগে। ওটা এখন আপনার সাথে নেই। আপনি অতুলনীয়, মিস্টার রানা। কিন্তু অস্ত্রধারী তিনজনের বিরুদ্ধে অসহায়। কাজেই আস্তে করে উঠে পড়ে সামনে হাঁটা দিন। ঘুরবেন না। কোন ফন্দি-ফিকির করতে যাবেন না। জেনারেল মালদিনি আপনাকে জ্যান্ত চান যদিও, তবে মারা পড়লেও খুব একটা দুঃখ পাবেন বলে মনে হয় না।'

রানার দায়িত্ব মালদিনির পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবগত হওয়া। এখন সেধে যখন তার কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে, আপত্তি কিসের? তাছাড়া সশস্ত্র তিনজনের বিপক্ষে কিইবা করার আছে ওর। বিশেষ করে রানার দক্ষতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে দ্বিগুণ সতর্ক রয়েছে যখন ওরা।-

জলে প্রতিফলিত হচ্ছে তপ্ত সূর্যটা। সামনে হেঁটে গেল ওরা, পাশ কাটাল দড়িবদ্ধ কন্টেইনারগুলোর। শেষবারের মতো মহাসাগরে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল রানা। তারপর একটা দরজা পার হয়ে ফরোয়ার্ড সুপারস্ট্রাকচারে পা রাখল ।

'থামুন!' আদেশ করল ম্যাকলিন।

রেডিও শ্যাকের দশ ফিটের মধ্যে এখন রানা। বেরিয়ে এল মেরী এন্ডারসন, রানার তলপেট বরাবর ধরে রয়েছে একটা কাটা শট-গান ।

'ক্যাপ্টেন বলেছেন, বোসান'স লকারের নিচে স্টোরেজ এরিয়া ব্যবহার করতে,' বলল মেরী

'সে তো একদম নাক বরাবর,' বলল ম্যাকলিন।

'তো?'

'ইংরেজ দম্পতি দেখে ফেলতে পারে আমাদের। হাজার হলেও মিস্টার রানা এখন অসুস্থ রোগী। ভয়ঙ্কর ট্রপিকাল ফিভারে ধরেছে তাঁকে।'

'অসুস্থ রোগীদের বয়ে নিয়ে যেতে হয়,' বলল মেরী।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে মাথা খাটাতে হল না রানার। পেছনে পদশব্দ হল ওর। পরমুহূর্তে সাতটা সূর্য দপ করে জ্বলে উঠল রানার মাথার মধ্যে। এখন ঘনঘোর অন্ধকার ।

চার

অসহ্য মাথার যন্ত্রণা নিয়ে জ্ঞান ফিরল মাসুদ রানার। মনে হচ্ছে ওর মাথার ভেতর অমলেন্দু বিশ্বাসের যাত্রাপার্টি শো করছে। নগ্ন বাতিটা সরাসরি মুখের ওপর হামলা করায় চোখ বুজতে বাধ্য হলো। গুঙিয়ে উঠে কোথায় রয়েছে ভাবার চেষ্টা করল ও।

'রানা?' নারীকণ্ঠ ।

খোঁত করে জবাব দিল ও।

'রানা?' মহিলা বলল আবার, কণ্ঠে জরুরি তাগিদ।

ব্যথা সত্ত্বেও চোখ খুলল রানা। ওয়ায়্যার ডোরটা তৎক্ষণাৎ নজর কাড়ল ওর। ম্যাকলিন। মেরী এন্ডারসন। তার শটগান। বোসান'স লকারের নিচে স্টোরেজ এরিয়ার কথা বলেছিল কে যেন। জেনের পেছনেও লেগেছিল ওরা। বাঁয়ে এক গড়ান দিতে জাহাজের এক পাশে দলামোচা হয়ে ওকে পড়ে থাকতে দেখল। চোখের নিচে কালসিটে পড়ে চেহারার সৌন্দর্যহানি ঘটেছে যুবতীর।

কে মেরেছে? কে বকেছে, কে দিয়েছে গাল?'

'ম্যাকলিন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ে কাবু করে ফেলেছে। তারপর মুখ বেঁধে স্ট্রেচারে করে নিয়ে এসেছে এখানে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে ক্যামেরাটা ভাঙেনি, আমার গলাতেই ঝুলছিল যদিও।'

ওর কাহিনীর দুটো বর্ণনা ঠিক যেন মিলছে না। ক্যামেরা ভাঙেনি, কথাটা এমন দায়সারাভাবে বলল যেন নিজে থেকেই চাইছে রানার মনে সন্দেহ জাগুক । এবং একজন এজেন্ট হিসেবে, ওর ন্যূনতম কমব্যাট স্কিল থাকা উচিত ছিল। ম্যাকলিনের সঙ্গে যুঝতে পারবে আশা করেনি রানা, কিন্তু খানিক ক্ষতি তো অন্তত করবে। সতর্কতাই বা অবলম্বন করল না কেন?

অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল রানা। খুদে কম্পার্টমেন্টটা জাহাজের গতির চাইতে দ্রুত ও বেপরোয়াভাবে দুলছে। বমি পাচ্ছে রানার। ম্যাকলিন ব্যাটা ড্রাগ দিতে পারল না? একটা নির্দিষ্ট সময় পর প্রভাব কেটে যায় ইঞ্জেকশনের। কিন্তু মাথায় আঘাত পেলে অনেক দিন, সপ্তাহ এমনকি মাস অবধি মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে

পারে ।

'রানা, তুমি ঠিক আছ তো!' কোমর জড়িয়ে ধরল জেন রানার। নিচু করে বসিয়ে দিল স্টিল ডেকে, জাহাজের কিনারে বিশ্রাম পাচ্ছে রানার পিঠ। 'তুমি ঠিক আছ তো?' বলল ফের।

'শালার জাহাজটা কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে,' বলল রানা। 'ম্যাকলিনের বাচ্চা ভাল বাড়িই মেরেছে।'

ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে চোখ পরীক্ষা করল জেন। পালস পরখ করল । তারপর আলতো করে হাত বোলাতে লাগল মাথার পেছন দিকে। জখমে হাত পড়তে ককিয়ে উঠল রানা।

'হ্যাং অন,' বলল জেন ।

মেনে নিল রানা । মনেপ্রাণে আশা করছে কোন চিড় খুঁজে পাবে না জেন । উঠে দাঁড়িয়ে এসময় বলল যুবতী, 'ফার্স্ট এইড খুব একটা বুঝি না আমি, রানা। কিন্তু মনে হচ্ছে না বড় ধরনের কোন আঘাত বা ফ্র্যাকচার হয়েছে। কয়েকটা দিন একটু ভোগাবে।'

হাতঘড়ি দেখল রানা । তিনটে দুই। 'দিনটা তো আজই, তাই না?'

'মানে যেদিন ওরা আমাদের বন্দি করল? হ্যাঁ, কেন, কি করবে?'

'খুব সাবধানে মুভ করব, যখন করব আর কি, এবং আশা করব ওপরে কোন কিছুই পার্মানেন্টলি রিঅ্যারেঞ্জ করা হবে না ।'

'আমি এখান থেকে বেরনোর কথা ভাবছিলাম,' বলল জেন।

'বুদ্ধি বাতলাও ।'

তআমার ক্যামেরাটা আসলে একটা টুলকিট। অল্প কিছু যন্ত্রপাতি আছে ওর ভেতর।

'গুড। ওরা লাঞ্চ এনেছিল আমাদের জন্যে?'

'না।' বিস্মিত দেখাল মেয়েটিকে।

ক্রমাথা গরম করার আগে অপেক্ষা করে দেখি ওরা আমাদের খাওয়ায় কিনা।' বলল রানা। দ্বিমত করল না জেন ।

ধাতব খোলের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভেবে চলল রানা । বার দুয়েক আলাপচারিতার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল জেন। কতক্ষণ এখানে আটকা থাকতে হবে ভাবছে রানা। কারাগারটিতে টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। খাওয়ার পানিরও কোন বন্দোবস্ত দেখা যাচ্ছে না। বাকেট আর পানির জগ যদি না আসে তবে বিপদ হয়ে যাবে। চারটে বাজার একটু পরে, জেনের সঙ্গে খানিক মজা করবে ভেবে প্রশ্ন করল রানা, 'শেপ মাইয়ারে ইঁদুর আছে মনে হয় তোমার?'

'ইঁদুর?' ঈষৎ ভীতি ওর কণ্ঠে। 'আমি তো কোন ইঁদুর-টিদুর দেখলাম না।'

'হয়তো নেইও,' আশ্বস্ত করল রানা। জাহাজটা যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু ইঁদুর যদি থাকে তবে এই নিচের দিকেই থাকবে।'

'কি করে জানো আমরা নিচের দিকে আছি?'

'জাহাজের গায়ের বাঁক লক্ষ করো,' বলল রানা, হাত বুলাল ঠাণ্ডা খোলে। 'নড়াচড়ার ভঙ্গি আর শব্দ খেয়াল করো।'

'অনেকখানি নিচ পর্যন্ত বয়ে এনেছে আমাকে,' মন্তব্য করল জেন। এরপর দশ মিনিটের নীরবতা।

'হঠাৎ ইঁদুরের কথা উঠল কেন?' বলে উঠল জেন।

'সম্ভাব্য সবরকম বিপদের কথা মাথায় রাখা ভাল,' বলল রানা। 'ইঁদুর তাদের একটা। ওরা বেশি মারকুটে হয়ে উঠলে পাহারা দিতে পারি আমরা পালা করে। কামড় খাওয়ার চাইতে তাও বরং ভাল ।'

শিউরে উঠল জেন । মনে মনে রানার স্ন্যাক্স ও সুটের সঙ্গে নিজের শর্টস আর হল্টারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করল। লোভনীয় মাংস প্রচুর

পরিমাণে প্রদর্শন করছে সে। এবং যে কোন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ইঁদুর, রানার রুক্ষ চামড়ার চাইতে, জেনের কোমল মসৃণ ত্বকে কামড় বসাতে বেশি আগ্রহী হবে।

'রানা,' কাতর কণ্ঠে বলল জেন। 'ইঁদুরের কথা আর বোলো না। আমার ভয় করে।' রানার গাঁ ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল মেয়েটা।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ, রানার ঘড়ি যদি আঘাত সয়ে সঠিক সময় দেয় আরকি, ডিনার এসে পৌঁছল। মিস্টার জন কেয়ার, ফার্স্ট মেট রয়েছে দায়িত্বে। তার তুলনায় রীতিমত সদালাপী বলতে হয় ম্যাকলিনকে।

'খোলে হেলান দিয়ে দাঁড়াও, যদি বাঁচতে চাও,' ব্যস, এটুকুই বেরোল ড্যাম কেয়ারের মুখ দিয়ে ।

চারজন নাবিক সঙ্গে এনেছে সে। একজন সাবমেশিনগান তাক করে রেখেছে বন্দীদের তলপেট লক্ষ্য করে। অন্যরা ব্ল্যাঙ্কেট ও একটা বাকেট ছুঁড়ে দিল, তারপর খাবার ও পানি নামিয়ে রাখল খাঁচাটার ভেতর। ওয়ায়্যার ডোর লাগিয়ে দিল থোড়াই কেয়ার সাহেব, যথাস্থানে আঙটা গলিয়ে, বন্ধ করে দিল তালা ।

'পানি দেয়া হয়েছে সারা রাতের জন্যে,' বলল সে। 'সকালে বাকেট খালি করা হবে। মেটাল কভার আছে ওটার।'

বন্দিরা ধন্যবাদ দেবে সে সুযোগ না দিয়েই বিদায় নিল লোকগুলো । ট্রে দুটো তুলে নিয়ে বলল জেন, 'চামচ কাঁটাচামচ সব রেখে চলে গেল ওরা, কেয়ারলেস। ''

'কিংবা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী,' বলল রানা। 'ওদেরকে আন্ডার-এস্টিমেট কোরো না। ম্যাকলিন বলেছে, জাহাজের সব ক্রু নাকি মালদিনির চর, কেবল ওই এঞ্জিনিয়ারিং অফিসাররা ছাড়া।'

'ও, সেজন্যেই ওদেরকে কখনো দেখা যায়নি।'

'ঘাপলাটা আমার আগেই ধরতে পারা উচিত ছিল,' বলল রানা। 'ঘোলাটে ব্যাপার আছে বুঝতে পারছিলাম কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারিনি।'

'সে দায়িত্ব আমারও ছিল, রানা, তোমার একার নয়,' সান্ত্বনা দিল জেন । খাবারের মান ওয়ার্ডরুমের চাইতে অনেক নেমে গেছে। ঠাণ্ডা গরুর মাংস, টোস্ট আর তেলতেলে আলু। তবু তা দিয়েই কোনমতে খাওয়া সারা হলে, ইস্পাতের ডেকে ব্ল্যাঙ্কেট বিছিয়ে বিছানা পাতল ওরা। তারপর বাকেটটা নিয়ে রাখল ফরোয়ার্ড কর্নারে ।

'চার্লটনরা এখন কি করছে কে জানে,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল জেন। 'ওরা কি আমাদের সাহায্য...'

কথা কেড়ে নিল রানা। 'সে আশা কোরো না। ওরা...একজোড়া সৌভাগ্যবান, বিরক্তিকর মানুষ। যদি টেরও পায় শেপ মাইয়ারে কোন গোলমাল আছে তবু টু-শব্দটা করবে না। জাহাজে তো নয়ই, কেপটাউনে নেমেও না।'

'কিন্তু এঞ্জিনিয়ারগুলো?'

'ভরসা করা যায় না,' হতাশ করল রানা। 'জাহাজে মালদিনির লোক আছে ত্রিশ-চল্লিশ জন। কতগুলো নিরীহ এঞ্জিনিয়ার কী করবে? তাছাড়া ওরা কিছু জানেই না হয়তো।'

'তাহলে আমার ক্যামেরাটা হয়তো...'

'আপাতত ভুলে যাও ওটার কথা। এখন প্রধান কাজ হচ্ছে এদের রুটিন আঁচ করা। আরও তিন-চারদিন লেগে যাবে সম্ভবত কেপ টাউন পৌঁছতে।

মুখটা প্যাঁচার মত দেখাচ্ছে জেনের। রানার অনুমতি নিয়ে ঘরের একমাত্র বাতিটা নিভিয়ে দিল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এবার শুয়ে পড়ে ব্ল্যাঙ্কেট মুড়ি দিল। জাহাজের নিচের অংশ বটে, কিন্তু অত বেশি শীত লাগছে না। কেমন এক গুমোট, স্যাঁতসেঁতে ভাব। বিজ্ থেকে আসা গন্ধ চরম অস্বস্তিকর।.

'আঁধারে ইঁদুর আসবে না তো, রানা?'

‘সেজন্যেই বাতিটা জ্বেলে রেখেছিলাম।’
‘ধুরো, মরুকগে, মুখের ওপর আলো নিয়ে ঘুমানর চাইতে ইঁদুরও ভালো।
আচ্ছা, গুডনাইট, রানা।’
‘গুডনাইট।’
কয়েক মিনিট জেগে রইল রানা। দপদপ করছে মাথার যন্ত্রণাটা। তারপর এমনই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল, টেরই পেল না, কোন্ ফাঁকে সকাল ছটা বেজে গেছে।

পাঁচ

সম্ভাব্য পরিকল্পনা আঁটতে তিনটে দিন লেগে গেল রানার। জেনকে সঙ্গে নিয়ে ছকটা এঁকেছে ও। ইতোমধ্যে মাথার জখমটা সেরে এসেছে প্রায়। আরেকবার একই জায়গায় বাড়ি না খেলে ওটা আর ভোগাবে না ।
গ্রেপ্তারকারীরা দিনে তিনবার করে আসছে, নিশ্চিত হয়েছে ওরা। একবার উচ্ছিষ্ট তুলে নিয়ে যাচ্ছে, একবার বাকেট পাল্টে দিচ্ছে এবং আরেকবার জগভর্তি পানি আনছে। ছটার আগ দিয়ে ডিনার সার্ভ করে, তারপর বাকি সময়টুকু আর বিরক্ত করে না ওদের।
ওয়ায়্যার ডোরের কব্জাগুলো সম্পর্কে রানা বিশেষ ভাবে আগ্রহী। তিন বল্টু দিয়ে দৃঢ়ভাবে ধাতুদণ্ডে আঁটা ও দুটো, এবং আরও তিনটি বল্টু ধাতব দরজাটায় আটকে রেখেছে ওগুলোকে। বল্টুগুলোকে ঢিল করতে লিভারেজ ব্যবহার করা যাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে রানার।
‘তোমার স্ক্রু-ড্রাইভারটা লাগবে, জেন,’ বলল রানা।
উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে উঠল জেন। দুটো ঢেউয়ের মাঝে পড়ে টালমাটাল এমুহূর্তে শেপ মাইয়ার।
‘কী করবে ওটা দিয়ে?’
‘বিসিআইতে একটা মেসেজ পাঠাতে চাই, তারপর আবার এখানে এসে আটকা পড়ব তোমার সঙ্গে। আমরা কোথায় আছি জানলে, ঢাকা বুঝবে কি করা উচিত, বা ইথিওপিয়ান কর্তৃপক্ষকে কতটা জানানো দরকার।’
একপাশে আবার কাত হয়ে গেল জাহাজ। ‘এমন রাতে বেরোয় কেউ!’ এস্ত কণ্ঠে বলল জেন ।
’এটাই তো সুযোগ। সাপ্লাই নিতে লকারে কারও আসার সম্ভাবনা নেই। আমরা কোন শব্দ-টব্দ করলেও শুনতে পাবে না।’
‘স্রোতে যদি আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়?’
’ভাসালে আমাদের নয়, আমাকে ভাসাবে। এখন বলো দেখি, এই এরিয়ার হ্যাচ কোনদিকে খোলে। আমাকে তো অজ্ঞান করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ?’
‘আমরা মেইন ডেকের চার ডেক নিচে আছি,’ জানাল জেন। ‘বো-র কাছে,
ডেক যেখানে তৈরি হয়েছে, ওখানে একটা হ্যাচ আছে। বড়সড় এক হ্যাচ আর মই নেমেছে দ্বিতীয় ধাপে। নিচের তিন লেভেলে, স্কাটলের পাশে লম্বালম্বি মই রয়েছে।’
‘মেইন ডেকের হ্যাচটা কি ব্রিজের দিকে মুখ করে খোলে?দ
‘হ্যাঁ।’
‘তার মানে ধরা পড়ার চান্স আরও বাড়ছে।’
ক্যামেরাটা খুলতে লাগল জেন। রীলের মাঝখান থেকে বেরোল ছোট্ট এক স্ক্রুড্রাইভার। কাজেই, রানাকে একপাটি জুতো খুলে, কব্জার পিন মুক্ত করতে হীল ব্যবহার করতে হল। উন্মাদের মত দুলে উঠল জাহাজটা, এতখানি দুলুনি সইতে হচ্ছে ওরা একদম সামনের দিকে রয়েছে বলে। পিনগুলো আলগা হয়ে গেলে, দরজাটাকে যথাস্থানে ধরে রাখল জেন এবং রানা ওগুলোকে তুলে দিল ওপরদিকে। এবার বের করে নিয়ে পিনগুলোকে রেখে দিল ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর, এবং দু’জনে মিলে বাইরের দিকে ঠেলা দিতে লাগল তারের জালটাকে। জোর ঘষা খেয়ে ঘড়-ঘড় শব্দ তুলল কব্জা, তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আলগোছে দরজাটা এক মানুষ বেরনোর মত ফাঁক করল রানা। দু’মুহূর্ত পরে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জেনের সঙ্গে আলাপটা সেরে নিল ও ।
নেটা বাজেনি এখনও। ঠিক হল এগারোটার আগেই রেডিও শ্যাকে পৌঁছবে রানা। জেন তথ্য জোগাল, মেরী এন্ডারসন এসময় ওটা বন্ধ করে ক্যাপ্টেনের কেবিনে যায়। রানা মনেপ্রাণে কামনা করছে ওসময় শিথিল থাকবে পাহারা, ডিউটির অর্ধেক সময় পার করে ক্লান্ত হয়ে পড়বে লুকআউটরা ।
স্কাটল তিনটে পেছনে বন্ধ করল রানা, খোলা হয়েছে ওগুলো বিশেষ নজর না দিলে বোঝার উপায় নেই। প্রয়োজনের সময়, হুইলে হালকা এক মোচড় দিলেই রানা খুলে ফেলতে পারবে। সেকেন্ড ডেকের চারধারে অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিল রানা, কিন্তু কোন ফাউল-ওয়েদার গিয়ার খুঁজে পেল না। কাজেই হ্যাচের মধ্যখানের স্কাল বেয়ে উঠে পড়ল ও মেইন ডেকে গিয়ে মিশেছে এটা-এবং বোসাস্ লকার তল্লাশী করে দেখল। কোন এক নাবিক পুরানো এক মোটা কাপড়ের ডাংগ্যারী আর একটা ফাউল-ওয়েদার জ্যাকেট ফেলে গেছে একটা বিনে। প্যান্ট ও জুতো খসিয়ে আঁটো ডাংগ্যারী আর জ্যাকেটটা গায়ে চড়াল রানা। শেপ মাইয়ার এ মুহূর্তে হেলেদুলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটছে। জাহাজের বো যখনই দেবে যাচ্ছে ঢেউয়ের নিচে ফো’ক্যাসলে আছড়ে পড়ছে জল। স্টোরেজ এরিয়ায় আরও অনুসন্ধান চালিয়ে বড় এক টুকরো ক্যানভাস ও একটা অয়েলস্কিন হ্যাট খুঁজে পেল রানা। আরও দু’টুকরো ক্যানভাস আবিষ্কার করল ও। তোয়ালে হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। বড় ক্যানভাসটা হ্যাচের পাশে ডেকে রাখবে ঠিক করল। ফাউল-ওয়েদার জ্যাকেট খুলে ফেলল ও, শার্ট খুলে, ট্রাউজার ও জুতোর সঙ্গে রেখে, জ্যাকেটটা পরে নিল আবার।
বাতি নিভিয়ে দিল রানা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, হ্যাচের প্রতিটি শিক খোলার প্রকাণ্ড লিভারটার ওপর হাত রাখল ও, অপেক্ষা করল জাহাজের বো যতক্ষণ না দেবে গিয়ে ফের উঠতে শুরু করল। তারপর হ্যাচ খুলল, ওটা গলে বেরিয়ে, ভেজা ডেকের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। ফরোয়ার্ড সুপারস্ট্রাকচারের উদ্দেশে দৌড়াচ্ছে ও।

পতন ঘটল আবার জাহাজের বো-র। পেছনে উঁচু জলের দেয়াল অনুভব করল রানা। সুপারস্ট্রাকচারের গায়ে শরীর ছুঁড়ে দিয়ে, কোমর সমান উচ্চতার সেফটি রেইল খপ করে থাবা মেরে ধরতে চাইল। জোরাল আঘাত হানল ওর গায়ে ঢেউটা। ধাম করে ধাতব বাড়ি খেতেই হুশ করে বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল রানার। ওকে ঘিরে পাক খাচ্ছে জল, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে ফেলতে চাইছে কালিগোলা রুদ্ররূপী আটলান্টিকে । প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল ও রেলিং, বুক ভরে নিল বাতাসে, দস্তুরমত লড়াই চালাচ্ছে ঝিম্‌ঝিম্ অনুভূতিটার সঙ্গে। মস্তিষ্কের নির্দেশে সাড়া দিতে চাইছে না পেশী । জলের স্তর গোড়ালির কাছে নেমে এলে, পোর্টসাইডের দিকে ঘুরে পথ করে নেয়ার চেষ্টা করল রানা। রেইল ধরে রেখে সুপারস্ট্রাকচারের গা ঘেঁষে রইল ও। ব্রিজটা তিন ডেক ওপরে, এবং অফিসার কিংবা লুকআউট কারোরই থাকার কথা নয় এখন ওখানে। হেলমসম্যানের সঙ্গে গাদাগাদি করে পাইলটহাউজে থাকবে ওরা। রানাকে ডেক ধরে ছুটতে যদি দেখে না থাকে, তবে এখন আর দেখবেও না।

পোর্টসাইডের এক মইয়ের কাছে পৌঁছতে না পৌছতে তেড়ে এল পরের ঢেউটা। দু'হাতে এক রাং জড়িয়ে ধরে ঝুলে রইল রানা। পানির ভাসিয়ে নেয়ার শক্তি আগেরবারের চাইতে এবারে কম হলেও, জাহাজের পাশ ঘেঁষে রয়েছে বলে রানার সাগরে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। ও সুপারস্ট্রাকচারের বাঁক ঘুরতে না ঘুরতেই ডেকের ওপর দিয়ে ধেয়ে এল তিন নম্বর স্রোতটা। অল্প একটুখানি জল কেবল ভেজাতে পারল ওর গোড়ালি ।

সুপারস্ট্রাকচারের আফটার ওয়ালে হেলান দিয়ে দম ফিরে পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করল রানা। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি রয়েছে ওরা। ফলে, জল অতখানি ঠাণ্ডা নয় যে পায়ের পাতা অসাড় করে দেবে। সাগরের বিরুদ্ধে প্রথম বাউটে জিতে গেছে রানা। কিন্তু আরও বিপজ্জনক দ্বিতীয় দফা লড়াই এখনও বাকি রয়ে গেছে-বোসানস লকারে ফিরতি যাত্রা। তার আগে, রেডিওশ্যাকে ঢুকে, মেরী এন্ডারসনকে কাবু করে, মেসেজ পাঠাতে হবে।

দুই সুপারস্ট্রাকচারের মাঝখানের মেন ডেকটা পরীক্ষা করল রানা। বেশিরভাগ জায়গাই ডুবে আছে অন্ধকারে, যদিও পোর্টহোলগুলো থেকে চুইয়ে আফটার সুপারস্ট্রাকচারে এসে পড়েছে ছোপ ছোপ আলো। জাহাজের মাঝখানটার দিকে সরে এল রানা এবং চট করে খুলেই লাগিয়ে দিল হ্যাচটা। টিপে টিপে পা ফেলে এবার এগিয়ে চলল ও এবং রেডিও শ্যাকের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান পাতল ।

কিছুই শোনা গেল না। রেডিও অপারেটর কোন ব্যান্ড যদি মনিটর করেও

থাকে, হয় ব্রিজে বাজছে সেটা আর নয়তো এয়ারফোন ব্যবহার করছে। ভেতরে উঁকি দিল রানা। একাকী মেয়েটি। দ্রুত পায়ে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, ভাবখানা এমন যেন শ্যাকে আসার যথার্থ কারণ আছে ওর।

বাঁয়ে কন্ট্রোল প্যানেল সামনে নিয়ে বসে আছে মেরী। কিছু টের পেয়ে মুখ তুলে তাকানোর আগেই ডান হাতের মাঝারি ওজনের এক কোপ পড়ল ওর ঘাড়ের ওপর। মুহূর্তে জ্ঞান হারাল মেয়েটি। তাড়াতাড়ি ওর পড়ন্ত দেহটা ধরে ফেলে, সামনের কী থেকে তুলে নিল। জোরাল গোলমাল হয় হোক, সার্কিট সংযুক্ত নয় ব্রিজে কিংবা ক্যাপ্টেনের কেবিনে। এখানে কিছু ঘটলে এখনই জানবে না ওরা। সাবধানে মেয়েটাকে চেয়ারের সামনে মেঝেতে শুইয়ে দিল রানা। আশা করল জ্ঞান ফিরে পাবার পর কি ঘটেছে স্পষ্ট মনে করতে পারবে না মেয়েটা; মনে করবে ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়ে ব্যথা পেয়েছে ঘাড়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সাবধানে দরজা ভেজিয়ে ছিটকিনি মেরে দিল রানা। মেরীর পালস চেক করে নিশ্চিন্ত হলো, চলছে। অতিকায় ট্রান্সমিটারটা স্টারবোর্ড বাল্কহেডের গায়ে ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওটার দিকে চেয়ে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল রানার। ও যা ভেবেছিল তার চাইতে অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী জিনিসটা।

ফ্রিকোয়েন্সি সেট করে, চাবি তুলে নিয়ে ট্রান্সমিটারের সামনে সরাসরি জুড়ে দিল। কন্ট্রোল বোর্ড কিভাবে কাজ করে অতশত ভাবার সময় নেই। রানা আশা করছে ডায়ালগুলো ওটার তুলনামূলকভাবে নিখুঁত। বিসিআইয়ের ফ্রিকোয়েন্সিতে ডায়াল সেট করল রানা। জাহাজ কোথায় আছে জানে না রানা, তবে বিসিআই হেডকোয়ার্টারের রেঞ্জের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই রয়েছে ও। যে-ই ডিউটিতে থাকুক না কেন, নিশ্চয়ই কাজ ফেলে ঘুমাচ্ছে না।

সাদামাঠা সিচুয়েশন রিপোর্ট পাঠাল রানা। কামনা করছে, যে-ই কপি করবে রাহাত খানের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেবে ওটা ।

'এম আর নাইন ধরা পড়েছে। মিশন নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমেরিকার টনক নড়ায় এজেন্ট পাঠিয়েছে। এম আর নাইন কাজ করছে তার সঙ্গে। চলেছে নির্ধারিত গন্তব্যে। -এম আর নাইন।' দু'বার পাঠাল ওটা রানা। তারপর কন্ট্রোলবোর্ডে চাবি রেখে, ট্রান্সমিটারে আগের ফ্রিকোয়েন্সি রিসেট করল। সন্তর্পণে এবার চলে এল দরজার কাছে।

প্যাসেজওয়ে থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল এসময় 'রেডিও শ্যাক বন্ধ কেন?'

'বুড়োর কেবিনে আজ আগেভাগেই চলে গেছে হয়তো।'

'কেন, একমাস পূরণের আগেই নিজের ডোজ শেষ করে ফেলেছে?'

তবুড়োরটা বুড়ো ওকে দিয়ে দেবে কষ্ট হলেও; বাজি ধরতে পারো।'

ততুমি বা আমি হলেও দিতাম। বিনিময়ে যা পেতাম সেটাও কম না !দ সশব্দ হাসি। মেইন ডেকের ওপরে যাওয়ার হ্যাচটা বন্ধ হল দড়াম করে। লোক দুটো ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলছিল। আফটার সুপারস্ট্রাকচারে ওদের পৌঁছতে কমপক্ষে দু'মিনিট লেগে যাবে।

হঠাৎ একটা চিন্তা ঘাই মারল রানার মগজে। কিসের ডোজ? তাহলে কি কোনরকমের ড্রাগ দিয়ে লোকগুলোকে নিজের পক্ষে রেখেছে মালদিনি? ডানাকিলদের বেলায় সেটা সত্যি হতেও পারে, কিন্তু নিও ফ্যাসিস্টদেরও বারোটা বাজাচ্ছে লোকটা? ম্যাকলিন? দেখে তো মনে হয় না। নাকি সে ব্যতিক্রম? ভিন্ন খাতে চিন্তাস্রোত ঘুরিয়ে দিল রানা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওকে ধরিয়ে দেবে না তো? কিন্তু যুক্তিটা অসার ঠেকল নিজের কাছেই। শেপ মাইয়ারের মত জাহাজে এত সূদ

পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকতে পারে না ।

আলগোছে দরজা দিয়ে বেরিয়ে, হ্যাচের উদ্দেশে তড়িঘড়ি পা চালাল রানা। বিনা বাধায় মেইন ডেকে বেরিয়ে এল। পেছন দিক দিয়ে ঘুরে, পথ করে নিয়ে সুপারস্ট্রাকচারের পাশে চলে এল রানা। এমনভাবে সময় মেপে দৌড়টা দিল, যাতে বো ডিঙিয়ে পানি আসার আগেই মইয়ের নাগাল পায়। টায়ে টায়ে পরীক্ষাটায় পাশ করল। দ্বিতীয় দফা চেষ্টায় সুপারস্ট্রাকচারের সামনের অংশে পৌঁছতে পারল ও। এবং ঢেউয়ের আঘাতে আবারও ছিটকে গিয়ে পড়ল জাহাজের ধাতব দেহে। হ্যান্ডরেইল আঁকড়ে ধরে টিকে থাকতে হলো। সামনে যে এগোবে, শরীরে জোর পাচ্ছে না রানা। কতক্ষণ লড়াই চালাতে পারে একটা মানুষ ফুঁসে ওঠা মহাসাগরের বিরুদ্ধে? আরও দুটো জলোচ্ছ্বাস আসতে দিয়ে সুপারস্ট্রাকচারের বাড়ি হজম করল রানা।

এতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্রী আবহাওয়া সহায়তা করেছে ওকে। কিন্তু এখন, এক ছুটে হ্যাচের কাছে পৌঁছতে না পারলে, ভেসে যেতে হবে জাহাজ থেকে। কাজটা মোটেই সহজ নয় । কার্গো বুম ঘেঁষে ছোটার চেষ্টা করবে ও। আবছা কালো এক আকৃতির রূপে ওটা ধরা দিচ্ছে চোখে। একবারের চেষ্টায় হ্যাচের কাছে যেতে না পারলেও, বুম আঁকড়ে ধরে সাগরের ঝাপ্টা কাটাতে পারবে আশা করছে রানা ।

ঢল এল আবারও, আগেরগুলোর মত উঁচু কিংবা জোরদার নয় যদিও। বো উঠে যেতে এবং জল কমে যেতে শুরু করতেই ছপ ছপ করে সামনে এগোল রানা, কাত হয়ে পড়া পিচ্ছিল ডেকে পতন সামলাতে রীতিমত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। হাঁটু থেকে নেমে গোড়ালির সমান এখন জল; ধুপধাপ পা ফেলে যত দ্রুত সম্ভব ছুটছে রানা। কার্গো বুম অতিক্রম করল। সাঁত করে আচমকা নাক দাবাল জাহাজ-এতই ত্বরিত গতিতে যে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য রানা যথাসময়ে থমকে দাঁড়িয়ে বুম ধরতে ব্যর্থ হল। বো ঘিরে গল গল, ছপাৎ ছপাৎ নানারকম শব্দ করে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে জল। মুখ তুলে চাইতে, মাথার ওপরে সাদা ফেনার মুকুট লক্ষ করল রানা। নিচু যে স্ট্রাকচারটার উদ্দেশে এগোচ্ছিল ঢাকা পড়ে গেছে সেটা ।

সামনে ঝাঁপ দিল মাসুদ রানা অন্ধের মত, হ্যাচ কিংবা মেটাল লেজ, কোন একটার নিচে আড়াল নিতে হবে। কামনা করছে সময়ের হেরফের করে প্রিয় মাথাটা ছাতু হতে দেবে না। টনকে টন পানি আছড়ে পড়ছে নিচে টের পাচ্ছে। শরীর এ মুহূর্তে প্রায় আনুভূমিক ওর, খোলার ও বন্ধ করার লিভারটা বাগে পেতে হাতড়াচ্ছে দুহাত। দেহের নিম্নাংশে আঘাত হানল পানি, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে; ডেকের দিকে টেনে হিঁচড়ে ফিরিয়ে নিতে চাইছে সুপারস্ট্রাকচারের কাছে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে জাহাজ থেকে। শেষ মুহূর্তে লিভারের নাগাল পেল রানার আঙুল। বাঁ হাতটা পিছলে গেলেও ডান হাত ওটাকে ছাড়ল না, কব্জি মুচড়ে গিয়ে অসহ্য ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল বাহুমূল পর্যন্ত। কাঁধের পেশী ছিঁড়ে যায় কিনা ভয় পেল রানা ।

আঁটো ড্যাংগারির বাঁধনটা খুলে গেল কোমরের কাছ থেকে। ড্যাংগারিটা টেনে খানিক নামিয়ে দিয়েছে প্রবল স্রোত। ওভারহ্যাঙের নিচে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে পানি, রানার চোখে-মুখে লবণ ছিটিয়ে শ্বাস কেড়ে নিতে চাইছে। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত মাথার জখমটা এসময় দাপাতে আরম্ভ করল। শেপ মাইয়ার এক্ষুণি ঢেউয়ের নিচ থেকে নাক না তুলতে পারলে, ফো'ক্যাসলে ভাসমান ওই আলগা যন্ত্রপাতিগুলোর মত একই দশা হবে রানার।

অবিশ্বাস্য ধীর গতিতে, মনে হল ওর, জাহাজটার বো শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করল। গাল চাটা ছেড়ে শরীরের কাছ থেকে হড়হড় করে সরে গেল জল । গোড়ালির কাছে তালগোল পাকিয়ে গেছে ভেজা ড্যাংগারি, কাজেই হ্যাচ লিভারে হাতের চাপ দিয়ে ওপরে টেনে তুলল নিজেকে রানা। মরিয়ার মত লাথি মেরে চুপচুপে জিনিসটা দেহ থেকে খসাল ও। ছপাৎ করে ডেকের ওপর পড়ে ভেসে চলে গেল ওটা বানের জলে। জাহাজটা এ মুহূর্তে তরতর করে উঠে যাচ্ছে ওপরদিকে, ঢেউয়ের চূড়ায় ক্ষণিকের জন্যে চড়ে আরেকটা বিশাল ঢেউ ভেদ করার জন্যে ঝাঁপ দিল ।

লিভার তোলার চেষ্টা করল রানা অনর্থক। ভুলটা বুঝতে পারল ও। শেষ ঢেউটা সামলানোর সময় রানার দেহের চাপ খেয়ে শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে ফাঁকগুলো। ওয়াটারটাইট বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে এত অটুট দৃঢ়তার দরকার পড়ে না। লিভার কেন নড়ে না এর ওপর বিশেষজ্ঞ হলেই বা লাভ কি? পরবর্তী ঢেউটা তো রানার জ্ঞান-গরিমার জন্যে ছাড় দেবে না। আরেকটা প্রবল আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা কি আছে ওর?

শেপ মাইয়ারের বো-র দ্রুত অবনতি ঘটছে। দেহ সাপের মত গুটিয়ে বাঁ কাঁধ দিয়ে আঘাত করল রানা লিভারে। খুলে ওপরদিকে উঠে গেল ওটা। টান মেরে হ্যাচ খুলল রানা। কিনারা আঁকড়ে ধরে, কাত হয়ে শরীর গলিয়ে দিল, বাঁ হাত বোসানুস্ লকারের ভেতরকার লিভার খুঁজছে। সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়তে, ধাতব লিভারটা হাতে পেয়ে গেল। দুম করে পেছনে লেগে গেল হ্যাচ। রানা গর্ত বন্ধ করার চেষ্টা করতে মাথার ওপরে ডেকে, আছড়ে পড়ল পানি। হ্যাচের মাঝখানের খুব কাছে রয়েছে ওর হাত । পেছনে সরে এসে, কসরৎ করে শরীর মোচড়াল রানা, লিভারের ওপর সজোরে পড়ল ডান হাত। কিনারা গলে চুইয়ে ঢুকল পানি, কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল ফাঁক। ইস্পাতের হ্যাচে বাড়ি খেল ওর মাথা। আগুন ধরে গেল যেন খুলির ভেতর, গুঙিয়ে উঠল রানা। মাথার ভেতর ঝলসে উঠল একাধিক উজ্জ্বল বাতি।

হাঁটু ভেঙে স্টীল ডেকে পেতে রাখা ক্যানভাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ও। দুলে উঠল গোটা দুনিয়া-জাহাজের গতির সঙ্গে তাল রেখে নাকি নতুন আঘাতটার কারণে, জানে না রানা। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে মাথা।

সামুদ্রিক ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলেছে শেপ মাইয়ার ।

ছয়

দুই, বড়ো জোর তিন মিনিট বিশ্রাম নিল রানা। সময়টুকু যদিও ঢের লম্বা মনে হল ওর কাছে। হাতঘড়ি বলছে দশটা পঁয়ত্রিশ। কিন্তু এখন নটা পঁয়ত্রিশ কিংবা এগারোটা পঁয়ত্রিশ হওয়াও বিচিত্র নয় টাইম জোনের পরিবর্তন শুধুমাত্র আন্দাজের ওপর ধারণা করছে রানা।

সুইচটা খুঁজে পেয়ে জ্বালল ও। খুব সাবধানে, বোসানস লকার ত্যাগের আগে মাথায় এঁটে বসানো হ্যাটটা খুলল। একটুকরো ক্যানভাসে হাত দুটো মুছে নিয়ে চুলে আঙুল বুলাল রানা। কোণার দিকগুলো সামান্য ভিজে হলেও চাঁদিটা শুকনো খটখটে। হ্যাটখানা দুমড়ে মুচড়ে ভেজা জায়গাগুলো ঢাকার চেষ্টা করল ও।

ফাউল-ওয়েদার জ্যাকেট শরীরচ্যুত হলো এরপর। ওটাকে ক্যানভাসে ফেলে দিয়ে গা শুকোতে লাগল রানা। আন্ডারশর্টস ওর ভিজে জবজব করছে। কাজেই খুলে ফেলে নিংড়ে নিতে হলো। শরীর ভেজা নয়, শুকনো; নিশ্চিত হয়ে, ক্যানভাসের ছোট টুকরো দুটো আর জ্যাকেটটা গুটিয়ে গোল করে নিল রানা। এবার ক্যানভাসের বড় খণ্ডটার ভেতর ওগুলো ভরে বান্ডিলটা বয়ে নিয়ে গেল বোসানস লকারের ও মাথায়। আরও কিছু গিয়ার ও ক্যানভাসের পেছনে একটা বিনে গুঁজে দিল ওটা।

ক্যাচ করে হঠাৎ একটা শব্দ হল। হাতের কাছে এক মেটাল পাইপ পেয়ে তুলে নিয়ে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। নিচের লেভেলে চলে যাওয়া স্কালটা খুলে যাচ্ছে। লাফ দেয়ার জন্যে ঝুঁকেছে এমনিসময় মেঘবরণ দীঘল চুল ও কালো - কুচকুচে একজোড়া চোখ দেখতে পেল ।

'রানা?' জেন এসেক্সের কণ্ঠস্বর।

'আরেকটু হলেই মরতে।'

'ওই গর্তে অপেক্ষা করতে করতে পাগল হওয়ার দশা। মেসেজ পাঠাতে পেরেছ?'

- জানাল রানা। ডেকের যেখানটায় জল ইঞ্চি দুয়েক ছিটকে উঠছে সে জায়গাটা নির্দেশ করল ও। 'এসো না,' বলল। 'নিচে জলের ছাপ না পেলে প্রমাণ হবে জেলখানা থেকে বেরোইনি আমরা। মইয়ের কাছ থেকে এক মিনিট একটু দূরে থাকো।'

তখনও নগ্ন, জুতো-মোজা, খাকি ট্রাউজার, পরিচ্ছন্ন শার্ট ও ভেজা শর্টস জড় করল রানা। ঝুঁকে পড়ে স্কাল দিয়ে ছেড়ে দিল ওগুলো নিচের ডেকে। তারপর মুখ রাখল নিচে, জেনকে যাতে দেখতে পারে।

'একটা কাপড় লাগবে পা মোছার জন্যে ।'

জেনকে মইয়ে না দেখতে পাওয়া অবধি অপেক্ষা করল রানা, এবার হ্যাচের ওপর বসে সতর্কতার সঙ্গে পা দুলিয়ে নামিয়ে দিল স্কালে। মোটা, রুক্ষ কাপড় দিয়ে জেন পা মুছে দিচ্ছে টের পেল।

'হয়েছে,' বলল জেন ।

মই বেয়ে ত্বরিত নেমে গেল রানা, স্কালটা টেনে পেছনে বন্ধ করে, হুইল ঘুরিয়ে দিল। ডেকে পৌঁছে জেনের দিকে চাইল ও। রানার পাশে দাঁড়িয়ে যুবতী, হাতে ডেনিম শর্টস। এটা ছাড়া আর কিছু পেলাম না।'

'চলো,' আদেশ করল রানা। 'খাঁচায় ফিরে যাই।

প্যান্ট পরে নিল ও, কিন্তু মাথা ঘামাল না অন্যান্য কাপড়-চোপড় নিয়ে । ভেজা শর্টস পরেনি জেন। জেলখানায় ফিরে ব্ল্যাঙ্কেটে পোশাকগুলো ছুঁড়ে দিল ওরা। রানা ওয়্যার ডোর চেপে ধরে যথাস্থানে ওটাকে টেনে ফেরানোর চেষ্টা করছে, ওদিকে ব্ল্যাঙ্কেট হাতড়ে কব্জার পিনগুলো কুড়িয়ে নিল জেন। দশ মিনিট লেগে গেল ওগুলোকে জায়গা মত বসাতে।

আফটার বাল্কহেডের গায়ে হাত বুলিয়ে আঙুল নোংরা করল রানা। পিনে আর কব্জায় নোংরা মাখাচ্ছে ও. ইতোমধ্যে ক্যামেরা জুড়ে ফেলল জেন।

ঠিক পঁচিশ মিনিট বাদে এল ওরা। ব্ল্যাঙ্কেটে তখন পাশাপাশি শুয়ে রানা ও জেন। স্কাল খুলে যেতে সশস্ত্র এক নাবিক প্রবেশ করল কারাগারে ।

'আমাকে সামলাতে দাও,' ফিসফিস করে বলল জেন। দ্বিমত করল না রানা।

'ওরা এখানেই আছে,' বলল সেইলর ম্যাকলিনকে। 'বললাম না তোমাকে...'

'জাহাজ কি ডুবছে?' হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জেন, আঁকড়ে ধরেছে তারের জাল। 'রানা, আমরা ডুবে যাচ্ছি!'

'বাজে কথা ছাড়ো, ধমকে উঠল ম্যাকলিন ।

তার ধরে টানাটানি লাগিয়ে দিল জেন। 'আমাকে এখান থেকে বেরোতে দাও!' বলে উঠল ও। ওর আক্রমণের ফলে রীতিমত কাঁপুনি উঠে গেছে দরজাটার। 'আমি এভাবে ডুবে মরতে চাই না, বাঁচার একটা সুযোগ চাই।'

'চোপ!' কড়া ধাতানি দিল ম্যাকলিন।

'ওকে ধমকাচ্ছ কেন?' কঠোর কণ্ঠে জবাব চাইল রানা ।

'তোমার খুব লাগছে বুঝি?' বিদ্রূপ ঝরল ম্যাকলিনের কণ্ঠে জ্জ

'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও,' হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত চেঁচাচ্ছে জেন, দু'চোখে বান ডেকে এনেছে। 'তুমি যা বলবে তাই করব। দোহাই , বাঁচাও আমাকে।'

তকেন, আজ সন্ধেবেলা বেরোওনি তুমি?'

'কি বলছ আবোল তাবোল,' বলল জেন, ফোঁপানির জোর আরও বাড়ল।

'থামবে তুমি?' গর্জে উঠল ম্যাকলিন। 'নাকি পেটে গুলি করতে বলব?'

এবার রানার দিকে চাইল। 'কতক্ষণ ধরে চলছে এই ন্যাকামি?'

'সেই সন্ধে থেকে। সাগর যখন থেকে ফুঁসে উঠল। মেস স্টুয়ার্ডকে দিয়ে মিস জেনের জন্যে এক শট হুইস্কি পাঠাও না কেন?'

'পাগল নাকি? ডেকের অবস্থা জানা আছে তোমার?'

'কি করে জানব?'

'তা বটে।' কম্পার্টমেন্টের চারধারে নজর বুলাল ও। গার্ডের উদ্দেশে বলল, 'ক্যাপ্টেনকে বললাম এরা এখানে আছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। প্রেমিকা ঘুমের ঘোরে ব্যথা পাওয়ায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুড়োর ।

রানা বা জেন বেরতে পেরেছিল ম্যাকলিন তা বিশ্বাস করেনি । স্বস্তির শ্বাস গোপন করল রানা।

ম্যাকলিন সঙ্গীকে নিয়ে চলে গেলে রানার কাছ ঘেঁষে এল জেন। ওকে

হাসতে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'চালিয়ে যাও। ওরা হয়তো কান পেতে আছে।' আরও মিনিট চারেক অভিনয় পর্ব চলল জেনের। রানা মুগ্ধ হয়ে গেল ওর পারফরমেন্স দেখে ।

'মৈরী এন্ডারসনের কথা কি যেন বলল লোকটা?' যুবতী জিজ্ঞেস করল শেষমেশ।

খোলসা করে পুরোটা জানাল ওকে মাসুদ রানা।

পরদিন রেড সি-তে আটকা পড়ে গেল ওরা। শেপ মাইয়ারের পাশে এসে ঠেকেছে এক আরবী সমুদ্রগামী জাহাজ। ফরোয়ার্ড কার্গো বুম স্থানীয় জাহাজটিতে চালান করে দিল মিসাইলগুলো। কার্গো নেটে করে ডাউতে তুলে দেয়া হলো রানা ও জেনকে, নরওয়েজিয়ান নাবিকরা কভার করল পেছন থেকে, এবং সামনে থেকে রাইফেল তাক করে ধরল ডাউয়ের আরব আগন্তুকরা। মিস্টার ম্যাকলিন সঙ্গ দিল রানাদের। কাঠের রেইলে হেলান দিয়ে শেপ মাইয়ারকে সরে যেতে দেখল রানা । প্রথমে, শুধুমাত্র ওটার পোর্ট রানিং লাইট দেখতে পেল; তারপর বড় হল ফাঁকটা, দেখা দিল স্টার্নের সাদা রেঞ্জ লাইট।

পেছন থেকে এসময় আরবী ভাষায় আদেশ জারি হলো। বুঝতে পেরেছে তার লক্ষণ দেখাল না রানা।

'তোমার প্যাসেজ মানি কাজে লাগল,' বলল ম্যাকলিন।

'মালদিনি?'

'হ্যাঁ। তুমিও যাচ্ছ তাঁর কাছে।'

ম্যাকলিনের আদেশে, নিচের ডেকে নিয়ে গিয়ে কেবিনে বন্দি করা হল রানা ও জেনকে । শেষ যে জিনিসটা দেখতে পেল রানা সেটা হচ্ছে তেকোনা এক পাল, উঠে যাচ্ছে ওপরদিকে। জাহাজের চলনভঙ্গি নিশ্চিত করল মাটির ঢিবির ফাঁকফোকর দিয়ে ইথিওপিয়ান কোস্টলাইনের উদ্দেশে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে ওটা ।

দেয়াল ভেদ করে টুকরো-টাকরা কথোপকথন যা কানে এল, তাতে নিশ্চিত হলো রানা ওর অনুমান নির্ভুল - আসাবের উত্তরে এবং মাসাওয়ার দক্ষিণে কোথাও রয়েছে ওরা। নোঙর ফেলল জাহাজ। এক দঙ্গল লোক উঠে এল জাহাজে, ডেকের ওপর দিয়ে ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাক্স। প্যাকিং কেস খোলার শব্দ বেশ কবার পেল রানা।

'মিসাইলগুলো কতখানি নিরাপদ?' ফিসফিস করে জেনকে জিজ্ঞেস করল ও।

'জানি না । আমাকে বলা হয়েছে মালদিনি ওঅরহেডের জন্যে ডিটোনেটর চুরি করেনি, এবং আমার জানা আছে ফুয়েল নেই ওগুলোর মধ্যে।'

শব্দের সঙ্গে রানার অনুমানের সাযুজ্য থাকলে বলতে হবে, রবার্তো মালদিনি রীতিমত সুদক্ষ এক সংগঠনের কর্ণধার। লোকে মিসাইল বলতে দু'তিন ভাগে বিভক্ত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিলিণ্ডারসদৃশ মৃত্যু-এঞ্জিন মনে করলেও, আসলে অসংখ্য খুদে খুদে যন্ত্রাংশ জুড়ে তৈরি করা হয় জিনিসটাকে। সুযোগ্য মিসাইল এক্সপার্টের তত্ত্বাবধানে যে কোন বড়সড় ওঅর্ক-ক্রু এক রাতে কমপক্ষে গোটা তিনেক মিসাইল খুলে আলাদা করতে পারে। আওয়াজ বলছে, মাথার ওপর দলে-বলে যথেষ্ট ভারী এ জাহাজের ক্রুরা।

গুমোট হয়ে উঠছে ক্রমেই কেবিনের ভেতরটা। ইথিওপিয়ার ইরিট্রিয়ান উপকূল দুনিয়ার অন্যতম উত্তপ্ত এলাকা, তাও সূর্য এখনও মাথার ওপর চড়াও হয়নি। একটু পরে কেবিনের দরজা খুলে গেল। এক রাশান মেশিন পিস্তল হাতে ম্যাকলিনকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। পেছনে রাইফেলধারী দুই নাবিক। তৃতীয় নাবিক বয়ে এনেছে একগাদা কাপড়-চোপড় ।

'কোথায় যাচ্ছ জানতে তুমি, মিস্টার রানা,' বলল ম্যাকলিন। 'তোমার বুট আমার পায়ে লাগলে ওগুলো আর ফেরত পেতে না। মরুভূমিতে হোঁচট খেতে খেতে মরতে।'

'আমার ডাল ব্যাগ থেকে পুরো ডেজার্ট কিট বের করেছ বুঝি?'

'না। শুধু বুটজোড়া আর কিছু ভারী ভারী মোজা। মিস জেনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। এছাড়া বাকি কাপড়গুলো স্থানীয় আরবী পোশাক।'

পোশাক বহনকারীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ও। কাঠের ডেকে ঝপাৎ করে ফেলে দিল লোকটা ওগুলো। ম্যাকলিনের দ্বিতীয় নডে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাকলিন পেছনে হেঁটে, মেশিন পিস্তল অকম্প হাতে তাক করে রাখল বন্দিদের দিকে।

'কাপড় পাল্টে নাও,' আদেশ করল চলে যাওয়ার আগে। 'তসিংহ কিংবা হায়েনার পেটে গেলেও বুট আর ঘড়ি দেখে তোমার লাশ চিনতে পারব আশা করছি।' দুম করে দরজা লাগিয়ে তালা মেরে দিল ও।

খানিক বাদে ফিরে এসে রানা ও জেনকে তীরে নামার আদেশ দিল ম্যাকলিন। ইতোমধ্যে কাপড় পাল্টে ফেলেছে ওরা। ঢলঢলে আরবী আলখাল্লায়, এই গরমের দেশে বরং স্বচ্ছন্দ বোধ করছে রানা। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ যেহেতু মুসলমান, বোরখায় মুখ ঢেকে রাখতে পরামর্শ দিয়েছে ও জেনকে। হ্যাট পরে নিয়ে, জেনকে সঙ্গে করে টপসাইডে চলে এল রানা। ছোট্ট উপসাগরের ঘন নীল পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সূর্য তার সমস্ত তাপ নিয়ে। পশ্চিমে, বিস্তৃত ওয়েইল্যান্ড পড়ে রয়েছে রানাদের সামনে। দড়ির মই বেয়ে ছোট্ট এক বোটে নেমে, ত্বরিত চালান হয়ে গেল ওরা তীরে ১

জেন ইতিউতি চেয়ে রিসিভ করতে আসা ট্রাক খুঁজছে। কিন্তু কোথাও নাম-গন্ধ নেই তার।

'হাঁটছি আমরা,' ম্যাকলিন ঘোষণা করল।

দু'মাইল হেঁটে ইনল্যান্ডের ভেতর ঢুকে পড়ল ওরা। দু'বার রাস্তা অতিক্রম করল, বালি ও পাথরের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া ট্র্যাকে ট্রাকের চাকার গভীর দাগ আবিষ্কার করল। রাস্তায় পড়ামাত্র মিছিল থামিয়ে দিচ্ছে ম্যাকলিন, বিনকিউলার নিয়ে লোক চলে যাচ্ছে সামনে গাড়ি-ঘোড়া আসে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে।

বেশিরভাগ অঞ্চলে ধু-ধু বালি, তবে মরুভূমির এখানে সেখানে পাথরে ঘেরাও ছোটখাটো পাহাড় ও অ্যারোয়ো দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় রাস্তাটা ছেড়ে আসার অনেকক্ষণ পরে উত্তরমুখো হলো দলটা। প্রবেশ করল অসংখ্য ছোট ক্যানিয়নের একটিতে। এখানে এক উট বহরের সঙ্গে মিলিত হল ওরা।

পাথরের আড়ালে লুকানো ছিল পঁচাত্তরটার মত উট। চালক রয়েছে মনে হল প্রত্যেকটার। লোকগুলো জগাখিচুড়ি ভাষায় হৈ-হট্টগোল

বাধিয়ে দিল। আরবী ভাষাটা শুধু চিনতে পারল রানা। আরবী ঘেঁষা সোমালী আঞ্চলিক ভাষাও বলছে কেউ কেউ। নেতা গোছের লোকগুলোকে খুঁজে নিতে বেগ পেতে হয় না। পোশাক ভিন্ন, পাথরের ছায়ায় হ্যাটবিহীন তারা। হালকা বাদামি গায়ের রং তাদের, উচ্চতা মাঝারি, উঁচু, পাকানো চুল। ব্রেসলেট ও কানের দুলের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখা গেল এদের। ঝট করে মনে পড়ে গেল রানার বিসিআইয়ের সাবধানবাণী-ডানাকিল গোত্র, মমরুভূমির নামানুসারে যাদের না -বড় নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর জাতি। প্রথম শত্রুনিধনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কান ফুটো করে এরা, ব্রেসলেটগুলো হল যোদ্ধারা কতজন প্রতিপক্ষ হত্যা করেছে তার সাক্ষ্য ।

এক শক্তসমর্থ, ধূসরচুলো ডানাকিল এগিয়ে এল পাথরস্তূপের আড়াল থেকে। 'এ হচ্ছে সাচ্চি, ইতালিয়ানে বলল ম্যাকলিন। 'নাম আসলে সাচ্চি না, কিন্তু উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায় তাই এ নামে ডাকা।' ডানাকিল লোকটা ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ম্যাকলিনের মুখের দিকে। বাঁ হাত দুলিয়ে অস্ত্র নামিয়ে রাখতে ইঙ্গিত করল ম্যাকলিনকে। বিশালদেহী নাবিক প্রতিবাদ করতে মুখ খুলে, আবার কি ভেবে চুপ মেরে গেল। ডানাকিল এবার রানাদের উদ্দেশে ঘুরে তাকাল। 'রানা', আঙুল-ইশারায় বলল।

'জেন।' যুবতীর দিকে চাইল ।

সায় জানাল মাসুদ রানা।

ওর ইতালিয়ান সাবলীল নয়। তবে খারাপও নয়। 'আমি তোমাদের ক্যারাভানের কমান্ডার। তিন ক্যারাভানে যাব । হাঁটতে হবে । '

'কদ্দূর?' জানতে চাইল রানা।

'কয়েক দিন। উটেরা জল আর মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে জেনারেল মালদিনির জন্যে। নারী-পুরুষ সবাই হাঁটবে। এই মরুভূমিতে আমার লোকজন আর মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু নেই। ডানাকিল ছাড়া কেউ পানি পাবে না। বোঝা গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। এসময় কথা বলে উঠল ম্যাকলিন। 'সাচ্চি, এ বড় ডেঞ্জারাস লোক । মানুষ খুন করতে হাত কাঁপে না...'

'তোমার কি ধারণা আমার কাঁপে?' বাহুর ব্রেসলেটগুলো স্পর্শ করল সাচ্চি। তারপর ঘুরে হাঁটা দিল।

চোদ্দটা ব্রেসলেট, গুণতে ভুল হয়ে না থাকলে, পরে রয়েছে লোকটা। স্থানীয় রেকর্ড কিনা কে জানে, ভাবল রানা।

সকাল গড়ালে পর, দলের তিন ভাগের এক ভাগ একটা ক্যারাভান গঠন করে বিদায় নিল। মনে মনে ওদের সংগঠনের তারিফ করল রানা। ডানাকিল উপজাতি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও কর্মঠ। উট ও চালকদের দ্রুত সারিবদ্ধ করল ওরা, বন্দি ও বাড়তি লোকদের মাঝে রেখে, রওনা দিল। ওদের চোখ আশপাশের গ্রামাঞ্চল ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছে, যদিও অ্যারোয়োর ঘেরাওয়ের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে তারা।

উটচালকরা পর্যন্ত সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখছে। নেতারা যেখানেই জায়গা নিক না কেন আপত্তি করছে না ওরা। বন্দিদের প্রতি পাহারাদাররা চেঁচামেচি করছে না কিংবা চাবুক আছড়াচ্ছে না। তার বদলে শান্ত গলায় আদেশ করছে, চট করে পালিত হচ্ছে সে আদেশ। বন্দিরা রানাকে কৌতূহলী করে তুলল।

এদের কারও কারও কোমরে শিকল, যদিও ভারী লোহা অপসারণ করা হয়েছে। মহিলা আছে বেশ কিছু, বেশিরভাগের গায়ের রংই কালো কুচকুচে ।

'এরা কি ক্রীতদাসী নাকি?' মৃদু কণ্ঠে শুধাল জেন ।

'হ্যাঁ।'

'ইস, আমি যদি ওদের মতন হতে পারতাম,' ছেলেমানুষী কণ্ঠে বলল জেন ।

'পারবে না।' বলল রানা।

'কেন?'

'কারণ তুমি একজন পেশাদার এজেন্ট। আমার মনে হয় না কোন গোত্রপতির উপপত্নী হওয়ার কপাল নিয়ে জন্মেছ তুমি। মালদিনি জানতে চায় আমরা কতটা জানি। লোকটা সম্ভবত ভয়ানক নিষ্ঠুর। ওকে মজাতে পারবে না তুমি।'

'ধন্যবাদ,' বলল জেন। 'আমাকে ভালই আশ্বস্ত করলে তুমি।

'চুপ করবে তোমরা?' খেঁকিয়ে উঠল হঠাৎ ম্যাকলিন।

'তুমি উটের খুরের নিচে মাথাটা পাতবে? পাল্টা বলল জেন।

মেয়েটির দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গেল রানা। ওদিকে, তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছে ম্যাকলিন। ওর কর্কশ হুঙ্কারে এলাকার প্রতিটা উট আঁতকে উঠল। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে, বোল্ডারে রানার পাশে বসে থাকা জেনের উদ্দেশে ঘুসি ছুঁড়ল লোকটা। ওর বাহু খপ করে ধরে ফেলল রানা, দেহের ওজন সামনে ছুঁড়ে দিয়ে, মোচড় মারল কাঁধ ও নিতম্বে-চিতপাত হয়ে ভূতলশায়ী হলো ম্যাকলিন।

ক'জন ডানাকিল দৌড়ে এল এদিকে। ম্যাকলিনকে ধুলোয় গড়াতে দেখে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল কেউ কেউ। কথার তুবড়ি ছুটতে বোঝা গেল, যারা দেখেনি তাদেরকে ঘটনার বয়ান দিচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীরা।

ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়েছে ইতোমধ্যে ম্যাকলিন। 'তুমি বাঁচবে না, রানা, ' চাপা কণ্ঠে বলল ।

ঘিরে থাকা জনতার মাঝে সাচ্চিকে লক্ষ করল রানা। ডানাকিলদের মতলবটা কি অনুমান করার চেষ্টা করল। ওরা কি বাধা দেবে, নাকি উৎসাহ? রানার হাতে ম্যাকলিন মারা পড়লে তখন কি হবে?

ম্যাকলিন লোকটা ইয়া লম্বা, ছ'ফিট তিন নিদেনপক্ষে, বাড়তি চল্লিশ পাউন্ড বহন করছে দেহে। বিদঘুটে ভঙ্গিতে দু'হাত শূন্যে তুলে রানার দিকে এগিয়ে এল। কয়েক পা হেঁটেই হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে এল লোকটা। একপাশে সরে গেল রানা, জায়গা পরিবর্তনের সময় ডান পা তুলে কষে লাথি ঝাড়ল । ঢোলা আলখাল্লার কারণে মারটা জুতসই হলো না, নইলে ওই লাথি খেয়ে যে-কারও দু'ভাঁজ হয়ে যাওয়ার কথা। কাপড়ে জড়িয়ে গিয়ে, ম্যাকলিনের সোলার প্লেক্সাসে অপেক্ষাকৃত দুর্বল লাথি হানল রানার পা। 'হুঁক' শব্দ করে তাল হারিয়ে সামনে হোঁচট খেল লোকটা।

মাটিতে ডিগবাজি খেয়ে এক গড়ান দিয়ে উঠল রানা, চোখা পাথরের খোঁচায় পিঠে ছুরি বিধল যেন। সটান লাফিয়ে উঠে টলমল পায়ে পিছু হটে গেল ও। অনুভব করল পিঠে ধাক্কা দিয়ে বেষ্টনী থেকে লড়াইয়ের

ময়দানে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে ওকে।
ক্রুদ্ধ লোকটা ধেয়ে এল আবারও। ওর ডান হাতটা বাম কনুই দিয়ে ঠেকাল রানা, শরীর বাঁকিয়ে পাঞ্চটার আংশিক ফিরিয়ে দিল, তারপর দুম করে বাঁ হাত চালিয়ে দিল প্রতিপক্ষের চোখ লক্ষ্য করে। অস্ফুট আর্তধ্বনি করে মাথা ঝাড়া দিল লোকটা। বাঁ হাত ঘুরিয়ে রানার পাঁজরে সর্বশক্তিতে আঘাত হানল ।
দম বন্ধ করা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল রানার দেহে।
আক্রমণ করল ফের ক্ষিপ্ত ম্যাকলিন। দু'হাত সমানে চলছে। রানা ওর বাহুর নিচে ডুব মেরে, বুকে মাথা রেখে পিস্টনের মতো দ্রুতবেগে হাত চালাতে লাগল পাজর ও তলপেট বরাবর। প্রকাণ্ড দুটো মুঠো পিঠে তাল ঠুকছে টের পেল। ক'ইঞ্চি পিছে সরে, ডান কনুই দিয়ে বাঁ হাতের হুক ঠেকাল রানা। নিজের বাঁ হাত ঝেড়ে দিল বিপক্ষের চিবুকে। তড়াক করে সিধে হয়ে গেলেও ধরাশায়ী হতে রাজি হল না লোকটা। এবার সমস্ত ওজন ব্যবহার করে, ম্যাকলিনের হৃৎপিণ্ডের ঠিক নিচে, ডান হাতের নিরেট এক হুক ঝাড়ল রানা। ছিটকে রুক্ষ মাটিতে চিত হয়ে পড়ে গেল নাবিক ।
'বেশ্যার বাচ্চাটাকে খুন করে ফেলো!' আরবী ভাষায় পেছন থেকে বলে উঠল কে একজন ।
আস্তে আস্তে গড়ান দিয়ে এক হাঁটুতে ভর রেখে বসল ম্যাকলিন। ওর চিবুকের নিচে ভারী ডেজার্ট বুট দাবানোর জন্যে এগিয়ে গেল রানা। বেল্টের মেশিন পিস্তলের বাঁটে হাত ফেলল লোকটা। লাথিটা মারার আগেই গুলি করে বসবে, আশঙ্কা করল রানা।
বাদামী পোশাকধারী এক লোক ঝলসে উঠল রানার বাঁ দিক থেকে। রাইফেলের বাঁটের বাড়ি খেয়ে মেশিন পিস্তল খসে পড়ল ম্যাকলিনের হাত থেকে। এবার শূন্যে উঠে গেল রাইফেলটা, তারপর নেমে এল বাঁট, সজোরে ম্যাকলিনের বুকে আঘাত হেনে ওকে শুইয়ে দিল মাটিতে।
'থামো!দ হুকুম করল সাচ্চি, রাইফেল ঘুরিয়ে তাক করল ধরাশায়ী ম্যাকলিনের উদ্দেশে ।
পেছন থেকে একজোড়া শক্তিশালী হাত চেপে ধরল রানাকে, বজ্র আঁটুনিতে দু'বাহু এক করে দিয়েছে। বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না ও।
'ও...' বলতে চাইল ম্যাকলিন ।
'আমি দেখেছি,' বলল সাচ্চি, 'আমার লোকেরাও দেখেছে।'
রাইফেলের নল দিয়ে খোঁচা দিল লোকটাকে। 'ওঠো। তুমি পরের ক্যারাভানের সঙ্গে যাবে।'
উঠে দাঁড়াল ম্যাকলিন, তুলে নিল মেশিন পিস্তল। ডানাকিল উপজাতি তখনও ঘিরে আছে ওকে। ওদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ম্যাকলিন, তারপর রানাকে বিদ্বেষের এক ঝলকে ভস্ম করে দিয়ে হোলস্টারে ভরল অস্ত্রটা। চার ডানাকিল সঙ্গ দিল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হেঁটে-যাওয়া ম্যাকলিনকে।
মাথা নাড়ল সাচ্চি। মুক্ত করে দেয়া হল রানার বাহু। রাইফেলের নল দেখিয়ে বোল্ডারটা ইঙ্গিত করল ও। জেন তখনও বসে ওখানে। বিস্ফারিত দু'চোখ। রানা পাশে গিয়ে বসল ওর।
'ম্যাকলিনকে খুন করলে না কেন?' জবাব চাইল সাচ্চি। 'ভাবলাম তোমার পছন্দ হবে না।'
ত্রানা, আমি জানি আমার সঙ্গে তুমি লাগতে আসবে না।'
সুনিশ্চিত শোনাল লোকটার কথাগুলো, আপত্তি করল না রানা।
মাঝ বিকেলে রওনা হল দ্বিতীয় কাফেলা। সে রাতে অ্যারোয়োতে ঘুমাল ওরা। দু'বার ঘুম ভেঙে যেতে রানা দেখতে পেল পাহারা দিচ্ছে উপজাতীয় লোকগুলো।
পরদিন পশ্চিম যাত্রা করল ওরা।

সাত

সাচ্চিকে কম্পাস ব্যবহার করতে দেখেনি এপর্যন্ত রানা। রাতে তারা জরিপ করার সময়ও সেক্সট্যান্ট জাতীয় কোন কিছু কাজে লাগায় বলে মনে হয় না । আপাতদৃষ্টে নক্ষত্রপুঞ্জ এত ভালভাবে চেনে সে, যে প্রতি রাতে ওগুলোকে দেখে নিজেদের অবস্থান বের করে নিতে পারছে। কিংবা হয়তো অতিচেনা কোন টেইল অনুসরণ করছে। তাও যদি হয়, তবু ওকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে সার্টিফিকেট দেয়া যায়। পুর্ব ডানাকিলের বেশির ভাগ এলাকাই ধু-ধু বালির সমুদ্র, জীবন যাপনের জন্যে জায়গাটা অত্যন্ত প্রতিকূল, নদীগুলো পর্যন্ত সল্ট বেসিনে মিশে স্রেফ উবে গেছে।
প্রচণ্ড দাবদাহ আর কখনও সখনও ধূলি-ঝড় সত্ত্বেও যাত্রা মন্দ হলো না খুব একটা। কাপড়ে মুখ ঢেকে, গাদাগাদি করে বসে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে ওরা। চতুর্থ দিন, মাইলকে মাইল বালির মরুর ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে পাথর এড়িয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ ডান পাশের বালির ঢিবিগুলোর চূড়া থেকে উৎকট চেঁচামেচি জুড়ে দিল একদল ডানাকিল, সেই সঙ্গে শুরু হলো রাইফেলের গুলিবর্ষণ ।
রানার পেছনের উটচালক চড়া কণ্ঠে গাল দিয়ে তার জানোয়ারটাকে নিচু হতে বাধ্য করল। রানা চট করে আক্রমণকারীদের ও উটটার মাঝখানে চলে এলো। খিটখিটে জানোয়ারটার কাছ থেকে এতদিন দূরে দূরে ছিল ও, এরা শুধু যে বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়ায় তাইই নয়, কেউ দোস্তি করতে এলে কামড় দিতেও ছাড়ে না। কিন্তু এখন, চিন্তা করে দেখল রানা, রাইফেলের গুলির চাইতে উটের কামড় কম ক্ষতিকর। চালকরা উটেদের নত করে যার যার রাইফেল হাতে তুলে নিল বালিতে মুখ গুঁজে উটের পেছন দিয়ে উকি দিল রানা, পনেরো থেকে বিশজনের একটা দল হামলা চালিয়েছে অনুমান করল। ওদের দলে রয়েছে পঁচিশজন চালক ও ছ'জন গার্ড, এছাড়াও চারজন মহিলা আর দু'জন পুরুষ বন্দি। রানার মুখের কাছে বুলেট বালি ছিটাতেই পিছনে সরে গেল ও। আড়াল নিল মোটা দেখে একটা উটের পেছনে। লুগারটার কথা বড্ড মনে পড়ছে, জাহাজে রয়ে গেছে ওটা, এখন হাতে পেলে দারুণ কাজে লাগত, হামলাকারীদের অনেকে লুগারের আওতার মধ্যে চলে আসছে।
অন্তত দুজন ডানাকিল গার্ড ভূপাতিত, সঙ্গে আরও কজন চালক। আকস্মিক হামলায় বাড়তি লোকের সুযোগটা হারিয়েছে সাচ্চি, এবং এমুহূর্তে প্রতিপক্ষের বড় ধরনের ক্ষতিসাধন করতে না পারলে

ভোগান্তির শেষ থাকবে না। সৌভাগ্যক্রমে, কেবলমাত্র ডানদিকেই আড়াল পাচ্ছে ডানাকিলরা বালিময় রিজটার। দক্ষিণেও যদি থাকত ওরকম একটা, তাহলে ক্রসফায়ারে পড়ে স্রেফ পরপারে চলে যেত রানারা।

কাছেই গুলি খেয়ে আর্তচিৎকার ছাড়ল একটা উট। জানোয়ারটার আছড়ানো খুরে চালক বেচারার খুলি ফেটে চুরমার হয়ে গেল। রানা নিজের গোপন অবস্থান সম্পর্কে ভাবনায় পড়ে গেল। ওর সামনের উটটা এবার গোঙাতে আরম্ভ করল, হয় ভয় পেয়ে, নয়তো আহত সঙ্গীর প্রতি সমবেদনায়। চালক সিধে উঠে দাঁড়াল। খিস্তি ঝেড়ে, পুরানো এম-ওয়ান রাইফেলটা থেকে একটানা গুলি বর্ষাল। তারপর হঠাৎই দু'পাশে হাত ছুঁড়ে দিয়ে পেছনে টলতে টলতে পড়ে গেল মাটিতে।

রানা ক্রল করে এগোল ওর দিকে। লোকটার গলার ফুটো থেকে রক্ত বেরোচ্ছে গলগল করে। চার মহিলা বন্দীর তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে মুখ ঘোরাতে, দু'জন লোককে ডান দিকে পড়ে যেতে দেখল ও। লাথি ঝাড়ছে আরেকটা উট। ছ'ইঞ্চির জন্যে রানার হাঁটু মিস করল একটা গুলি ।

উট চালকের রাইফেলটা থাবা মেরে ধরে গুড়ি মেরে উটটার পেছনে চলে এল রানা। শায়িত অবস্থান থেকে গুলি চালাল, বালির ঢাল বেয়ে নেমে আসতে থাকা এক ডানাকিল সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ।

আরেক আক্রমণকারীর উদ্দেশে লক্ষ্যস্থির করল রানা। ক্লিক আওয়াজ করল রাইফেলটা। গুলি শেষ! সাঁ করে ওর কানের পাশ দিয়ে চলে গেল একটা বুলেট ।

দ্রুত সরে যাচ্ছে, কাপড়ে ঢুকে যাচ্ছে বালি, মৃত চালকটার কাছে ক্রল করে ফিরে এল রানা। বাদামী আলখাল্লায় তালগোল পাকিয়ে আছে ওর অ্যামুনিশন বেল্ট, লোকটাকে দু'বার উল্টে দিয়ে তারপর মুক্ত করা গেল ওটাকে। এমুহূর্তে কাছাকাছি এল না আর কোন বুলেট। নতুন ক্লিপ গুঁজে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে।

ডজন খানেক হামলাকারী তখনও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তবে পাল্টা আক্রমণ শুরু হতে তাদের মাথা গরম করে তেড়ে আসা স্তিমিত হয়েছে। বালির ঢালে হাঁটু গেড়ে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে গুলি করছে ওরা। রানাও হাঁটু গেড়ে বসে একটা টার্গেট স্থির করে গুলি চালাল, লোকটা কুঁকড়ে গেলেও বাহ্যত মনে হলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, বাঁয়ে এক ইঞ্চির ভগ্নাংশ পরিমাণ সরিয়ে দ্বিতীয়বার ট্রিগার টিপল ও ।

নেমে গেছে লোকটার রাইফেল। মুখের অভিব্যক্তি নিখুঁতভাবে পড়ার পক্ষে অনেকটা দূরে রয়েছে রানা, তবে মনে হল যেন চমক খেয়ে গেছে। সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্যস্থির করে রানা গুলি করল আবারও। বালিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল আরেকজন, বার কয়েক লাথি ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল।

আক্রমণকারীদের বাঁ সারি থেকে দীর্ঘদেহী এক যোদ্ধা লাফিয়ে উঠে, রানার উদ্দেশে গুলি করতে লাগল। জঘন্য নিশানা তার, রানার এক গজের মধ্যেও এল না কোনটা। হঠাৎ উটটাকে ডাক ছেড়ে কসরৎ করে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল, পিঠে চাপানো মালে গুলি লেগে ভেঙেচুরে গেছে খানিকটা, হামাগুড়ি দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে কাফেলার মুখের উদ্দেশে এগোল রানা, ভীত জানোয়ারটার কাছ থেকে সরে যেতে হবে ।

সারবন্দী দ্বিতীয় উটটাকে ঘিরে ছিটকে উঠছে বালি। কাফেলার দু'প্রান্ত থেকে হৈ হল্লা শুনে বোঝা গেল উপজাতীয়রা চেষ্টা করছে উটগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে। সাত-আট জায়গায় এমুহূর্তে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছে, সবলে মাড়িয়ে যাচ্ছে অসহায় প্রতিরোধকারীদের। জেনের কি অবস্থা কে জানে, ডাবল রানা। চালকরা অস্ত্র ফেলে ছুটছে জানোয়ারগুলোর দিকে। দুর্বৃত্তদের গুলি খেয়ে আরও দু'জন ভূমিশয্যা নিল ।

কাফেলার সামনের দিকে ছুটে গিয়ে বন্দীদের কাছাকাছি হলো রানা, গুলি চালনার জন্যে ফাঁকা জায়গা পেল এখানে। শত্রুপক্ষ অনেকখানি কাছিয়ে এসেছে। শুয়ে পড়ে রাইফেল তাক করতেই বুঝতে পারল এযুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য । দীর্ঘদেহী যোদ্ধাটিকে দলের নেতার মত দেখাচ্ছে। দু'বার গুলি করার পর কায়দা করা গেল তাকে ।

বাঁ পাশ থেকে ডানাকিল গার্ডটা চেঁচিয়ে কী যেন বলছে, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আগুয়ান প্রতিপক্ষের উদ্দেশে গুলি চালাল। পতন ঘটল আরেক দুর্বৃত্তের। তারপর গার্ডের । আর তিনটা গুলি অবশিষ্ট আছে রানার। সেগুলো ব্যবহার করে আরেকজনকে পেড়ে ফেলল ও।

চারধারে নজর বুলাল রানা, এম-ওয়ানের কার্তুজ কোথায় ফেলেছে মনে নেই ওর, উটগুলোকে এড়িয়ে সরে যাওয়ার সময় পড়েছে কোথাও। ভূপাতিত গার্ডের রাইফেলটা থাবা মেরে তুলে নিল ও। লী এনফিল্ড, পুরানো মাল হলেও কার্যকর। লক্ষ্যভেদ করতে পারবে আশা করে, ধেয়ে আসা শরীরগুলোর উদ্দেশে ওটা তাক করল রানা। কাছ থেকে তলপেটে গুলি খেয়ে আরেকজন ভূতলশায়ী হল।

রানার বাঁ দিক থেকে এক ঝাঁক গুলি বর্ষিত হলে আরও দু'জন হামলাকারী ঢলে পড়ল । চার-পাঁচজন এমুহূর্তে নিজের পায়ে দাঁড়ানো, কিন্তু খুব দ্রুত ব্যবধান ঘুচিয়ে আনছে তারা। রানার রাইফেল ফাঁকা আওয়াজ করল---গুলি শেষ ।

দশ ফিট দূর থেকে এক বাদামী পোশাকধারী ডানাকিল গুলি করল ওর উদ্দেশে। আল্লাই জানে, কেন মিস করল লোকটা। রানা চট করে রাইফেলটা ঘুরিয়ে বাঁট উড়িয়ে ধাঁই করে মেরে দিল প্রতিপক্ষের চোয়ালে। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরে উঠে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল লোকটা ।

ওর বেল্টে ছোরা লক্ষ করল রানা। লোকটার রাইফেল, তুলে নেয়ার পক্ষে, অনেকখানি দূরে পড়ে রয়েছে। ছোরাটা মুঠোয় ধরে গুটিসুটি মেরে বসে রইল রানা। কাউকে বাগে পেলে পেট ফাঁসিয়ে দেবে।

আশপাশে দেখতে পাচ্ছে দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলছে। গুলি, পাল্টা গুলির সঙ্গে শুরু হয়েছে হাতাহাতি লড়াই।

রানা মরুযুদ্ধ দেখতে ব্যস্ত, টেরও পেল না কখন ঘেরাও করা হয়েছে ওকে। বাদামি পোশাক পরা একদল লোক ঘিরে রয়েছে। কারা এরা? স্বপক্ষ, না বিপক্ষ ?

'ছুরিটা ফেলে দাও, রানা।' পরিচিত কণ্ঠস্বর। সাচ্চির। অন্যদের এক পাশে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে এসেছে।

আদেশ পালন করল রানা, ঝুঁকে পড়ে ওটা তুলে নিল সাচ্চি।
'যুদ্ধে জিতেছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা ।
'ওরা মারা পড়েছে।' একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। 'আর নয়তো পড়বে। ওদের জল সংগ্রহ করতে সাহায্য করো।'
জনে জনে গিয়ে প্রত্যেকের ক্যান্টিন জড় করল ওরা। শত্রুদের অনেককে হাসতে হাসতে মাথায় গুলি করে মারল সাচ্চির লোকেরা। এদের ক'জনকে সেবা- শুশ্রূষা করলে বাঁচানো যেত মনে হয়েছিল রানার। কিন্তু গ্রেফতারকারীদের সঙ্গে এনিয়ে বাদানুবাদ করে লাভ হয়নি।
ক্যারাভানে ফিরে এসে, পশুর চামড়ার তৈরি ক্যান্টিনগুলো গাদা করে রাখল ওরা । জনৈক চালক এসময় কি যেন বলে, হাতছানি দিয়ে ডাকল রানাকে। ওকে অনুসরণ করে, অন্যান্য বন্দীরা দল বেঁধে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এল রানা।
'মেয়েটাকে দেখো, রানা,' বলল সাচ্চি। 'জেনারেল মালদিনিকে বলতে পারবে কীভাবে হল এটা।
জেন তার ভারী আলখাল্লার ওপর চিত হয়ে শোয়া। বুকের বাঁ পাশ থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে বেরোচ্ছে।
বলল, 'যুদ্ধের শুরুতেই ঘটেছে এটা,' দু'জন মহিলার মধ্যে একজন আরবীতে।
'কার বুলেট?' একই ভাষায় শুধাল রানা। 'মরুভূমির দিক থেকে।' জেনের পালস পরীক্ষা করল রানা। নিস্পন্দ । আলতো করে ওর চোখের পাতা বুজে দিল। জেনের ক্যামেরাটা কোথায় চিন্তাটা হঠাৎ উদয় হলো মনে। বেচারি এবারকার ট্র্যাভেল স্টোরিটা লিখে যেতে পারল না, ভাবল বিষণ্ন চিত্তে ।
'তুমি চাইলে ওকে কবর দিতে পারো,' বলল সাচ্চি। মাথা ঝাঁকাল রানা। ক্যারাভান সুসংহত করা, জেনকে সহ স্বপক্ষের অন্যান্য মৃতদের সৎকার করা, এবং কোন কোন উট মালদিনির ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে বাকি দিনটা পার হয়ে গেল। চারটে উট মরুভূমিতে পালিয়ে গেছে। আরও নটা হয় মরেছে আর নয়তো এতটাই গুরুতর জখম, নড়াচড়ার সাধ্য নেই। বাকি থাকল সাকুল্যে বারোটা উট আর দশজন চালক। বেঁচে যাওয়া চার ডানাকিল গার্ডের মধ্যে দু'জনকে উটচালকের দায়িত্ব দেয়া হলো, পাহারাদার হিসেবে কাজ করবে অপরদুজন ও সাচ্চি। হামলাকারীদের উটগুলোর হদিস পাওয়া গেল না।
মোটাসোটা দেখে এক উট বাছাই করে তার ছায়ায় গিয়ে বসল রানা । কীভাবে খুঁজে বের করবে জেনের ক্যামেরাটা ভাবছে। খুঁজে পেলেও সাচ্চি রাখতে দেবে ওটা তার নিশ্চয়তা নেই, আবার আবেগের মূল্য দিলে দিতেও পারে।
ক্যামেরার ভেতরকার যন্ত্রপাতিগুলো কতখানি মূল্যবান? রানার স্থিরবিশ্বাস, কোন এক লেন্সের মধ্যে একটা সিঙ্গল শট, ২২ রেখেছিল জেন। ওর মিশনের ব্যাপারে রানাকে খোলামেলা করে কিছু বলেনি মেয়েটা, এবং রানাও চেপে গেছে নিজেরটা সম্পর্কে। লেন্সটা খুব সম্ভব রয়ে গেছে শেপ মাইয়ার জাহাজে ।
চালকদের একজনকে এসময় জেনের ক্যামেরা কাঁধে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। মরুকগে, ভাবল রানা, ওটা ফেরত চেয়ে সাচ্চির সন্দেহ জাগিয়ে তোলার কোন ঠেকা পড়েনি ওর।
মালপত্র সরাতে ব্যস্ত সবাই, ঘণ্টাখানেক কি তারও কিছু পরে হাতছানি দিয়ে রানাকে ডেকে নিল সাচ্চি। কঠোর পরিশ্রম করল রানা, অন্যদের চেয়ে অন্তত তিনগুণ, এবং এদিক ওদিক চেয়ে যখন দেখল কেউ তাকিয়ে নেই, বুট ব্যবহার করে ছেঁড়া বস্তা থেকে খসে পড়া খুদে খুদে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ বালির বুকে কবর দিল। মাল সরানোর অছিলায় আরও কিছু বস্তার মুখ খুলে দিল রানা।
এখন আর চাইলেই তিনটে মিনিটম্যান আইসিবিএম তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না রবার্তো মালদিনির পক্ষে।

আট

তিনদিন বাদে, প্রায় কারবালার দশা নিয়ে ভিন্ন ধরনের এক অঞ্চলে প্রবেশ করল রানাদের কাফেলা। অগুনতি পাথুরে পাহাড় চারধারে। ছোটখাট ঝোপ-ঝাড়েরও ছড়াছড়ি লক্ষ করা গেল। উটচালক ও গার্ডদের মুখের হাসি বলে দিল কাছেই জলের ব্যবস্থা রয়েছে। যাত্রাটা খুব সোজা ছিল না। আরও দুটো উট খোয়াতে হয়েছে। বালির ওপর একবার যে শুয়েছিল, ওরা মাল খালাস করার পরও আর উঠতে রাজি হয়নি।
ছোট্ট ডোবাটার জলে গাঁজলা । পাথুরে এক অবতলে, আশপাশে খুদে খুদে ঝোপ-ঝাড় নিয়ে অবস্থান ওটার। জলেতে ক্ষারের স্বাদ। চালকদের মরু-জ্ঞান বলছে এ জল খাওয়া চলে, রানার কাছে যদিও দুনিয়ার সবচাইতে সুস্বাদু-সুপেয় জল মনে হল একে। অভিযানের প্রথমার্ধে বেজায় হিসেব করে পানি দেয়া হয়েছিল ওদের, এবং শেষের তিনদিন পানির অভাবে ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে শরীর ।
উটগুলো আকণ্ঠ পান করে তাজ্জব করে দিল রানাকে। ডোবার জলের স্তর এতই দ্রুত নামিয়ে দিল যে মনে হল, কোনো পাতালনদী ডোবার জল শুষে নিচ্ছে বুঝি। আর কোন স্থলচর প্রাণী হলে এত জল একসঙ্গে পান করে নির্ঘাত মারা পড়ত। কিন্তু এদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সাধে কি আর মরুর জাহাজ বলে এদেরকে?
ত্বরাতে এখানে ক্যাম্প করব আমরা,' রানাকে বলল সাচ্চি। 'সকালে ডোবা ভর্তি হলে ক্যান্টিন ভরে নেব।'
'আর কেউ জল চাইলে তখন?'
হেসে উঠল সাচ্চি। 'সিংহ?'
'মানুষও হতে পারে।'
রাইফেলে চাপড় দিল সাচ্চি। বেশি লোক এলে আবারও রাইফেল হাতে পাবে তুমি।'
সে রাতে দুটো অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হলো। চালক, গার্ড ও বন্দীদের জন্যে একটা, আর অপরটা সাচ্চি ও তার পেয়ারের লোকেদের জন্যে। রানাকে আমন্ত্রণ জানাল লোকটা।
'দু'দিনের মধ্যে মালদিনির কাছে পৌঁছচ্ছি আমরা,' বলল।
'কে মালদিনি?'

'জানো না?'

'গুজব শুনেছি শুধু।'

'গুজব,' আগুনে থুথু ফেলল সাচ্চি। 'জেনারেল মালদিনি সম্পর্কে কাফেলার লোকজন ভুলভাল কথা বলে। অনেক বছর আগে, আমাদের গ্রামে আসে জেনারেল। আমরা মেরে ফেলতে পারতাম তাকে, কিন্তু আমাদের শহরবাসী কিছু গোত্রীয় লোক বন্ধুত্ব করতে বলে তার সাথে। জেনারেল মালদিনি প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে সাহায্য করলে আমাদের সম্পদ আর ক্রীতদাস দেবে। কাজেই তাকে সাহায্য করি আমরা।'

'সম্পদ পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা। জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে, হাতের দোলায় ক্যারাভান দেখাল সাচ্চি।

নারী কণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল হঠাৎ অপর অগ্নিকুণ্ডটার কাছ থেকে। ঘনীভূত আঁধার ভেদ করে চোখ কুঁচকে চাইল রানা। তিন ক্রীতদাসীকে বাধ্য করা হচ্ছে কাপড় খুলতে, এবং কয়েকজন পুরুষকে দেখা গেল ওদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে। সাচ্চির দিকে চাইল রানা । দৃষ্টিক্ষেপ করল না লোকটা।

'ওরা ক্রীতদাসী,' বলল সাচ্চি, 'একাজের জন্যেই কেনা হয়েছে ওদের। জেনারেল মালদিনি বেশ কিছু সাদা চামড়ার মানুষ আমদানি করেছে। তাদের মেয়েমানুষ দরকার হয়। এরা মালদিনির সম্পত্তি।'

'তোমার নিশ্চয় ভালো লাগে না এসব?'

'যোদ্ধা ভালোবাসে তার মেয়েমানুষ, অস্ত্র আর উট। আমার পূর্বপুরুষরা কবে থেকে এখানে বাস করে কেউ জানে না, আমরা জানি জেনারেল যত লোক নিয়ে এসেছে তাদের জায়গা এখানে হবে না। উত্তরের আমহারিক খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সবসময় লড়ে নিজেদের আবাস ভূমি রক্ষা করতে হয় আমাদের। জেনারেল মালদিনির যে-সব লোকেরা আজব ওই অস্ত্র বানাচ্ছে তাদের সঙ্গে লাগতে চাই না আমরা। যাকগে, ম্যাকলিনের জাহাজে উঠেছিলে কেন তুমি?'

'জেনারেল মালদিনির পরিচয় জানার জন্যে ।

'জানবে।' নীরস হাসি হাসল সাচ্চি। 'আরও অনেকে জানতে চেয়েছে। কেউ কেউ জেনারেলের দলে যোগ দিয়েছে। বাকিরা মৃতদের দলে। আমি আশা করব তুমি তাদের সঙ্গে যোগ দেবে।'

জবাব দিল না রানা। 'কী, দেবে?' প্রশ্ন করল সাচ্চি।

'না, সাচ্চি,' বলল রানা। 'ওর প্ল্যান সম্পর্কে তোমার আশঙ্কায় ভুল নেই। শত্রুরা এক সময় না একসময় জেনারেলকে খুঁজে বের করে খতম করবেই করবে। সঙ্গে মারা পড়বে তাকে যারা সাহায্য করছে তারাও।'

'আমার লোকদের কথা বলছ?' জবাব চাইল সাচ্চি। মাথা নেড়ে সায় জানাল রানা।

আগুনে আরেক দলা থুথু ফেলল সাচ্চি। 'আমার বাপের আমলে ইতালিয়ানরা এদেশে এসেছিল। প্লেন, বোমা, এসব ছাড়াও নানান আজব অস্ত্র ছিল তাদের কাছে। পাহাড়ে, আমহারিক খ্রিস্টানদের শাসন করেছে তারা। আমাদের দক্ষিণে, গালা শাসন করেছে। কিন্তু অ্যাফার, মানে আমাদের লোকেরা যুদ্ধ করেছে। মরুভূমিতে এসে মরেছে ওরা। এটা ধ্রুব সত্য। বিদেশী লোক যখনই ডানাকিলে অনুপ্রবেশ করেছে,

মারা পড়েছে।'
একটু পরে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে রানাকে বিদেয় করল সাচ্চি। অন্যান্য পুরুষ ক্রীতদাসদের কাছে, নিজের জন্যে বরাদ্দ জায়গায় চলে এল ও ।
সে রাতে তিনবার ঘুম ভাঙল রানার। একবার ক্রীতদাসী দু'জনের চিৎকারে, আরেকবার এক সিংহের গর্জনে। তৃতীয়বার ভাঙল কোন কারণ ছাড়াই। প্রতিবারই, সজাগ ছিল সাচ্চি।
মালদিনির প্রকাণ্ড তাঁবুতে ক্রীতদাসদের জন্যে চারটে কম্পাউন্ড, ঘেরা তিনটে ও অন্যটা মহিলাদের। কাঁটাতারের বেড়া দেয়া নিচু, পাথুরে পাহাড়ের উপত্যকায় তৈরি করা হয়েছে ওগুলো। নেতাদের অর্থাৎ স্বাধীন মানুষদের জন্যে তাঁবু খাটানো হয়েছে ঝোপগুচ্ছ ও ঝর্নার ধার ঘেঁষে। রাস্তাটা চিনে নেয়ার সুযোগ পেল না রানা। একদল ডানাকিল দৌড়ে এসে ক্যারাভান ঘিরে ফেলল। সাচ্চির সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। ওদের ভাষা রানার অজানা। কিন্তু সাচ্চির দেহভঙ্গি ও রানার উদ্দেশে চকিত চাহনি বলে দিল যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছে সে। গার্ডদের একটা গ্রুপ রানাকে দ্রুত এক ক্রীতদাস কম্পাউন্ডের দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে আদেশ করল।
;তুমি নিশ্চয়ই সেই আমেরিকান,' বলে উঠল এক ব্রিটিশ কণ্ঠ, ডান পাশ থেকে।
ঘুরে দাঁড়াল রানা। খোঁড়া এক লোক ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পরিচয় পর্ব সারা হলে জানা গেল লোকটার নাম টনি গ্রেগ ।
ততুমি নাকি বিসিআই না কিসের স্পাই শুনলাম। তোমার সঙ্গের মহিলাটি কোথায়?'
রানা কাফেলা আক্রমণের বৃত্তান্ত জানাল ।
'রক্ত পিপাসু, ওই ডানাকিল শালারা,' বলল লোকটা। 'পাঁচ বছর আগে ওদের হাতে ধরা পড়ি আমি। ইথিওপিয়ান আর্মি পেট্রলের উপদেষ্টা ছিলাম, ঠোকাঠুকি বাধে মালদিনির ছেলেদের সাথে। পা-টা তখনই খোয়াই। একমাত্র আমিই বেঁচে আছি, আমাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে আর কি, আমাকে দিয়ে ফুট- ফরমাশ খাটিয়ে বোধহয় আমোদ পায় মালদিনি '
ওর প্রতি সহানুভূতি অনুভব করল রানা। 'স্পাই, একথা আমি স্বীকার করছি,' বলল। 'মালদিনির মতলবটা কী শিয়োর হতে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'
'পুরো দুনিয়াটা দখল করে নেবে,' সশব্দে হেসে উঠল টনি গ্রেগ। তশিগগিরই বলবে তোমাকে এসব কথা। তা, ধরা পড়লে কীভাবে?'
জাহাজে কভার ফাঁস হয়ে যাওয়ার কাহিনি শোনাল রানা। জানাল, বিপদটা শুরু হয় জিওনিস্টের এজেন্টটিকে মারধর করে সাগরে ফেলে দেওয়ার পর থেকে ।
'ইসরাইল এসবের সঙ্গে জড়িত নয়, মিস্টার রানা,' বলল টনি, 'এজায়গাটার কথা জানতে পারলে তোমার দেশের মতো ওরাও এটাকে নিশ্চিহ্ন করতে দ্বিধা করবে না। ক'সপ্তাহ আগে এক ইসরাইলী স্পাই ছিল এখানে, সে-ই তো খেপিয়ে তুলল জেনারেল মালদিনিকে। '
টনির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কম্পাউন্ড দেখল রানা। পরিচিত হল ক'জন আমহারিক ও সরকজন বন্দির সঙ্গে দু'জন জার্মান, এক সুইড, আর রাহাত খানের পরিচিত সেই কুদরত চৌধুরী। ভদ্রলোককে চেনে এমন ভাব দেখাল না ও। এরা সবাই ডানাকিলে এসেছিল মালদিনি ওদের চাকরি দেবে ভেবে, কিন্তু ক্রীতদাস হয়ে পচে মরছে।
'খুব ভালো লোক মনে হচ্ছে', টনিকে বলল রানা।
'সত্যিই তাই, যদি ষড়যন্ত্র না করে অনুগত থাকতে পারো।'
ডিনারের পর, মালদিনির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেল রানা। পূর্বধারণা ইচ্ছে করেই উপেক্ষা করেছে ও। একমাত্র যে ছবিটা ও দেখেছিল, কয়েক বছর আগে তোলা, তাতে কঠোর চেহারার, কোটরাগত চক্ষু একজন রাজনীতিকের সাক্ষ্য মেলে। রোদে থাকতে থাকতে গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে এখন ওর, এবং চোখজোড়া যেন নিষ্প্রাণ প্রায়।
দু'জন গার্ড রানাকে নিয়ে এল তার সামনে।
'বসুন, মিস্টার রানা,' আমন্ত্রণ জানাল মালদিনি। নিচু টেবিলটার এপাশে মুখোমুখি বসল রানা। রাইফেলধারী গার্ড দু'জনকে বিদেয় করে দিয়ে একই সঙ্গে কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে হাতের নাগালের মধ্যে রাখল লোকটা।
'সাচ্চির মুখে জানতে পারলাম, আপনার কারণেই নাকি শেষ কাফেলাটা এসে পৌঁছুতে পেরেছে,' বলল মালদিনি। 'সেদিক দিয়ে আমি হয়তো আপনার কাছে ঋণী।'
'আমি নিজের জীবন বাঁচিয়েছি,' বলল রানা। 'ওই ডাকাতগুলো আমাকে মুক্ত করতে আসেনি।
'খাঁটি সত্যি কথা। ওয়াইন?'
'ধন্যবাদ,' বলল রানা। বাঁ হাতে গেলাসে তরল ঢেলে, মালদিনিকে ওর দিকে সাবধানে ঠেলে দিতে দেখে সতর্কতার মাত্রাটা বুঝল। লাল পানীয় ছলকে পড়ে যাওয়ার দশা, এতটাই গভীর মনোযোগে রানাকে লক্ষ করছিল লোকটা।
'ম্যাকলিন বলছিল আপনি নাকি খুব ডেঞ্জারাস লোক, যদিও বারে বারে বলেছে, রেডিও অপারেটরকে আপনি মারধর করেননি। মেয়েটাও কিছু বলেনি। হয়তো ঘুমের ঘোরে টলে পড়ে ব্যথা পেয়েছে । যাকগে, এখানে এলেন কেন?'
'ইথিওপিয়ান সরকার আমাদের সাহায্য চেয়েছে।'
'কেজিবির বা জিওনিস্টের সঙ্গে কাজ করছেন?'
'না, কিন্তু তারাও আপনার প্রতি আগ্রহী শুনেছি।'
'হ্যাঁ,' বলল মালদিনি। 'সিআইএ আর চাইনিজরাও। এত আগ্রহের কারণটা কী. মিস্টার রানা?'
'তেইশটা মিসাইল।'
'বাহ্ বেশ আলাপী লোক মনে হচ্ছে আপনি। আপনার ইসরাইলী বন্ধুটি কিন্তু মুখ খোলেনি।'
শব্দ করে হাসল রানা। 'কার কাছে আছে ওগুলো অজানা নেই কারও। কেন আমাকে পাঠানো হয়েছে তাও বলছি, তার আগে বলুন তো ওগুলো জোগাড় করেছেন কেন? সঙ্গে তিনটে মিনিটম্যান যোগ করেছেন কি জন্যে?'

'মিনিটম্যানগুলোর কথা বাদ দিন, দাবড়ি দিল মালদিনি। এক ঢোকে ওয়াইনটুকু নিঃশেষ করে আরেক গেলাস ঢালল, 'প্রেস্টার জনের নাম শুনেছেন?দ জিজ্ঞেস করল ।

'কিংবদন্তীর সম্রাট। মধ্যযুগে ইথিওপিয়া শাসন করেছে।'

'একটু ভুল করলেন। প্রেস্টার জন কিংবদন্তী নয়। সেবার রাণীও তাই। গাল-গল্প ফেঁদে ওরা অভিশপ্ত ইথিওপিয়ানদের বুঝিয়েছিল তারা আফ্রিকার সেরা জাতি। ওরা দেখবেন, বলে আনন্দ পায় আফ্রিকায় একমাত্র ইথিওপিয়াই কখনও ইউরোপীয় কলোনিতে পরিণত হয়নি। উনিশ শতকের শেষ ভাগে অবশ্য ব্রিটেন গণহত্যা চালায় এদের ওপর, এবং উনিশশো ত্রিশের দশকে ইতালিয়ানরা এদেশ শাসন করে, কিন্তু এরা বেমালুম ভুলে যায় ওসব অপ্রীতিকর ঘটনা। আরেকজন প্রেস্টার জনকে মুকুট পরাতে এক পায়ে খাড়া এরা।

'আপনাকে?'

'আমাকে।'

'বর্তমান ইথিওপিয়ান সরকার বাধা দেবে না?'

একান্ত বাধ্য না হলে ঝামেলায় জড়াবে না। তাছাড়া ডানাকিলে টহল দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ওরাই হয়তো বিসিআইর মাধ্যমে আপনার সাহায্য চেয়েছে। এবং সেজন্যে এখানে দেখতে পাচ্ছি দুর্ধষ এজেন্ট জনাব মাসুদ রানাকে । কেন জোগাড় করেছি মিসাইলগুলো জানতে চাইছিলেন না? শুনুন তবে, সহজ করেই বলি।' একটুক্ষণ বিরতি নিল লোকটা। 'পূর্ব আফ্রিকা শাসন করতে - চাই আমি। প্রেস্টার জন কিংবদন্তী সাজতে পেরেছিল তার কারণ, উত্তর-পূব আফ্রিকায় সে এক সুদক্ষ সৈন্য বাহিনী সমাবেশ করেছিল। এতে করে ইসলামের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। আমার চারপাশে আছে আধুনিক দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা, অকুতোভয় সৈন্য ডানাকিলরা। ওদের দরকার শুধু একজন যোগ্য নেতা আর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।'

'মরুভূমিতে যারা হামলা করল তারাও তো ডানাকিল, ওরা চাইছিল আপনি যাতে মিনিটম্যান মিসাইলগুলো হাতে না পান।'

'ওরা বিপথগামী, ক্রুদ্ধ স্বরে বলল লোকটা। 'আর জেনে রাখবেন, ওই মিনিটম্যানগুলো কমপ্লিট করা হবে। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ক'জন মিসাইল বিশেষজ্ঞ কাজ করছে আমার এখানে। রবার্তো মালদিনির নাম শিগগিরিই ছড়িয়ে পড়বে দুনিয়াময়।' উন্মাদের মতো চকচক করছে লোকটার চোখজোড়া। হঠাৎ আঙুল দাবাতে কোথাও বেল বেজে উঠল।

তাঁবুর ঢাকনা সরে যেতে এক আমহারিক যুবতী প্রবেশ করল ভেতরে। প্রায় ছ'ফুট লম্বা মেয়েটি, শরীর প্রদর্শনের জন্যেই পোশাক পরেছে যেন, মুখ থেকে বুক পর্যন্ত ঢাকা এক পাতলা কাপড়ে, এবং তার নিচে লম্বা এক স্কার্ট পরে রয়েছে।

'এ হচ্ছে জুলেখা', বলল মালদিনি। 'জুলেখা, আমাদের জন্যে আরেকটু ওয়াইন নিয়ে এসো।'

'জ্বী, জেনারেল মালদিনি,' চর্চাহীন ইতালিয়ান উচ্চারণে বলল যুবতী। ও চলে যেতে বলল মালদিনি, 'ওর বাবা আর চাচা কপটিক চার্চের নেতা। দরবারে প্রভাব আছে। ও যদ্দিন আমার জিম্মায়, ইথিওপিয়ানরা আমার বিরুদ্ধে একপা ফেলবে না ।'

জুলেখা ফিরে এসে, রেড ওয়াইনের এক সদ্য মুখখোলা বোতল ধরিয়ে দিল মালদিনির হাতে। 'ইনি মিস্টার রানা,' পরিচয় করিয়ে দিল মালদিনি। 'বলা যায়, গোটা দুনিয়ার তরফ থেকে ইথিওপিয়ায় এসেছেন।'

'সত্যি?' ইংরেজিতে শুধাল জুলেখা। মাথা ঝাঁকাল রানা ।

'ইতালিয়ান বলো!' গর্জে উঠল আধপাগলা। পরমুহূর্তেই শান্ত স্বরে বলল, 'মিস্টার রানা ক'দিনের জন্যে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। বেঁচে থাকলে হয়তো আমাদের বিয়েটা দেখে যেতে পারবেন। তোমার বাবা কিংবা চাচা তোমাকে আমার হাতে যখন তুলে দেবে আরকি।'

'কতবার বলব জান গেলেও একাজ করবে না তারা', দৃঢ় কণ্ঠে বলল যুবতী।

'তোমাকে জ্যান্ত দেখতে চাইলে করবে।'

'আমি ওদের কাছে অনেক আগেই মৃত।'

'ওকথা বলে না, লদীটি,' মিষ্টি করে বলল মালদিনি। 'আর কিছু দিন পরেই আমি হব ইথিওপিয়ার জামাই, শাসন করব গোটা পূর্ব আফ্রিকা। তখন মেয়ে- জামাইয়ের গর্বে মাটিতে পা পড়বে না তোমার বাপ-চাচাদের। হাতের ঝটকায় এবার ওকে দূর করে দিল মালদিনি। রানার উদ্দেশে বলল, 'ক'দিন পর আবার কথা হবে আপনার সঙ্গে। আপাতত বন্দি হয়ে থাকুনগে যান ।

হাততালি দিল ও। ক্রীতদাস কম্পাউন্ডে রানাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল দু'জন গার্ড।

নয়

পরের দু'দিন ক্যাম্প রুটিন স্টাডি করল রানা। সূর্যোদয়ের পরপরই নাস্তা দেওয়া হয় ক্রীতদাসদের, তারপর বিভিন্ন ওঅর্ক পার্টিতে ভাগ হয়ে তারা বেরিয়ে পড়ে। ডানাকিল যোদ্ধারা পাহারা দিয়ে রাখে ওদের। আরো ক'জনের সঙ্গে কম্পাউন্ডে থেকে যায় রানা। স্বাধীন আমহারিক পুরুশদের উপত্যকার ধূলিধূসরিত , পাথুরে মেঝেতে হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছে সে।এরা ইথিওপিয়া সরকারের হর্তাকর্তা কিনা নিশ্চিত হতে পারেনি যদিও।

কম্পাউন্ডে রানার প্রথম পূর্ণ দিবসে, লাঞ্চের ঠিক আগে টনি গ্রেগ এসে হাজির হল, ওকে সঙ্গ দিচ্ছে সাবমেশিনগানধারী জনৈক ডানাকিল। ক'খানা কাপড় হাতে এক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসও আছে সঙ্গে।

জেনারেল মালদিনি রানার জন্যে খাকি প্যান্ট, শার্ট ও পিথ হেলমেট পাঠিয়েছে, মরচে ধরা এক ধাতব ট্রাক থেকে পানি নিয়ে, মরুভূমির বালি ধুয়ে মুছে সাফ-সুতরো হলো রানা। 'অনেক ভাল লাগছে এখন,' টনিকে বলল ও।

'মালদিনির দলে ভিড়ে যাচ্ছ?' টনি প্রশ্ন করল।

'বলল তো সুযোগ দেবে না।'

'কপাল খারাপ, রানা। মালদিনি পাগল হতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমানও বটে। আমি তো মনে করি ওর এই পাগলামি-প্ল্যান সফল হবে।'

‘আছ ওর সঙ্গে?’
‘হয়তো মানে থাকার অফার পাই যদি।’
ওয়াটার ট্রাফের কাছে যাওয়া এবং ফিরে আসা ক্যাম্পের লেআউট সম্পর্কে রানাকে নতুন এক ধারণা দিল । খুব সংক্ষিপ্ত নোটিসে এর বেশিরভাগটাকে অদৃশ্য করে দেয়া যাবে। এবং ছোট্ট এক উপাদানের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না-তেইশটা খুদে উপাদান। মিসাইলগুলো গেল কোন্ নরকে? ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে না পারলেও, এটুকু অনুমান করতে পারছে রানা, পাথর ভরা এক বিরান ওয়েইস্টল্যান্ডে এমুহূর্তে রয়েছে ওরা। ডানাকিল মরুভূমির মেঝের চাইতে বেশ উঁচু এ জায়গাটা। মিসাইলগুলো হয়তো লুকানো রয়েছে পাহাড় সারির ভেতরে কোথাও ।
এই ক্যাম্প ত্যাগ করে পালাতে চাইলে, কাজটা করতে হবে মালদিনি জেরা শুরু করার আগেই। কেন যেন মনে হচ্ছে ওর জিওনিস্ট এজেন্টটি নির্যাতনের ফলে মারা পড়েছে। এমুহূর্তে অবশ্য পালানোর কোন রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। দিনে ডানাকিলরা পাহারা দিচ্ছে চত্বর, আর রাতে পালাতে হলে একটাই পথ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা। কিন্তু দাঙ্গা বাধাবে তেমন মারকুটে উদ্যম ক্রীতদাসদের মধ্যে দেখেনি ও। তাছাড়া এখান থেকে বেরিয়ে ও যাবেটাই বা কোথায়? চেনে কোনও কিছু? মরুভূমিতে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মারা যদি নাও যায়, ডানাকিলদের কোন গ্রামে গিয়ে হাজির হলে বেঘোরে প্রাণটা ঠিকই খোয়াবে।
পরদিন সন্ধেয়, রানা তখনও মনে মনে সম্ভাব্য ছক আঁকছে কিভাবে সটকানো যায় , বৃদ্ধ কুদরত চৌধুরী, বাঙালী বিজ্ঞানী, ওর পাশে এসে বসলেন ।
‘তোমাকে নিশ্চয় রাহাত পাঠিয়েছে ?’ প্রশ্ন করলেন। রানা সায় দিতে বললেন, ‘ও’ তারপর চারধারে নজর বুলোলেন। ‘হতচ্ছাড়া টনি গ্রেগটা আরেকজনের ভোপর স্পাইং করছে বলে সুযোগটা পেলাম।কাল তোমায় মিসাইলগুলো দেখাব।’
তকাল?দ
‘হ্যাঁ, জেনারেল মালদিনি আর জুলেখাও থাকবে। আর আমার তিন জোড়াতালি মার্কা অ্যাসিস্ট্যান্ট, এক ডানাকিল, এক আমহারিক, আরেক সোমালী। রাহাত কেমন আছে?’
‘ভাল,’ শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।
‘মালদিনিকে মনে করেছিলাম খেয়ালী লোক, বিজ্ঞানের সাধনা করতে চায়। নির্জন মরুভূমিতে দু’একটা মিসাইল ফাটাবে আর কি। তাই ওর প্রস্তাবে রাজি হই। কিন্তু এখন দেখছি সারা দুনিয়াকেই ও শত্রু ভাবছে।’ চকিতে চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিলেন বৃদ্ধ, কাছেপিঠে কেউ আছে কিনা ।
‘আমি কিন্তু,’ মৃদু সুরে বলল রানা। ‘আপনাকে নিয়ে কেটে পড়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া।’
‘কালকের দিনটা সেজন্যে হয়তো উপযুক্ত নয়। তুমি সিক্রেট এজেন্ট যখন, রানা, নিশ্চয়ই আর্মস ব্যবহার করতে জানো?’
রানা মৃদু হেসে সম্মতি জানাল ।
‘কাল গার্ড যদি কম সতর্ক থাকে,’ বললেন কুদরত চৌধুরী, ‘তাহলে পালানোর চেষ্টা করতে পারি আমরা। জানো নিশ্চয়ই, ডানাকিলরা খুন করার জন্যেই লড়াই করে?’
ক্যারাভান আক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধকে জানাল রানা ।
‘ওই ক্যারাভানে তিনটে মিনিটম্যানের গাইডেন্স ইউনিট ছিল,’ বললেন বিজ্ঞানী। ‘কাল রাতে তাঁবু থেকে সরে পড়ব আমরা। আমার তিন সহকারীর সাথে কথা হয়েছে। ওরা সাহায্য করবে কথা দিয়েছে। এটা রাখো, কাজে লাগতে পারে।’
সরু, খোদাই করা ছোরাটা কাপড়ের ভেতর রানা চালান করতে পারার আগেই বৃদ্ধ হাওয়া। কুদরত চৌধুরী অ্যাটেসিভ টেপ জোগান দিতেও ভুল করেননি, রানা যাতে ছুরিটা চামড়ার সঙ্গে সাঁটিয়ে রাখতে পারে। উটের পিঠে চেপেছে মালদিনি। রানাদের সঙ্গ নেওয়া চারজন গার্ডও উটচালনা করছে। জুলেখা, কুদরত চৌধুরী ও তাঁর তিন সহকারীর সঙ্গে হাঁটছে রানা। বিকেলের দিকে নিচু পাহাড়সারির রেঞ্জে পৌঁছল ওরা। পিচ্চি এক নদী দূরে কেঁপে কেঁপে বয়ে যাচ্ছে। পানির কোল ঘেঁষে, পাথর আর বালির বুকে শুয়ে রয়েছে ডানাকিলদের একটা গ্রাম। স্থানীয় মাতব্বর উটে চেপে মালদিনির সঙ্গে মিলিত হতে এল। তার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় আবেগপূর্ণ কুশল বিনিময় করল মালদিনি ।
‘এই সর্দারটা কে?দ জুলেখাকে জিজ্ঞেস করল রানা।
’মালদিনির লোকদের শাসন করে ও,’ বলল যুবতী। ‘ওর বিশ্বাস মালদিনির দরবারে ও একটা ভালো পদ পাবে।’
রানা আর বলল না যে সর্দারের ইচ্ছাপূরণের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। হাতে নিউক্লিয়ার মিসাইল থাকলে মালদিনি তার পরিকল্পিত আঞ্চ ন্তর্জাতিক ব্ল্যাকমেইল সফল করতে পারবে।
’তুমি এলে কেন?’ জুলেখাকে জিজ্ঞেস করল ও।
’আমাকে মালদিনির সঙ্গিনী হতে হবে; আমি এখন তার ক্রীতদাসী যদিও, আমার পারিবারিক ঐতিহ্য এই মাতব্বরটাকে প্রভাবিত করতে কাজে দেবে। মদের আসর বসবে আজ রাতে। আমাকে অবশ্য ওখানে থাকতে দেবে না মালদিনি। এদের চোখে আমাকে হালকা হতে দেবে না ।’
মালদিনি ও সর্দারটি কি যেন পান করল এক বড়সড় পাত্র থেকে। ওদের হাসাহাসি, ফুর্তি দেখে কে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল ও রানাদের কাছে।
‘মিসাইল, চৌধুরী, মিসাইল,’ বলল লোকটা।
কুদরত চৌধুরীর নির্দেশে এক গুহামুখ থেকে কাঁটাঝোপ আর পাথর সরাল তাঁর তিন সহকারী।
‘এটা তেইশটার একটা,’ মালদিনি বলল রানাকে। শিগগিরিই সবচাইতে বড়ো তিনটে যোগ করা হবে।’
রানা উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল কথাটা। একটা ট্রাকে বসে রয়েছে মিসাইলটা, গড়িয়ে নামার অপেক্ষায়। রাশান মডেল, পাঁচশো থেকে সাতশো মাইলের মধ্যে এর রেঞ্জ। নিক্ষেপ করা হলে লঞ্চিং প্যাড ও আশপাশে যে-ই থাকুক পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।
‘গাইডেন্স সিস্টেম কিভাবে সেট করা হয়েছে মিস্টার রানাকে দেখাও, চৌধুরী,’ মালদিনির হুকুম।
মিসাইল বিশেষজ্ঞ বিস্তারিত বর্ণনায় গেলেন, কন্ট্রোল ইউনিটের বিভিন্ন

নব, সুইচ তর্জনী তাক করে দেখালেন। অত্যন্ত আন্তরিক হাব-ভাব লক্ষ করা গেল তাঁর মধ্যে, এবং তিন সহকারী কোনো ভুলচুক করলেই চড়া গলায় ধমকে উঠলেন। রানা লক্ষ করল, অশিক্ষিত-অদক্ষ লোক তিনটে কাজ বেশ ভালোই রপ্ত করে নিয়েছে।

রানা ভীত-সন্ত্রস্ত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল মুখের চেহারায়, এবং কুদরত চৌধুরী যখন বললেন এই মিসাইলটা ইরাকের অয়েল রিফাইনারীতে আঘাত হানবে তখন মালদিনির উদ্দেশে, 'মাই গড, আপনি কি মানুষ না পিশাচ,' বলে উঠল উঁচু স্বরে । হা-হা করে আত্মপ্রসাদের অট্টহাসি হাসল লোকটা।

'আর কোথায় কোথায় তাক করা হয়েছে বললে না?' মালদিনি উস্কে দিল কুদরত চৌধুরীকে ।

'ওয়াশিংটন। মস্কো। কায়রো। এথেন্স । বাগদাদ। দামাস্কাস। তেল আবিব। বড় বড় সব শহরের দিকে। মিডল ইস্ট বলে আর কিছু থাকবে না, মিস্টার রানা, দুনিয়া যদি জেনারেলকে তাঁর সাম্রাজ্য দিতে অস্বীকার করে।

'আরেকটা বসিয়েছি আদ্দিস আবাবার দিকে মুখ করে, ইথিওপিয়ানরা যদি আত্মসমর্পণ না করে তো-' অর্থপূর্ণ হাসল মালদিনি।

জুলেখা ভীতিমাখা চোখে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

'তুমি এটাকে ঠেকাতে পারবে হয়তো,' মেয়েটিকে বলল মালদিনি । তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানীর উদ্দেশে বলল, 'চৌধুরী, ঢেকে দাও।' একটা পাথরের ওপর নিদারুণ হতাশ অভিব্যক্তি নিয়ে বসে রইল রানা। কুদরত চৌধুরী তাঁর লোকদের নিয়ে ক্যামোফ্লেজ করছেন মিসাইলের গুপ্তস্থান। সব কটা মিসাইল নিষ্ক্রিয় কিনা ভাবছে রানা।

'অত কী ভাবছেন, মিস্টার রানা?' মালদিনি জিজ্ঞেস করল।

'ভাবছি প্রচণ্ড প্রভাব ও প্রতিপত্তি না থাকলে এগুলো জোগাড় করতে পারতেন না আপনি। আমাদের রিপোর্ট বলছে চুরি গেছে এগুলো, এবং কোনও দেশের সরকারই জানে না কি ঘটেছে এগুলোর ভাগ্যে।'.

'সেটাই ওদেরকে ভাবতে বাধ্য করেছি আমি।' 'মানে সব কটা দেশেই আপনার কন্ট্যাক্ট আছে।' 'এই তো, ধরে ফেলেছেন।'

'এত টাকা পেলেন কোথায়? আপনি লিভর্নো ছাড়ার এতদিন পরও এত কাঁচা টাকা আসে কোত্থেকে?'

'সব কথা জানতে চান কেন?' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল মালদিনি। 'আর জেনে করবেনই বা কি? কালই যখন আপনার ভাগ্য নির্ধারণ হবে।'

কুদরত চৌধুরী ও তাঁর সহকারীদের কাজ শেষ। গার্ডরা রানাদের ঘেরাও করে, কাছের গ্রামে ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে নিয়ে এল। দরজায় লাগানো ডালপালার পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে ওদের সাবধান করা হলো ঝামেলা যাতে না পাকায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খাবার আসার অপেক্ষা করছে জুলেখা। বড় পাত্রে স্টু এল।

'এরপর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ফিস্ট করতে যাবে মালদিনি । এখানে জনা দুই যোদ্ধা থাকবে।'

খাওয়ার পর্ব সারা হলে, গার্ডদের একজনের হাতে পাত্র দুটো তুলে দিল জুলেখা। লোকটা গর্জে উঠতে, দরজার কাছ থেকে সরে এল ও। গ্রাম থেকে হৈ হল্লা আর বিক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণের শব্দ ভেসে আসছে।

রানা, জুলেখা, কুদরত চৌধুরী আর তাঁর তিন সহকারী আলোচনায় বসে ঠিক করল, আমহারিক, অর্থাৎ জোসেফ ক্রেন যোদ্ধা হিসেবে সঙ্গে থাকবে। ডানাকিল, অর্থাৎ আবু হাতেম, মরুভূমিতে গাইড করবে ওদের। আলী দাঈ, সোমালী চুরি করবে উট । স্ত্রী উট, নাকি পুরুষ উট এ নিয়ে একদফা বচসা হয়ে গেল ডানাকিল আর সোমালীর মধ্যে। জুলেখা রানাকে ইংরেজিতে জানাল, ডানাকিল ও সোমালী গোত্র পরস্পরকে শত্রু জ্ঞান করে। এই দুই গোত্র আবার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের কারণে ইথিওপিয়া শাসনকারী জুলেখার আত্মীয়দের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। ওরা চায় মেয়েটিকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে। সেজন্যে নিজেদের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতেও পিছপা হবে না ।

'কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের?' কুদরত চৌধুরীর প্রশ্ন।

'মাঝরাত পর্যন্ত,' জানাল জুলেখা। ভূরিভোজের পর সহজেই খুন করা যাবে ওদের। মিস্টার রানা, শুনেছি আপনি দুর্দান্ত লোক।

'আমাকে রানা বলে ডেকো।'

'কুদরত চৌধুরী বিজ্ঞানী মানুষ, যোদ্ধা নন। আমরা তোমার ওপর ভরসা করছি, রানা।

অপেক্ষা যখন করতেই হচ্ছে, ভাবল রানা, একটু জেরা করা যাক। কুঁড়ের দূরপ্রান্তের দেয়ালের দিকে সসম্ভ্রমে বিজ্ঞানীকে আমন্ত্রণ জানাল ও ।

'আমাকে যেটা দেখালেন সেটার মত বাকিগুলোও কি এরকম অকেজো?' মৃদু

স্বরে বলল ।

'স্বল্প পাল্লার চারটের নিজস্ব পোর্টেবল লঞ্চার আছে,' বললেন বিজ্ঞানী। 'এর দুটো আমার কন্ট্রোলে, কাজেই ওদুটো আপসে সাগরে গিয়ে পড়বে, কোন ক্ষতি হবে না।'

'আর অন্য দুটো?'

'জার্মানরা ওগুলো অপারেট করে। আমি দুঃখিত, রানা, ওদের আমি বিশ্বাস করি না। ড্রাগ খেয়ে একেবারে মালদিনির পায়ের তলায় চলে গেছে ওরা। আর বাকিগুলো যারাই অপারেট করুক কিছু এসে যায় না। ফায়ার করলে ধ্বংস এবং ক্ষতি যা করার এখানেই করবে। কিন্তু মিনিটমেনগুলোর কথা বলতে পারছি না। ওগুলো আমার হাতে আসেনি। ভয়টা সেখানেই, ওগুলো জুড়ে ফেলতে ওদের সময় লাগবে না, রানা। '

'ও নিয়ে ভাববেন না,' অভয় দিল রানা। 'জোড়া দিতে পারবে না। বেশ কিছু পার্টস ওগুলোর বালিতে কবর দিয়েছি আমি। কিন্তু ধরুন, আপনাকে অন্য কারও মিসাইল অপারেট করতে দিল, তখন কী করতেন?'

'কী আর করতাম,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন বিজ্ঞানী। 'এমনভাবে অপারেট করতাম যাতে ওখানেই ফাটে, কারও ক্ষতি না হয়।'

'তাতে তো প্রাণটা হারাতেন,' বলল রানা ।

'অনেক বছর তো বাঁচলাম, আর কত,' বললেন বিজ্ঞানী। 'চেষ্টা করতাম সঙ্গে মালদিনিকে নিয়ে যেতে।'

বৃদ্ধের কথা শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল রানার। মনে পড়ল এক

জোড়া কাঁচা-পাকা ভ্রূর বন্ধু এই লোক। ভাঙবে তবু মচকাবে না। শরীরের ভর পরিবর্তন করে উরুতে টেপ দিয়ে আটকানো ছুরিটা অনুভব করল রানা। দু'জনই বাঁচব তা নাও হতে পারে, বলল ও। কাজেই মন দিয়ে শুনুন। বাংলাদেশী দূতাবাস পর্যন্ত যেতে পারলে ভেতরে ঢুকে পড়বেন। দায়িত্বশীল কাউকে খুঁজে বের করে বলবেন, এম আর নাইনের কাছ থেকে মেসেজ এনেছেন আপনি। বিসিআইয়ের এম আর নাইন। মনে থাকবে তো?দ

কোড ও এজেন্সির নাম পুনরাবৃত্তি করলেন বিজ্ঞানী। 'কি বলতে হবে ওদের?' তআমাকে এই মাত্র মিসাইল সম্বন্ধে যা বললেন।'

'আরেকটা কথা, রানা, আমার কাছে আর তিনদিনের ড্রাগ আছে। এরপর অচল হয়ে পড়ব আমি। সাতদিনের ডোজ দেয় শয়তানটা। সাতদিন পর চেয়ে নিতে হয়। ডানাকিলদের ড্রাগ আর ক্ষমতার লোভ দেখিয়েই হাত করেছে মালদিনি । মরুভূমির মাঝে ওদের দিয়ে পপির চাষ করাচ্ছে সে। '

কথা শেষ হয়ে যেতেই সময় কাটানোর আর কোনো উপায় নেই দেখে খানিক ঘুমিয়ে নেবে ভাবল রানা। জানে ও, বিশ্রামটুকু খুব কাজে দেবে পরে। একই পরামর্শ দিল ও প্রত্যেককে ।

দশ

ছোট্ট মিলিটারি এয়ারফিল্ডে রানাকে আমন্ত্রণ জানালেন জেনারেল হাশমী তাঁর আক্রমণ পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। যুদ্ধের জন্যে তৈরি ও কষ্টসহিষ্ণু মনে হল ওদের দেখে। আমহারিক গোত্র থেকে এসেছে বেশিরভাগ, এবং রানার ধারণা হল, ইথিওপিয়ার জাতিগত সমস্যার কথা মাথায় রেখে, এদের বাছাই করতে হয়েছে ভদ্রলোককে। ঝটপট রওনা হয়ে গেল ওরা।

মাখনের মত মসৃণ হল মিলিটারি অপারেশনটা। জেনারেলের কপ্টার থেকে লক্ষ করল রানা, অ্যাটাক ফোর্সের তিন আর্মস গিলে নিল ডানাকিল গ্রামটাকে। এবার মালদিনির হেডকোয়ার্টারমুখো হল ওরা, এবং পাক্কা বিয়াল্লিশ মিনিটের মাথায় ক্যাম্পের মাথার ওপর অবস্থান নিল।

রেডিও থেকে আমহারিক ভাষার বিস্ফোরণ শোনা গেল। জেনারেল হাশমী তাঁর মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে এক ঝাঁক আদেশ দিলেন । 'ওরা মিসাইল বের করছে,' বললেন। 'আমরা এখন ওদের চমকে দেব।' তিনটে জেট, রকেট ও নাপাম ওগরাচ্ছে, ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে এল সূর্যের আড়াল থেকে। আরও ছটা ফাইটার-বম্বার অনুসরণ করছে ওগুলোকে। মালদিনির দুটো মিসাইলসাইট থেকে ধোঁয়ার তরঙ্গ উঠতে দেখল রানা। একটি উত্তরে, ওর ক্যাম্প আর ডানাকিল গ্রামটার মাঝখানে, এবং অপরটা ক্যাম্পের দক্ষিণ দিকে। মাটিতে মিশে গেল পপি খেত। দু'জায়গায় চাষ করেছিল ডানাকিলরা। গোটা দুই নাপাম পড়তেই, কপ্টারের উদ্দেশে গুলিবর্ষণরত লোকগুলো যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে লাগল। দক্ষিণে বিকট এক বিস্ফোরণ কমান্ড কপ্টারটাকে বাধ্য করল উন্মাদের মতো গতিপথ পরিবর্তন করতে । 'এই বুদ্ধুগুলো কোনো ফেইল-সেফ যন্ত্র হাতাহাতি না করলেই বাঁচি,' বলল রানা।

'অ্যাটমিক বিস্ফোরণ হলে মারা পড়ব আমরা,' সায় জানালেন হাশমী। 'তাও মধ্যপ্রাচ্যের কোনো বড়ো শহরের চাইতে এখানে থাকা ভালো ।'

অ্যাটমিক বিস্ফোরণ ঘটল না। জেনারেল আদেশ করলেন মালদিনির ক্যাম্পের মাঝ বরাবর কপ্টার নামাতে। কাছের এক গিরিখাতে আশ্রয় নিয়েছে বিদ্রোহীদের শেষ দলটা। তাদের দমন করতে গুলিবর্ষণ করতে করতে ছুটে গেল গানশিপ।

'দলছুটদের দিকে লক্ষ রাখবেন,' সতর্ক করে দিয়ে, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করলেন হাশমী

জ্যাকেট খুলে হাতে নিয়ে এল রানা লুগারটা। ওটার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন জেনারেল। বাহুর খাপে পোরা স্টিলেটোটার উদ্দেশে ইঙ্গিত করলেন । 'আপনি যুদ্ধসাজে সেজেছেন দেখতে পাচ্ছি।'

যুদ্ধ করতেও হল। মালদিনির ভস্মীভূত তাঁবুর দিকে পায়ে হেঁটে এগোতেই ওদের লক্ষ্য করে গুলি শুরু হল। ক্রীতদাসীদের কম্পাউন্ডের আশপাশের পাথরগুলোর মাঝ থেকে গুলি করছে ছোট্ট একটা ডানাকিল গ্রুপ। পাল্টা গুলি বিনিময় করল ওরা।

রেডিও অপারেটরের উদ্দেশে হাঁক ছাড়লেন জেনারেল। একটু পরেই, উপত্যকার দক্ষিণপ্রান্ত থেকে অল্প ক'জন সৈন্যের একটা দল এসে, হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে দিতে লাগল। আত্মরক্ষাকারীদের একজনকে রানাদের অবস্থান লক্ষ্য করে ধেয়ে আসতে দেখা গেল । লুগার পেড়ে ফেলল ওকে। এই একটা গুলিরই সুযোগ পেল রানা সারা দিনে। আরেক পশলা গ্রেনেড হামলার পর সৈন্যরা তেড়ে গেল পাথরস্তূপ লক্ষ্য করে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তারপরই সব খেল খতম । জেনারেল হাশমী উঠে দাঁড়িয়ে ইউনিফর্মের ধুলো ঝাড়লেন। 'চলুন, মিস্টার রানা, আমাদের স্বঘোষিত জেনারেলটিকে খুঁজে বের করা যাক।'

তাঁবুতে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালাল ওরা। বেশ কিছু ডানাকিল ও ইউরোপীয়র লাশ দেখা গেলেও জেনারেল মালদিনি তাদের মাঝে নেই। হাতে গোনা বন্দি ক'জনের মধ্যেও পাওয়া গেল না তাকে।

'ডানাকিলগুলোকে মুখ খোলাতে বেশ সময় লাগবে,' বললেন জেনারেল হাশমী ।

সরকারি লোকেরা সাধ্য সাধনা করুক, রানা ঘুরে বেড়াতে লাগল এলাকাটার চারধারে। ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল, তারপর আবার জড় করে প্রহরাধীন রাখা হয়েছে। রানার তাঁবুতে ছিল যে দুই জার্মান, তাদের দেখে অফিসার ইন চার্জের কাছে কথা বলার অনুমতি চাইল ও। রানাকে স্যালুট করে কথা বলতে দিল অফিসার।

'মালদিনি কোথায়? প্রথম প্রশ্ন ছুঁড়ল রানা।

'তুমি যাওয়ার ক'দিন পর সে চলে গেছে,' জানাল একজন। 'কুদরত চৌধুরী কেমন আছে?'

'মারা গেছেন। মালদিনি কোথায় গেছে?'

'জানি না। ও আর সাচ্চি কাফেলা তৈরি করে, ম্যাকলিনকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে।'

রানার যা জানার জানা হয়ে গেল, কিন্তু জেনারেল হাশমী বাকি দিনটা ডানাকিলদের নির্যাতন করে এর সত্যতা স্বীকার করালেন।

‘মালদিনি এখন সাগরে,’ বললেন জেনারেল। ইথিওপিয়ার মাটিতে আর সে নেই । কিন্তু তাতে ইথিওপিয়ার সমস্যা কাটছে না, রানা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল। ‘আমরা নিরপেক্ষ দেশ। বড়ো কোনো নৌবহর নেই যে সর্বক্ষণ সাগর পাহারা দেব। কী করতে বলেন আমাদের?’

‘কিছুই না,’ বলল রানা। ‘আপনার লোকেরা , আপনাদের এয়ারফোর্স চমৎকার কাজ দেখিয়েছে। এখন আপনার বা আমার একার পক্ষে সাঁতরে গিয়ে মালদিনির জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া সম্ভব না। তাছাড়া আমার বিশ্বাস শেপ মাইয়ার ইথিওপীয় জেটের আওতার বাইরে চলে গেছে। আসমারা ফিরে বসের সঙ্গে আলাপ করে দেখি কি করা যায়।’

বাইরে শান্ত-সংযত ভাব বজায় রাখলেও, বিলম্বের জন্যে মনে মনে হাশমীর অহংবোধকে অভিশাপ দিচ্ছে রানা। যত জলদি রাহাত খানকে মালদিনির অন্তর্ধান সম্পর্কে জানানো যায়, তত তাড়াতাড়ি শেপ মাইয়ারের বিরুদ্ধে পরবর্তী কর্মপন্থা ছকে ফেলা যাবে। কিন্তু খোলামেলা রেডিও সার্কিটে এ নিয়ে আলাপ করতে পারছে না রানা। কোড ব্যবহার করলেও মুশকিল, অপমানিত বোধ করবেন হাশমী। লোকটা এখানে ছড়ি ঘুরিয়ে যদি আত্মতৃপ্তি লাভ করে, করুক না ।

‘সাধারণ বুদ্ধিতে বলে’, আসমারায় ফিরে এলে সন্ধেবেলা রানাকে বললেন বস, ‘মালদিনির নিজস্ব নৌবাহিনী নেই, এবং শেপ মাইয়ারে গিয়ে চড়েছে সে। খোলা আটলান্টিকে আছে লোকটা, সমস্ত ট্রেড রুটের সীমানার বাইরে। মিশরীয় একটা ক্যারিয়ার আর চারটে ডেস্ট্রয়ার ছায়া দিচ্ছে ওটাকে। আর দুটো সিরিয়ান সাবমেরিন কভার করছে আফ্রিকান উপকূল।

‘আমার অনুমান শেপ মাইয়ার আর্মড,’ বলল রানা । দুটো আলাদা সুপারস্ট্রাকচার এবং লোয়ার ডেকের বিশাল এলাকা সম্পর্কে জানাল সে বসকে ।

‘থ্রি-ইঞ্চ গান, মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। ‘বিসিআই তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েই ডাটা সংগ্রহ করতে শুরু করে।’

‘মালদিনি জাহাজে আছে নিশ্চিত হব কীভাবে?’

‘হুঁ।’ চিন্তামগ্ন হলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান।

এগারো

রানা আশা করছিল বস ওকে ঢাকা ফেরত পাঠিয়ে মিশনের ইতি টানবেন । মালদিনির হেডকোয়ার্টার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মাসুদ রানা ইথিওপিয়া এসে কাজের কাজ কী করল? না, না, সে জুলেখাকে উদ্ধার করে এনেছে। এনে অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে খুশি রানা, কিন্তু টের পেল ইথিওপিয়া সরকার এটুকুতে খুশি নয় ।

কাজেই বস যখন আসমারায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবস্থা করে দিলেন এবং নতুন কাপড়-চোপড় কিনতে বললেন তখন খুব একটা আশ্চর্য হল না রানা।

‘এখানে কী করতে হবে আমার?’

‘তুমি ঠিক জানো মালদিনি ওই জাহাজে আছে?’

‘না।’

‘আমিও না। মিশনটা এত সোজা, ঠিক যেন মেলে না, রানা। আর ওই মিসাইলগুলোর কথাই ধরো। ইথিওপিয়া নিরপেক্ষ বন্ধু রাষ্ট্র হলেও দেখবে ওগুলো ফেরত নিতে বেগ পেতে হবে। মরুভূমিতে ওগুলো কাছ থেকে দেখার সুযোগ দিল না কেন হাশমী কিছু বুঝতে পারলে?’

‘দুটো কারণ আছে, স্যার। প্রথম, সে বিদেশিদের পছন্দ করে না, এবং তার ধারণা লুকানোর মতো কিছু আছে ওখানে।

ইথিওপিয়াকে একটা ডেলিকেট সিদ্ধান্ত নিতে হবে,’ বললেন বস। ওই মিসাইলগুলোর কয়েকটার মালিক মিশর। ইসরাইলীও কিছু আছে। আরব বিশ্বের অভ্যন্তরীণ চাপে মিশরের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হবে ইথিওপিয়া। কিন্তু দু’দেশের কারও বাহুবল বৃদ্ধি পাক সেটা এরা চাইবে না। মোট কথা, মিসাইলগুলোর কি হিল্লে করবে তাদের জানা নেই। কাজেই আসমারায় থাকছ তুমি। চোখ রাখছ এদের গতিবিধির ওপর।’

রানাকে আসমারায় ফেলে রেখে স্বদেশে ফিরে গেলেন বস। কাজেই বসে বসে আঙুল চুষছে রানা। কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে জানে না বলে আরও অসহ্য লাগে জেনারেল হাশমী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেছেন ওকে; এবং জুলেখা না থাকলে কমন যে লাগত ভেবে শিউরে ওঠে রানা। কারণ আসমারা মোটেও আকর্ষণীয় কোন শহর নয় ।

মাসুদ রানার কন্ট্যাক্ট হচ্ছে বাংলাদেশ দূতাবাসের জনৈক কেরানি। রাহাত খানের বিদায়ের দশ দিন বাদে দেখা মিলল তার। লম্বা-চওড়া এক রিপোর্ট বগলদাবা করে নিয়ে এসেছে। ওটা ডিকোড করতে দু’ঘণ্টা লাগল রানার। শেষ করার পর উপলব্ধি করল, কেউ একজন মস্ত বড়ো এক ট্যাকটিকাল ভুল করে রেখেছিল ।

নেভি শেপ মাইয়ারকে খুঁজে পেয়েছিল আটলান্টিকে, শিপিং লেনের বাইরে, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে, নিরক্ষরেখার একটু ওপরে। এক ক্যারিয়ার ও চার ডেস্ট্রয়ারের একটা টাস্ক ফোর্স আক্রমণ করে ওটাকে। পাল্টা লড়াই দিয়েছে শেপ মাইয়ার। কিন্তু ওটার তিন-ইঞ্চি গান আত্মরক্ষার জন্যে অপ্রতুল ছিল, এবং সাগরে টুকরো-টুকরো হয়ে যায় জাহাজটা। ভগ্নস্তূপের মধ্যে জীবিত কাউকে খুঁজে পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। এবং অকুস্থলে প্রচুর হাওর দেখা গেছে, ফলে নাভাল টাস্ক ফোর্স কোন মৃতদেহ উদ্ধার করতে পারেনি। তারমানে, কেউ বলতে পারে না মালদিনি জীবিত নাকি মৃত।

পরদিন এলেন জেনারেল হাশমী। রিপোর্টের একটা কপি তিনিও পেয়েছেন। রানার ড্রিঙ্কের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, কাউচে বসে কাজের কথা পাড়লেন ভদ্রলোক। ‘আমাদের অন্তত একজন টার্গেট জাহাজটায় ছিল না।’

‘মালদিনি? রিপোর্ট থেকে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।’

‘মালদিনির কথা জানি না, মিস্টার রানা। আপনারা ডানাকিল থেকে শহরে আসার পর কিছু লোকজনের নাম দেয় আমাকে জুলেখা। ওরা নাকি মালদিনির বন্ধু-বান্ধব। ইন্টেলিজেন্স আমার লাইন নয়, অল্প কয়েকজন এজেন্ট ছাড়া অন্যদের ওপর ভরসাও করি না। বিশেষ কয়েকজন রাজনীতিবিদ আর জেনারেলের ওপর গোপনে নজর রাখছে ওরা। ওই অফিসারদের একজনকে নাকি ইদানীং বিশালদেহী এক সাদা চামড়ার লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে। ‘

‘মালদিনির ক্যাম্পে ওরকম একজন মাত্র লোকই দেখেছি আমি,’

বলল রানা, 'সে হচ্ছে ম্যাকলিন। সে শেপ মাইয়ারে ছিল না শিয়োর আপনি?'

'মিশরীয় নেভি ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে জাহাজটাকে।'

'কিইবা করবে, থ্রি ইঞ্চ গান ব্যবহার করলে আপসে ওদের জাহাজে নামা সম্ভব।'

'কী করবেন এখন ভেবেছেন কিছু, মিস্টার রানা?'

'সেটা ঠিক করবে আপনার সরকার, জেনারেল। মিসাইলগুলো আপনারা কীভাবে অকেজো করবেন দেখে তারপর আসমারা ছাড়তে বলা হয়েছে আমাকে।'

'গুলি মারেন আপনার মিসাইলের।' হঠাৎ বিস্ফোরিত হলেন হাশমী। বিস্ফোরণের কারণটা ব্যাখ্যা করবেন ভদ্রলোক সেজন্যে অপেক্ষা করছে রানা। ওকে মোটেই সহ্য করতে পারছেন না জেনারেল। জুলেখার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব কি এজন্যে দায়ী? যাকগে, ভাবল রানা, এ লোক ইথিওপিয়ার স্বার্থে কাজ করছে, এবং যতক্ষণ না বিসিআইয়ের সঙ্গে এর মতপার্থক্য হচ্ছে, রানা ঠোকাঠুকি করতে যাবে না।

'মিস্টার রানা,' বললেন হাশমী। 'ইথিওপিয়ার কোনো ঠেকা পড়েনি নিউক্লিয়ার পাওয়ার হতে চাইবে। অত হ্যাপা সামলানোর ক্ষমতা আমাদের নেই।'

'সুযোগ এসে গেছে আপনাদের সামনে, সেটা নেবেন কিনা আপনারা বুঝবেন। আমি অবশ্য মিসাইলগুলো ফেরত চাই। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে।

'গত ক'দিন ধরে কানে আসছে আমরা নাকি এরইমধ্যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার হয়ে গেছি। মিসাইল হাতে থাকলে তার টার্গেটও লাগে। মধ্যপ্রাচ্য আর ইসরাইলের যেমন টার্গেট আছে। কিন্তু আমাদের শত্রু কোথায়?'

'কাজেই জাতিসংঘের হাতে ওগুলো তুলে দেওয়াই ভালো,' বলল রানা। 'তারাই বুঝবে ওগুলো রেখে দেবে নাকি যার যারটা তাকে ফিরিয়ে দেবে।'

'এ নিয়ে পরে আরও আলাপ করা যাবে,' বললেন জেনারেল হাশমী। 'আপনি তো আসমারায় কিছুদিন থাকছেনই।'

জেনারেল চলে গেলে দূতাবাসে গেল রানা। কেবল পাঠাল একটা মেজর জেনারেলের কাছে। জানতে চাইল ইথিওপিয়ায় মিসাইল বিশেষজ্ঞ পাঠাতে কদ্দিন লাগবে। ওঅরহেডগুলো আর্মড নয় বলেছেন জেনারেল হাশমী, কিন্তু তাঁর কথার সত্যতা যাচাই করে দেখতে চায় রানা।

দু'রাত পরে, আসমারার এক নাইটক্লাব পার্টিতে যাওয়ার প্রস্তাব তুলল জুলেখা। ইতোমধ্যেই এক সরকারি অফিসে যোগ দিয়েছে সে---রেকর্ড সংক্রান্ত কাজ-কর্ম তার। জেনারেল হাশমী ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কাজটার। নাইটক্লাবে রানা বিপদের আশঙ্কা করছে না, কিন্তু তারপরও লুগার, স্টিলেটো ও খুদে গ্যাস বোমাটা সঙ্গে রাখবে ঠিক করল।

পশ্চিমা সংস্কৃতির জঘন্যতম নিদর্শন হচ্ছে এই ক্লাবটা। বিশ্রী এক রক ব্যান্ড কান ঝালাপালা করে ছেড়েছে। তার ওপর সব কিছুরই এখানে চড়া দাম। ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি গানের জন্যে রীতিমতো হাহাকার উঠল মাসুদ রানার বুকের ভেতর। আধ ঘণ্টা পর জুলেখাকে নিয়ে পালাল ও।

আজ সন্ধেয় কেমন এক হিম-হিম ভাব, পাহাড়ি শহরের বৈশিষ্ট্য যেমন হয় আর কি! ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। এমনকি দারোয়ান, ফোন করে হয়তো কোনো একটাকে ডাকতে পারত, সে-ও উধাও। অবশ্য ঘোড়ায় টানা এক ক্যারিজ, খালিই দেখা গেল, দাঁড়িয়ে আছে নাইট ক্লাবের সামনে। জুলেখাকে নিয়ে ওটায় চড়ে বসে চালককে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের অবস্থান জানাল রানা। শূন্য দৃষ্টিতে চালক চেয়ে রইল ওর দিকে। ইতালিয়ানে বলল এবার রানা।

'সি, সিনর,' বলল লোকটা।

জুলেখা রানার বাঁ পাশে বসেছে, চলতে শুরু করল গাড়ি। নাইটক্লাবের শোরগোলের পর অস্বাভাবিক শান্ত লাগছে রাতটাকে। রাস্তার ওপর ঘোড়ার নিয়মিত ছন্দবদ্ধ খুরের শব্দে ঘুম পাবে যে কারও। জুলেখা শরীর ঢিল করে দিয়েছে। রানা আড়ষ্ট। ছোট্ট এক রহস্যের সমাধান করতে চেষ্টা করছে ও।

ইথিওপিয়ার স্কুলগুলোয় ইংরেজি বহুল প্রচলিত দ্বিতীয় ভাষা। আসমারা কসমোপলিটন শহর। হোটেলের বেয়ারা থেকে শুরু করে সমাজের মাথা পর্যন্ত সবাই একাধিক ভাষা রপ্ত করেছে। ক্যারিজ চালক ইংরেজি জানে না ব্যাপারটা সামান্য হলেও, সতর্ক হয়ে গেল রানা। অসাবধানতার কারণে শেপ মাইয়ারে মাথায় বাড়ি পড়েছে ওর। আবারও বেলতলায় যেতে রাজি নয় রানা।

একটু পরেই, দু'নম্বর সন্দেহটা আরও জোরাল প্রমাণিত হলো। আসমারায় বসে থাকতে হচ্ছে বলে, রানা কখনও জুলেখাকে নিয়ে, কখনও একা শহরের আশপাশে ঘোরাফেরা করেছে। তাই বলে যে এ শহরের নাড়ী-নক্ষত্র চিনে সে তা নয়। কিন্তু তারপরও সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগল ওর মনে, ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে চালক। ব্যাপারটা জানাল রানা জুলেখাকে।

স্থানীয় ভাষায় যুবতী কিছু বলল চালককে। লোকটা জবাব দিল, শরীর অর্ধেকখানি ঘুরিয়ে হাত নেড়ে কী যেন বোঝাল। জুলেখা কথা বলল ওর সঙ্গে আবার। লোকটা দ্বিতীয়বার কী এক ব্যাখ্যা দিয়ে তারপর সিধে হয়ে বসল। মন দিয়েছে গাড়ি চালনায়।

'ও বলছে এটা নাকি শর্টকাট,' বলল জুলেখা।

শোল্ডার হোলস্টারে লুগারটা ঢিল করল রানা। তআমার বিশ্বাস হয় না, 'বলল।

রানার অবিশ্বাস লোকটার ইংরেজি জ্ঞান ফিরিয়ে দিল কিনা কে জানে। সিটে ঘুরে বসে পকেট হাতড়াচ্ছে চালক। ঠাঁই করে লুগারের বাঁট পড়ল ওর চাঁদিতে। 'হুঁক' করে একটা শব্দ করে জ্ঞান হারাল লোকটা, আসন থেকে পড়ে যায় আরকি। হাত থেকে খসে ঠং করে রাস্তায় পড়েছে পিস্তলটা। ওদিকে, চালকবিহীন ত্রস্ত ঘোড়াটা তখন রীতিমতো ঘোড়দৌড় লাগিয়েছে।

'ঘাবড়িয়ো না!' জুলেখাকে আশ্বস্ত করতে চাইল রানা।

পিস্তলটা হোলস্টারে গুঁজে দিয়ে, এক লাফে সামনে গিয়ে পড়ল রানা। লাথি মরে সিট থেকে চালককে খসাল। তারপর লাগাম চেপে ধরে

সামলাতে ব্যস্ত হল উদ্ভ্রান্ত জানোয়ারটাকে।
বিপজ্জনকভাবে এপাশ-ওপাশ দুলছে ওরা। জট পাকিয়ে গেছে লাগাম দুটো।
সরু রাস্তাটা দিয়ে তীরবেগে ছোটার ফাঁকে ও দুটোকে সোজা করার চেষ্টা করল রানা। রাস্তার দু'পাশে ছিটকে গেল কয়েকজন পথচারী।
রানা প্রার্থনা করছে, কোনো গাড়ি-টাড়ি যাতে এমুহূর্তে মুখোমুখি পড়ে না যায়। শহরের এ অংশটা সুনসান মনে হল, রাস্তার পাশে মাঝেমধ্যে দু'একটা গাড়ি পার্ক করে রাখা। হাড় জিরজিরে ঘোড়াটা যে এমন ভেলকি দেখাবে কে জানত। এ মুহূর্তে কেনটাকি ডার্বি জেতার ক্ষমতা প্রদর্শন করছে এই বুড়ো ঘোড়া।
রানা শেষমেশ লাগামজোড়ার জট খুলে আরেকটু চাপ বাড়াতে পারল। চাপ যাতে দু'পাশে সমান থাকে, সতর্ক রইল ও। ক্যারিজটার সেন্টার অভ গ্র্যাভিটি অনেক উঁচু। আচমকা যদি বাঁক নেয় ঘোড়াটা, গাড়ি থেকে উড়ে গিয়ে রাস্তায় পড়তে হবে ওদেরকে। ধীরে ধীরে চাপ বাড়িয়ে চলল রানা। শ্লথ হতে শুরু করেছে ঘোড়াটার গতি। অনুচ্চ স্বরে কথা বলে ওটাকে শান্ত করতে চাইছে রানা ।
নিয়ন্ত্রণে প্রায় এসে গেছে গাড়ি এসময় চেঁচিয়ে উঠল জুলেখা, 'রানা! পেছন থেকে খুব জোরে একটা গাড়ি তেড়ে আসছে।'
'কতটা কাছে?দ
'কয়েক ব্লক দূরে, কিন্তু খুব দ্রুত কাছিয়ে আসছে।'
লাগামে ঝাঁকুনি দিল রানা। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে শরীর তুলে ফেলল ঘোড়াটা। প্রবল এক ঝটকা খেল ক্যারিজ। এবার মাটিতে খুর দাপিয়ে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে চেষ্টা করল জানোয়ারটা। লাগামে ফের ঝাঁকি দিল রানা, ঘোড়াটাকে থামানোর চেষ্টায় খিল ধরে গেল কাঁধের পেশিতে। আবারও দেহ শূন্যে তুলে দিল ভীত-সন্ত্রস্ত জানোয়ারটা। একপাশে কাত হয়ে গেল ক্যারিজ।
'লাফ দাও!' চেঁচাল রানা।
ডান পাশে লাগাম ফেলে সামনের বাঁ দিকের চাকার ওপর দিয়ে লাফ মেরে শান বাঁধানো রাস্তায় পড়ল রানা। কয়েক গড়ান দেওয়ায় ছড়ে গেল হাঁটু, ফালা ফালা হল কোট। উঠে দাঁড়িয়ে টলমল পায়ে সুউচ্চ এক বিল্ডিঙের উদ্দেশে এগোল ও। পেছনে চেয়ে দেখল, জুলেখা দশ ফিট দূরে রাস্তা থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে।
লাগামের চাপমুক্ত ঘোড়াটা পাই-পাঁই ছুটছিল আবার। কিন্তু ক্যারিজ উল্টে পতন হল বেচারার, শরীরটা চাপা পড়েছে গাড়ির নিচে । মরিয়া হয়ে শূন্যে লাথি ছুঁড়ছে, আর ডাক ছাড়ছে অবলা জানোয়ার। ওদিকে, তীব্র গতিতে তখন ছুটে আসছে পেছনের গাড়িটা রানাদের উদ্দেশে, মনে হচ্ছে যেন ভূতে পেয়েছে চালককে।
জুলেখা রানার কাছে দৌড়ে এসে কোনোমতে বলল, 'রানা, ওই যে...'
'কোন দরজা পাও কিনা দেখো।'
নির্জন রাস্তাটা ধরে ছুটল ওরা, বিল্ডিংগুলোর মাঝে কোনো ফাঁকা জায়গা পাওয়া যায় কিনা দেখছে। কিন্তু ওয়্যারহাউজ সদৃশ বাড়িগুলোর মাঝে একজন মানুষ গলার মতো ফাঁক নেই। একটা সেলারের প্রবেশপথ এসময় আবিষ্কার করল ওরা। গোঁ-গোঁ শব্দ স্পষ্টতর হচ্ছে গাড়িটার। জুলেখাকে সিঁড়ি দিয়ে ঠেলে নামিয়ে নিল রানা। রাস্তার লেভেলের নিচে এসে গেল দু'জনেই। গাড়িটার হেডলাইট আলোকিত করে তুলেছে এলাকাটা। কিইচ্ শব্দে তীক্ষ্ণ ব্রেক চাপা হলো এইমাত্র।
'শব্দ কোরো না', ফিসফিস করে বলল রানা, নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।
জুলেখা রানার বাঁ বাহুতে চাপ দিয়ে দূরে সরে গেল খানিকটা। এবার অস্ত্র ব্যবহারের স্বাধীনতা পেল রানা ।
দড়াম করে বন্ধ হলো গাড়ির একটা দরজা। তারপর আরেকটা। এবং আরও একটা। এঞ্জিন চালু আছে যদিও। তিনের কম নয় ওরা, চারজনও হতে পারে । 'খুঁজে বের করো ওদের,' একজন চোস্ত ইতালিয়ানে আদেশ করল। রানার বুঝতে কষ্ট হল না কে লোকটা। ম্যাকলিন, ওরফে ব্রুনো কন্টি। ক্যারিজ চালক পিস্তল বের করার পর থেকেই ওকে আশা করছিল রানা । চাইছিল দেখা হোক, জেনারেল হাশমী যখন বললেন ও ইথিওপিয়ায় রয়েছে, তারপর থেকেই ।
এবার, বাছাধন, অস্ত্র আছে আমারও হাতে, মনে মনে বলল ও।
'ওরা ওয়াগনে নেই,' স্থানীয় কারও গলা ।
তআশপাশে আছে, থাকতেই হবে,' বলল ম্যাকলিন। 'অ্যান্ড্রুকে বলো এঞ্জিন অফ করতে, শব্দ শুনতে পাচ্ছি না।'
রানার হাত ধরে টানল জুলেখা। পেছনের দরজাটা ঠেলতেই খোলা পেয়েছে ও। ওখান দিয়ে পালানোর চিন্তা করেও পরমুহূর্তে সেটা বাতিল করে দিল রানা। লোকগুলোর কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে, তারা মনে করছে রানা ও জুলেখা আহত। কাজেই রানা ঠিক করল ওদেরকে থতমত খাইয়ে দিয়ে পরিস্থিতি অনুকূলে আনার চেষ্টা করবে। আহা, জুলেখার সঙ্গেও যদি এখন একটা পিস্তল থাকত। ডানাকিলে প্রমাণ পেয়েছে, কেমন লড়াকু মেয়ে ও।
শরীর কাত করে প্যান্টের ভেতর হাত ভরল রানা। উরু থেকে তুলে আনল খুদে গ্যাস বোমাটা। নতুন ধরনের এক নার্ভ গ্যাস ভরা আছে এটায়। জিনিসটা কয়েক ঘণ্টার জন্যে হতবিহ্বল করে রাখবে একজন মানুষকে। বিসিআই ল্যাবোরেটরি সতর্ক করে দিয়েছে ওকে, খুব শক্তিশালী লোক ছাড়া অন্যদের জন্যে জীবনহানিকরও হতে পারে বোমাটা। উপায়ান্তর নেই যখন, কী আর করা, শরীর প্রায় দু'ভাঁজ করে ধাপ বেয়ে পা টিপে টিপে উঠতে লাগল মাসুদ রানা।
আরও কণ্ঠস্বর। গাড়ির এঞ্জিনটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। এবার একটা দরজা খোলার ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ। সটান দাঁড়িয়ে, বাঁ হাতে বোমাটা ছুঁড়ে মারল রানা, শেষ মুহূর্তে দূরত্ব মেপে নিয়েছে। ঠিক করেছে সরাসরি আক্রমণ চালাবে। গাড়িটার বাঁদিকে পড়ে বোমাটা বিস্ফোরণ ঘটালেও, রানার দৃষ্টি ছিল হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত এলাকাটার দিকে। ওর লুগার গর্জে উঠতেই একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এবার কে যেন, উল্টানো ক্যারিজটার আড়াল থেকে মেশিন পিস্তলের গুলি বর্ষাতে লাগল । মাথার ওপরে, পাথুরে দেয়ালে গুলি ঠিকরে দিক বদল করায় নিচু হল রানা।
'বিল্ডিঙের ভেতরে যাও,' জুলেখাকে বলল রানা।
বেসমেন্টে ত্বরিত সেঁধিয়ে পড়ল ওরা পথ খুঁজে। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটার

চারপাশে ডাঁই করে রাখা কার্ডবোর্ড কার্টন। রাস্তা থেকে আরেক পশলা গুলিবর্ষণ হলো, ঝনঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল কাঁচ। মাথার ওপরে, দুপ-দাপ পা ফেলার আওয়াজ।

'পাহারাদার,' বিড়বিড় করে জুলেখাকে বলল রানা। 'লোকটা পুলিসে খবর দিলে হয়।'

'না দিলেই বরং নিরাপদ আমরা,' মৃদু স্বরে বলল যুবতী। 'তৃতীয় বিশ্বে যা হয়। ওরা কাদের সাপোর্ট করবে কে জানে!'

এক সার সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে পদশব্দ। দু'পাশে গাদা করে রাখা কার্টনগুলোর পেছনে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল রানা আর জুলেখা। বাইরে রাস্তায়, ভারী জুতো পরা পায়ের আওয়াজ উঠল। ম্যাকলিন? কার্টনের মাঝখানের গলিটাতে দেখা হল লোক দুটোর। দু'জনেই গুলি চালাচ্ছে। দোরগোড়ার সামান্য ভেতরদিকে দাঁড়িয়ে ম্যাকলিন। নৈশপ্রহরী রানাদের ও ম্যাকলিনের মধ্যখানে অবস্থান নিয়েছে। প্রথম গুলি করার সুযোগ পেলেও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল পাহারাদারের। মেশিনপিস্তলের ফায়ার ওপেন করল ম্যাকলিন। রানা দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেল প্রহরীর দেহটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল। ফ্ল্যাশলাইট আর পিস্তল খসে পড়ল তার হাত থেকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। স্তব্ধ হল ম্যাকলিনের পিস্তল। এক লাফে আইলে গিয়ে পড়ল রানা, লুগারটাকে তলপেট বরাবর তাক করে ধরে একটা গুলি করল। তারপর ডাইভ দিয়ে পড়ল মেঝেতে।

আর্তনাদ ছাড়ল ম্যাকলিন। আরেক ঝাঁক গুলি উগরাল ওর মেশিন পিস্তল, তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল। রানার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে বুলেটগুলো। অগ্নিশিখা লক্ষ্য করে আরেকবার গুলি করল রানা। এবার মেঝেতে পতনের শব্দ শুনতে পেল ম্যাকলিনের।

বাঁ হাতে লুগার নিয়ে এসে, ডান হাতে স্টিলেটো বাগিয়ে ধরে, দ্রুত আইলের মাথায় চলে এল রানা। দরজার কাছে পাওয়া গেল ম্যাকলিনকে। শ্বাস চলছে ওর, তবে ক্ষীণ ।

'জুলেখা,' ডাকল রানা, 'বেরিয়ে এসো।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে, সিঁড়ির ধাপ ভেঙে উঠে এল ওরা, পৌঁছল রাস্তায়। কৌতূহলী লোকজন দেখা গেল বিপদসীমার বাইরে, ফলে লুগারটা হাতছাড়া করল না রানা।

'দৌড়তে পারবে?' জলেখাকে শুধাল ও ।

'পারব,' বলল যুবতী। 'কোথাও থেকে জেনারেল হাশমীকে ফোন করা দরকার।'

আঁকাবাঁকা গলিপথের মধ্য দিয়ে ছুটছে ওরা। এক ফাঁকে লুগার ও স্টিলেটো গোপন করল রানা। অবশেষে ব্যস্ত একটা রাস্তা পেয়ে গেল ওরা। বেশ কটা বার লক্ষ করল এখানে। থেমে দাঁড়িয়ে কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করে নিল দু'জনে। তারপর ঢুকে পড়ল একটা বারের ভেতর।

বারো

ম্যাকলিনের তাড়া খেয়ে যে বারটিতে গিয়ে ঢুকল ওরা, সেটিও বড়ো সুবিধের জায়গা নয়। পছন্দসই পতিতাদের এখান থেকে বেছে নিয়ে যায় খদ্দেররা। দেখা গেল, সন্ধের ঠাণ্ডা বাতাসের তোয়াক্কা নেই মেয়েগুলোর। দিব্যি পাতলা সামার ড্রেস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়, আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করছে ওরা নিজেদের। রানারা বারে ঢুকতে কটমট করে জুলেখাকে মাপল ওদের চোখ। এমনকি যাদের সঙ্গে খ দ্দের রয়েছে তাদের চাহনিও বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হল না। দুটো কারণে এদের রাগ হয়ে থাকতে পারে জুলেখার প্রতি। প্রথম, জুলেখা আমহারিক, এই মেয়েগুলো হয়তো ভিন্ন গোত্রের। এবং দ্বিতীয়ত, ওরা হয়তো ভেবেছে খদ্দের কেড়ে নিতে এসেছে নতুন আপদ। যা হোক, জ্যাকেটের চেন খুলে দিল রানা। শোল্ডার হোলস্টারে লুগারটাকে ঘুমোতে দেখলে সম্ভবত আগুনে জল পড়বে ওদের।

পরিস্থিতি বিচার করতে ভুল হয়নি জুলেখারও। 'রানা,' অনুচ্চ স্বরে বলল। 'পিঠের দিকে খেয়াল রেখো। ফাইট করতে হতে পারে।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'ফোনটা ইউজ করতে পারি?' বারে ঠেস দিয়ে বার টেন্ডার জিজ্ঞেস করল।

'দু'ব্লক পরে ডানদিকে একটা পে ফোন আছে।' জ্যাকেটটা আরেকটু খোলসা করল রানা। 'অত হাঁটতে যাবে কে?' জবাব চাইল ।

স্থানীয় ভাষায় কড়া গলায় কী যেন বলল জুলেখা। যাই বলুক না কেন, বারের দুটো টুল পেছনে বসে থাকা লোকটার তা পছন্দ হল না। প্যান্টের পকেট থেকে সাঁত করে এক সুইসব্লেড বের করে আনল সে। লুগারটা টেনে নিয়ে লোকটার মুখের ওপর ব্যারেল দিয়ে সজোরে টোকা দিল রানা। মেঝেয় ঢলে পড়ে গোঙাতে লাগল লোকটা, ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোচ্ছে।

'ফোন,' বারটেন্ডারকে স্মরণ করাল রানা।

'নেই।'

রানা এক লাফে বার টপকে গিয়ে পড়তে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা ড্রাফট বীয়ার ট্যাপের পেছন থেকে পিস্তলটা যে বের করবে সে ফুরসতও পেল না ও। রানা বাঁ হাতে ওর ডান হাত মুচড়ে ফোনের অবস্থান জেনে নিল। এবার ঘরের পেছনদিকে নিয়ে চলল লোকটাকে।

'বোকামি কোরো না।' শাসাল। 'পিস্তল বের করার চেষ্টা করেছ কি মরেছ।' বারের পেছনে ছুটে এল জুলেখা। স্কার্ট উঠে যেতে ঝিলিক দিল ওর লম্বা পা দুটো। বারটেন্ডার পিস্তলটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে, তাক করে ধরল পতিতা আর খদ্দেরদের উদ্দেশে। ওর কঠোর অথচ সংক্ষিপ্ত আঞ্চলিক ভাষার ভাষণটা রানাকে অনুবাদ করে শোনানোর প্রয়োজন পড়ল না। সারমর্ম বুঝে নিল রানা জায়গা ছেড়ে নোড়ো না, আরামে ড্রিঙ্ক করো, এবং রাতে যা খুশি করতে পারো।

বারটেন্ডার ফোনের কাছে নিয়ে এল ওদের। রানা কভার করল ওকে এবং জুলেখা জেনারেল হাশমীর সঙ্গে কথা বলল। কী কী ঘটেছে, ওরা এখন কোথায় এসব জানাল। এবার বারটেন্ডারকে ফোনটা দিল ও। জেনারেল কী বললেন লোকটিকে কে জানে, কিন্তু দেখা গেল, রানা আর জুলেখার বীরত্ব দেখেও যা পায়নি, তার চাইতে বেশি ভয় পেয়ে গেছে বেচারা। ওরা যতক্ষণ অপেক্ষা করল কোন খদ্দের বারের কাছ ঘেঁষল না। পনেরো মিনিট বাদে দুজন ষণ্ডা মার্কা দীর্ঘদেহী সৈনিককে নিয়ে বারে প্রবেশ করলেন জেনারেল। তাঁকে দেখে মেঝেতে মিশে যায়

আর কি বারটেন্ডার ।
‘গুড ইভনিং, মিস্টার রানা,’ বললেন জেনারেল। ‘জুলেখা সবই বলেছে। দেখা যাচ্ছে ম্যাকলিনের ব্যাপারে ভুল বলেনি আমার লোক।’
‘আমি আগেই জানতাম,’ বলল রানা। ‘আপনার আন্ডারে সবাই দক্ষ লোক।’
মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল জেনারেলের।
আসমারার উপকণ্ঠে এক আর্মি বেস। জেনারেল হাশমীর প্রাইভেট কোয়ার্টার। রানা ও জুলেখাকে নিয়ে এসে প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করেছেন জেনারেল। ফোনে কথা বলেছেন নানা জায়গায়। তারপর রাত তিনটের দিকে আলোচনায় বসলেন ওদের সঙ্গে।
‘আচ্ছা, শেপ মাইয়ারে মালদিনি ছিল বলে এখনও বিশ্বাস করেন আপনি?’ প্রশ্ন করলেন
রানাকে ।
শ্রাগ করল রানা। ‘জাস্ট আন্দাজ করতে পারি। প্রশ্ন হচ্ছে, ম্যাকলিন কি নিজে থেকেই এসব করল? আমার ধারণা, তা নয়। ও আর মালদিনি ওই জাহাজে ওঠেনি।’
‘তাহলে গেল কোথায় লোকটা?’
‘আছে ইথিওপিয়াতেই কোথাও,’ বলল রানা।
‘ম্যাকলিন জ্ঞান ফিরে পাওয়ার আগেই মারা গেছে অপারেশন রুমে। মালদিনির খোঁজ জানার আরেকটা সুযোগ ফস্কে গেল।’
‘কিন্তু ওই মিসাইলগুলোর ব্যাপারে তো একটা কিছু করতে হবে আপনাকে, জেনারেল,’ বলল রানা। ‘তা নাহলে আপনার দেশ অনেকের কোপানলে পড়বে।’
’না, মিস্টার রানা, সেই কিছুটা করছেন আপনি। সম্প্রতি কিছু কিছু ব্যাপারে সমঝোতার চেষ্টা চলছে। আমরা আপনাকে মিসাইলগুলো নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেব। বাংলাদেশ ইথিওপিয়ার কোস্টে একটা ক্যারিয়ার রাখবে। হেলিকপ্টার টেকনিশিয়ানদের এখানে পৌঁছে দেবে। মিসাইল থাকবে মরুভূমিতে, কিন্তু নিউক্লিয়ার ওঅরহেডগুলো জাতিসংঘের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে বাংলাদেশকে দিয়ে দেওয়া হবে। আপনি আমাদের জন্যে এত করলেন, আপনার দেশের মাধ্যমেই ওগুলো জাতিসংঘের হাতে পৌঁছাক আমরাও তাই চাই। মিসাইল বানানো তেমন কষ্টসাধ্য কাজ নয় জানেনই তো, নিউক্লিয়ার ওঅরহেড আসলে ডেঞ্জারাস করে তোলে ওগুলোকে।’
‘যারা ওগুলো পাহারা দিচ্ছে তাদের ওপর কন্ট্রোল আছে আপনার?’
‘হ্যাঁ,’ বললেন জেনারেল। ‘গভীর মরুভূমিতে পাঠানো হয়েছে ওদের। বুদ্ধিটা কেমন, দারুণ না?’
দ্বিমত করতে পারল না রানা।
’দু’একদিনের মধ্যেই ফাইনাল ডিটেইলস পেয়ে যাবেন। সে কদিন ইথিওপিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করুন, মিস্টার রানা।’
জেনারেল হাশমীর ড্রাইভার একটু পরে জীপে তুলে, রানা আর জুলেখাকে যার যার বাসায় পৌঁছে দিল ।
পাঁচদিন বাদে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিবরণ হাতে পেল রানা। জেনারেল

হাশমী জানিয়েছেন ওকে, সকাল ছটায় স্বয়ং উপস্থিত থেকে আঞ্জু সমারার সীমানা পার করে দেবেন। মাসুদ রানা আর আসমারায় ফিরছে না। ডানাকিল থেকে সোজা গিয়ে বাংলাদেশি ক্যারিয়ারে উঠবে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে ঢাকা থেকে। কাজেই জুলেখার কাছ থেকে আবেগঘন বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে রানা। এ ক’দিনে বেশ একটা ভাই-বোনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওদের মধ্যে। ওকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কেঁদেছে মেয়েটি।
’তোমাকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না, রানা,’ কাঁদতে কাঁদতে বলেছে। ‘তুমি আমার জন্যে যা করেছ মুখে বলে তোমাকে ছোটো করতে চাই না। আমাকে মরণের হাত থেকে, অসম্মানের হাত থেকে বাঁচিয়েছ।’
ছিঃ, বোকা মেয়ে, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছে রানা। আমি কিছুই করিনি। যেটুকু করেছি মানুষ মানুষের জন্যে তার চাইতে অনেক বেশি করে।’ চোখের জল মুছে দিয়েছে ও জুলেখার।
‘আবার কবে আসবে? কথা দাও, আমাকে ভুলে যাবে না।’
’তোমাকে কি ভোলা যায়? তাছাড়া, আমি তো সুযোগ পেলেই আবার চলে আসব।’ ওর কপালে চুমু দিয়ে বলেছে রানা। মনে মনে করুণ হেসেছে। আজ এ দেশে তো কাল সে দেশে শত্রুর পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে ও, মৃত্যুর পরোয়ানা মাথায় করে। কবে, কখন সুযোগ হবে আবার এদেশে আসার আল্লাই জানে। হয়তো আদৌ কোনোদিন হবেই না।

সুটকেস গোছায়নি রানা। লুগার আর স্টিলেটো ছাড়া অন্য কোনো মালামালের প্রয়োজনও নেই ওর। মালদিনির চ্যালারা কেউ ওর ওপর নজর রেখে থাকলে বুঝতে পারবে না দক্ষিণযাত্রা করতে চলেছে রানা। উন্মাদ লোকটাকে শায়েস্তা করে, নিউক্লিয়ার ওঅরহেডগুলো ইথিওপিয়া থেকে সরিয়ে নেয়াই এখন ওর মূল কাজ। ও নিশ্চিত ভাবেই জানে বেঁচে আছে মালদিনি। সুযোগের অপেক্ষায় আছে।
গাড়ি নিয়ে এলেন জেনারেল। ‘সারাদিন লেগে যাবে,’ বললেন।

চমৎকার ড্রাইভ করেন ভদ্রলোক, নানা জীব-জন্তু আর মান্ধাতা আঙ্গ মলের গাড়িগুলোকে দক্ষ হাতে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণমুখো চালাচ্ছেন গাড়ি। স্থানীয় রেল রোডের চাইতে ইথিওপিয়ার সড়ক যোগাযোগ ভালো হলেও প্লেন ভ্রমণই রানার কাছে সেরা মনে হল। ভদ্রলোক কেন গাড়ি ড্রাইভ করা বেছে নিলেন ব্যাখ্যা করলেন না। রানাও এ ব্যাপারে কিছু জানতে চাইল না।

যাত্রার বেশিরভাগটা সময় স্যান্ডহাস্টে তাঁর ছাত্র জীবন সম্পর্কে বকে গেলেন জেনারেল । তাঁর কণ্ঠে ব্রিটিশদের প্রতি যুগপৎ প্রশংসা ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটল । হুঁ-হা করে তাল মিলিয়ে গেল রানা তাঁর সঙ্গে।

জেনারেলের এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাতটা কাটাল ওরা। বাড়ির কোনো মহিলাকে চোখে পড়ল না রানার। গৃহকর্তার সঙ্গে কেবল সংক্ষিপ্ত আলাপ হল ওর খাওয়ার সময়।

সূর্যোদয়ের ঘণ্টা খানেক আগে, ছোট্ট এক এয়ারফিল্ডে, গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলেন জেনারেল রানাকে।

'পাইলটকে বিশ্বাস করতে পারেন,' বললেন তিনি। 'রেডিও ব্যবহার করে আপনার লোকেদের কল করুন।'

হেলিকপ্টারের পেছনে কমিউনিকেশন্স স্টেশনে এল রানা, যোগাযোগ করল ক্যারিয়ারের সঙ্গে। ওদিকে গা গরম করছে কপ্টারের এঞ্জিন।

'তছনছ করে দেয়া হয়েছে মালদিনির পপি খেত। একটা গি
এনহাউজও আস্ত নেই। মরুভূমির গভীরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিসাইলগুলো,' বললেন জেনারেল হাশমী। 'কেউ ওগুলো পাহারা দিচ্ছে না। আপনার লোকেরা এসে পড়লেই চলে যাব আমি। ঠিক আছে, মিস্টার রানা?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল মাসুদ রানা।

বাংলাদেশি টাস্ক ফোর্স ইতোমধ্যে শূন্যে উড়াল দিয়েছে, পনেরোটা নেভি হেলিকপ্টার প্রবেশ করেছে ইথিওপিয়ার আকাশ সীমায় ।

এই দেশে যেরকম গোত্র দ্বন্দ্ব, ভাবল রানা, তাতে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই নিউক্লিয়ার ওয়রহেড নিয়ে ফেরার পথে বাধা পড়বে না। কোনো গ্রুপ যদি চায় ওগুলো ইথিওপিয়াতে থাকুক, জাতিসংঘের হাতে না যাক, তাহলে ? আর কী, গণ্ডগোল, রক্তপাত ।

পুবে যাওয়ার পথে তিনটে উটের কাফেলার ওপর দিয়ে উড়ে গেল কপ্টার। ডানাকিল মরুভূমির কষ্টের স্মৃতি মনে পড়ে গেল রানার জানোয়ারগুলোকে দেখে।

ইথিওপিয়ানরা কি মালদিনির ডানাকিল সমর্থকদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নিয়েছে? জেনারেল হাশমীকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও চেপে গেল রানা। ভদ্রলোক হয়তো ভাবতে পারেন তাঁদের ঘরোয়া রাজনীতিতে নাক গলাচ্ছে রানা।

উচ্চতা হারাতে শুরু করেছে ওরা। নিচে চাইতে, নিখুঁত সারিতে রাখা মিসাইলগুলোয় সূর্যকিরণ ঝিকাতে দেখল রানা। মালদিনির হেডকোয়ার্টার থেকে এই বেলে অঞ্চলে ওগুলোকে টেনে এনেছে বেশ কয়েকটা বড়ো স্বড়ো ট্রাক্টর। সেগুলো অবশ্য এখন নেই। সম্ভবত এয়ারলিফট করা হয়েছে যন্ত্রগুলোকে, কেননা ট্র্যাক দেখা গেল একমুখী।

'আপনাদের টাস্ক ফোর্স আসতে কতক্ষণ বাকি, মিস্টার রানা?' প্রশ্ন করলেন জেনারেল হাশমী।

'বিশ মিনিট,' বলল রানা।

পাইলটের উদ্দেশে আদেশ বর্ষালেন তিনি। মিসাইলের ঠিক পশ্চিমে, শূন্যে খানিকক্ষণ ভেসে থেকে, তারপর নামতে শুরু করল কপ্টার।

'ফুয়েল পোড়ানোর কোনো অর্থ নেই,' বললেন জেনারেল।

পুড়িয়ে দেয়া পপি খেতের মাটি স্পর্শ করল কপ্টার। র‍্যাক থেকে রাইফেল তুলে নিয়ে রানাকেও একটা নিতে ইঙ্গিত করলেন জেনারেল। রানা দেখে নিল তার রাইফেলের ম্যাগাজিন ভর্তি আছে কিনা।

'আসুন,' বলে কপ্টারের ডানদিকের দরজা দিয়ে লাফিয়ে নামলেন ভদ্রলোক । রানা অনুসরণ করতে যাবে এমনিসময় গর্জে উঠল অটোমেটিক অস্ত্র। একাধিক। সাঁত করে রানা মাথা নামিয়ে পিছু হটতে এক ঝাঁক বুলেট কপ্টারের একটা পাশ চালুনি করে দিল। জেনারেল হাশমী টলে উঠে কপ্টারের মেঝের কিনারা খামচে ধরলেন। হাত বাড়িয়ে নিচ থেকে তাঁকে টেনে তুলল রানা খোলা দরজাটা দিয়ে।

রোটর চালু হতে কাঁপুনি উঠল কপ্টারে। আরও এক পশলা বুলেট আঘাত হানল। খোলা দরজা গলে একটা বুলেট কপ্টারে ঢুকতেই মুখে বাতাসের ঝাপটা অনুভব করল রানা।

'জলদি উঠুন!' চেঁচাল রানা, ইশারা করল পাইলটের উদ্দেশে।

বৃদ্ধি পেল এঞ্জিনের পাক খাওয়ার গতি, ফলে বাতাসে মাতাল নাচন তুলল কপ্টারটা। এবার রোটর ঘুরতে লাগল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। দ্রুত ওপরে উঠে বুলেটের আওতার বাইরে সরে এলো কণ্টার। জেনারেল হাশমীর পাশে হাঁটু মুড়ে বসল রানা ।

'ওদেরকে ইথিওপিয়া ছাড়া করবেন, আমার অনুরোধ...' নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন জেনারেল ।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,' আশ্বাস দিল রানা।

'ওরা এখানকার লোক নয়, দেশদ্রোহী... ওদেরকে ছাড়বেন না...'

মুখে রক্ত তুলে মারা গেলেন জেনারেল।

রানা সামনে, পাইলটের কাছে গিয়ে মৃত্যুসংবাদটা জানাল । 'ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাব আমি,' বলল পাইলট।

'না। আমাদের এখানে থাকতে হবে।'

'জেনারেলকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।' বেল্টে গোঁজা পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল লোকটা।

পাইলটের চোয়ালের নিচ বরাবর ডান হাতটা ল্যান্ড করল রানার। সীট থেকে পাইলটকে টেনে সরিয়ে কপ্টারের দখল নিল রানা। কপ্টারটা আমেরিকান, অচেনা নয়। কাজেই বাংলাদেশিরা না পৌঁছনো অবধি চক্কর কাটতে বেগ পেতে হলো না ওকে। নিচে এক বিঘা জমিতে শুয়ে আছে বিশাল মিসাইলগুলো ।

মিনিট খানেকের জন্যে কন্ট্রোল ছেড়ে পাইলটের .৪৫ বাজেয়াপ্ত করল রানা ওর হোলস্টার থেকে। নিশ্চিত হলো একটা কার্তুজ রয়েছে চেম্বারে এবং সেফটি অফ। এরপর আবার বড় করে পাক দিতে লাগল ও। নিচে থেকে লক্ষ করছে ওকে ডানাকিলরা। পুব দিকে উড়ে যাওয়ার সময় ছোট্ট ফোর্সটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল রানা।

পাইলট নড়তে চড়তে আরম্ভ করেছে। চোখ মেলে একদৃষ্টে রানার দিকে চেয়ে। এবার ওঠার চেষ্টা করল।

'নোড়ো না,' বলল রানা, .৪৫ দোলাল হুমকির ভঙ্গিতে।

'তুমি আমাকে আক্রমণ করেছ,' বলল লোকটা।

'আমার লোকেরা না আসা পর্যন্ত আকাশেই থাকছি আমরা,' বলল রানা। 'আমার কথা মতো চক্কর দিলে মারটা খেতে হত না।' ওর আনুগত্য উস্কে দিতে চাইল রানা। 'আর জেনারেলের শেষ আদেশ ছিল ওঅরহেডগুলো ইথিওপিয়া থেকে দূর করা...পাহাড়ে ফিরে গেলে কীভাবে করব কাজটা?'

হঠাৎ বায়ুতরঙ্গে আঘাত করল কপ্টার। নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে দু'হাত ব্যবহার করতে হল রানাকে। কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে চকিতে চাইতে ও দেখতে পেল উঠে পড়েছে পাইলট। টলমল পায়ে রাইফেলের র‍্যাকটার উদ্দেশে চলেছে। কপ্টারটা লাফ-ঝাঁপ না করলে এতক্ষণে গুলি করে বসত রানাকে। রানা সযত্নে লক্ষ্যস্থির করে ওর হাঁটুর পেছনে গুলি করল ।

পড়ে গেল না, টলে উঠল পাইলট। একপাশে আবারও কাত হয়ে গেল কপ্টার। জেনারেল হাশমীর লাশ ডিঙিয়ে, খোলা দরজা দিয়ে বাইরে উড়ে গেল পাইলট। রানা এমনটা আশা করেনি। লোকটার বেঁচে থাকা দরকার ছিল। সুপিরিয়রদের সে তাহলে বলতে পারত মিসাইলের মাঝে লুকানো ডানাকিলদের কথা। ইথিওপীয়রা এখন রানাকে দুষতে পারে জেনারেল হাশমীর মৃত্যুর

জন্যে ।

মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে আগুয়ান বাংলাদেশিদের কল করল রানা। 'সঙ্গে আর্মড লোকজন আছে তো?'

'বারো জন,' প্রত্যুত্তর এল ।

'যথেষ্ট নয়, কিন্তু ওদের দিয়েই কাজটা সারতে হবে,' মিসাইলের পাহারাদারদের কথা জানাল রানা ।

'বারো জন মেরিন এরা', টাস্ক ফোর্সের নেতা বলল। 'ওদের ক্যারি করা কপ্টারগুলো আগে নামাব আমরা। আর তিন মিনিটের মধ্যে দেখা পাবেন আমাদের।'

'বেশ,' বলল রানা। 'আপনাদের আগেই নেমে যার আমি।' এত অল্প লোক নিয়ে ডানাকিলদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে চিন্তিত ও ।

মেরিন দলটি পৌঁছানোর আগেই কপ্টার নামিয়ে আনল রানা। কৌশলটা ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু মিসাইলের একপাশে ল্যান্ড করে, ডানাকিলদের হতচকিত করে দেবে আশা করছে ও। মিসাইলের কারণে কপ্টারের গায়ে গুলি করতে দ্বিধা করবে লোকগুলো। মালদিনির আদেশ ছাড়া কাজটা করবে না। ও নিশ্চিত জানে মালদিনি আছে কাছেই কোথাও। উন্মুক্ত মরুর বুকে কপ্টার নামিয়ে, হতবিহ্বল স্থানীয় লোকগুলো গুলিচালনা আরম্ভ করতে পারার আগেই, লাফিয়ে কপ্টার থেকে নেমে গেল রানা। শরীর ভাঁজ করে সরে গেল কপ্টারের কাছ থেকে ।

উত্তপ্ত বালি আগুন ধরাচ্ছে দেহে। গানফায়ার ওপেন হতে কপ্টারের গায়ে বুলেট আছড়াতে শুনল রানা। এরপর ঘটল বিস্ফোরণ; ফুয়েল ট্যাঙ্কে বুলেট সেঁধোতেই সর্বাঙ্গে ছ্যাঁকা খেল যেন ও। ক্রল করার চিন্তা বাদ দিয়ে, রাইফেল বুকে চেপে ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল রানা। যতটা পারে নুইয়ে রেখেছে শরীর।

অনুচ্চ এক ঢিবির পেছনে ডাইভ দিয়ে পড়ল ও। প্রায় একই সময়ে চারপাশ থেকে ছিটকে উঠল বালি; বাতাসে শিস কাটল বুলেট। রাইফেলটা স্থির করে, মাটিতে শরীর মিশিয়ে দিল ও। জনা বারো হবে, মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে রানাকে লক্ষ করছে এক ডানাকিল গ্রুপ। মিসাইলের কাছাকাছি রয়েছে আরও দশ-বারো জনের মতো। পাল্টা জবাব দিচ্ছে এখন রানা। রাইফেল খালি হল দু'জনকে কাবু করে ।

রাইফেলটা ব্যস্ত হাতে রিলোড করল রানা। কপ্টার থেকে নামার সময় রাইফেল র‍্যাক থেকে গুলির বাক্স নিয়ে এসেছে। রাইফেলটা দ্বিতীয়বারের মত অর্ধেকখানি খালি হয়ে এসেছে, আরেকজন ডানাকিল কুপোকাত, এমনি সময় কাছিয়ে আসতে লাগল রানার প্রতিপক্ষ। দেহ ভাঁজ করে খানিকদূর দৌড়ে এসে থামছে, একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় করে কভার দিচ্ছে। ঢিবির আরেকপাশে সরে গেল রানা। আরেক শত্রুকে হত্যা করে আবার খালি হল ম্যাগাজিন।

ক্রমেই কাছিয়ে আসছে ওরা, শীঘ্রিই অনিবার্যভাবে কেউ না কেউ হিট করবে রানাকে। অতি প্রিয় জানটা যাচ্ছে এবার, রানা যখন মেনে নিয়েছে, ঠিক তখুনি সকালের রোদ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল বাংলাদেশি কপ্টারগুলো। গুলি চালাতে আরম্ভ করেছে মেরিন দল। পাঁচ মিনিটে শেষ হয়ে গেল যুদ্ধ। আর গুলি করার লোক খুঁজে পেল না রানা।

এক মেরিন সার্জেন্ট বালি মাড়িয়ে মন্থর পায়ে এগিয়ে এল, স্যালুট ঠুকে বলল, 'আপনি নিশ্চয় মাসুদ সাহেব?'

'আমিই সেই অধম, সার্জেন্ট', বলল রানা। 'একদম কাঁটায় কাঁটায় পৌঁছেছেন । আর একটা মিনিট দেরি হলে আমাকে উদ্ধার করতে হত না। '

'কারা ওরা?'

'ডানাকিল। কখনও শুনেছেন ওদের কথা?'

'জ্বী না, স্যার।'

'ওরা দুনিয়ার দ্বিতীয় সেরা যোদ্ধা।

মুখে হাসি ছড়াল সার্জেন্ট। 'প্রথম কারা, স্যার?'

'আমরা। বাংলাদেশের বাঙালিরা,' নির্দ্বিধায় বলল রানা ।

ভস্মীভূত কপ্টারটা আঙুল-ইশারায় দেখাল সার্জেন্ট। 'আপনার সঙ্গে কেউ ছিল নাকি, স্যার?'

'ছিল একজন। কিন্তু মারা গেছে লোকটা। মিসাইল টেকনিশিয়ানদের কাজে লাগাতে কতক্ষণ লাগবে?'

এক লেফটেন্যান্ট কমান্ডার বিভিন্ন দেশের বিশজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এসেছেন । অগুনতি প্রশ্ন ছিল তাঁর, কিন্তু রানা সে সুযোগ দিল না তাঁকে ।

'সে লম্বা কাহিনি, কমান্ডার, বলল। 'অত কথায় কাজ নেই। এ জায়গাটা ভালো নয়। বিদেশি লোক পেলেই খুনের নেশা চাপে এখানকার

বাসিন্দাদের।
পরিস্থিতি দ্রুত অনুধাবন করলেন কমান্ডার। মিসাইল থেকে ওঅরহেড খসাতে তখুনি লেগে পড়ল লোকেরা। গোটা পাঁচেক ও অরহেড খুলে কপ্টারে তুলেছে এসময় পুব দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে এল। নৌবাহিনী অ্যাকশনে নেমে পড়ল কালবিলম্ব না করে, ওদিকে রানা মিসাইলের ছায়া ছেড়ে, সধে হয়ে দাঁড়িয়ে লুগার বের করল। আরও শব্দ হয় কিনা সেজন্যে অপেক্ষা করল ও, কিন্তু হলো না। হঠাৎ এক নৌসেনাকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল ।
'মাসুদ সাহেব,' বলল। হাঁফাচ্ছে। 'জলদি আসুন। এক পাগল মিসাইলগুলো ফাটাতে চাইছে।'
রানা শশব্যস্তে ছুটল ওর পিছু পিছু। ছোট এক ঢিবিতে চড়তে দেখা গেল, মোটা মতো এক শ্বেতাঙ্গের হাতে একটা বাক্স। সোভিয়েতে তৈরি, মিশরের চুরি যাওয়া এক মিসাইলের পাশে দাঁড়িয়ে লোকটা। নির্ভুল প্রমাণিত হল মাসুদ রানার অনুমান রবার্তো মালদিনি ইথিওপিয়ারই কোথাও না কোথাও আছে ।
মালদিনির পঞ্চাশ ফিটের মধ্যে দাঁড়িয়ে রানা, সহজেই লুগার ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গুলি করার ঝুঁকিটা নিতে পারল না ও। মালদিনির হাতের বাক্সটা, এবং ওঅরহেডে জোড়া তারগুলো দেখার পর পারার কথাও নয়। অবিশ্বাস্য রকমের সাধারণ এক অস্ত্র। মালদিনি এখন কেবল একটা বোতাম কিংবা সুইচ টিপলেই হয়, ডানাকিলে ইতিহাসের বৃহত্তম ও ভয়ঙ্করতম আণবিক বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।
'ওটা হাত থেকে ফেলে দাও, রানা!' চেঁচিয়ে বলল মালদিনি।
বালিতে উড়ে গিয়ে পড়ল রানার লুগার। সেই মুহূর্তে দুটো কাজ করতে চাইল রানা। একটা হচ্ছে মালদিনিকে খুন করা। দ্বিতীয়টা, লেফটেন্যান্ট কমান্ডারকে চিবিয়ে খাওয়া। লোকটা রানার কাছে দূত না পাঠালে, গোপনে মালদিনিকে আক্রমণ করার একটা সুযোগ পেত ও ।
মালদিনি আদেশ দিল, 'নাও, আমার দিকে আস্তে আস্তে হাঁটা ধরো।' স্টিলেটোর কথা কি জানে না লোকটা? সম্ভবত জানে না, মনে মনে বলল, রানা। স্টিলেটোর কার্যকারিতা দেখার সৌভাগ্য তো হয়নি মালদিনির অথবা তার লোকেদের।
একটা মওকা জুটে গেছে যা হোক। কিন্তু ফায়দাটা লুটবে কি করে রানা? মালদিনি ডান তর্জনী রেখেছে একটা টগল সুইচের ওপর। রানা এতটাই কাছে, কটা তার আছে গুণতে পারল। দুটো তার ওই কালো বাক্সটা থেকে মিসাইলের মাথায় গেছে, ওটা মালদিনির ডান পাশে পেছন দিকে বিস্তার পেয়েছে-রানার বাঁয়ে সাইন্স ফিকশন ছবির সরীসৃপের মত রোদ পোহাচ্ছে। কতখানি কাছে এগোতে দেবে ওকে মালদিনি অঙ্ক কষছে রানা।
'ওখানে দাঁড়াও, রানা,' বলে উঠল লোকটা।
দশ ফিট। থেমে পড়েছে রানা। দুপুর উতরেছে সবে, ভারী জুতো-মোজা মানছে না তপ্ত বালি, সোল ভেদ করে পুড়িয়ে দিচ্ছে ওর পায়ের পাতা।
'এবার এই যে, তোমরা...!' চিৎকার থামিয়ে রানার দিকে কটমট করে চাইল মালদিনি। 'রানা, ডান দিকে সাবধানে দু'পা সরো।'
আদেশ পালন করল রানা। নৌবাহিনীর সদস্যদের এখন আর দেখ তে বাধা নেই মালদিনির। ওদের মধ্যে কারও এখন বীরত্ব চেগিয়ে না উঠলেই বাঁচি, আত্মগতভাবে বলল রানা। মালদিনিকে পেড়ে ফেলতে পারবে ওরা অব্যর্থ লক্ষ্যে, কিন্তু লোকটার আঙুলের ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত ক্ষীণতম টোকায় নেমে আসবে কেয়ামত ।
'যাওয়ার জন্যে তৈরি হও!' বলল মালদিনি ওদের উদ্দেশে। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে কপ্টার যেন আকাশে ওড়ে।'
আস্ত পাগল লোকটা, আর কোনো সন্দেহ রইল না রানার। ওঅরহেডে সংযুক্ত ডিটোনেটর ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র নেই মালদিনির কাছে। রানাকে আটক করার কোনো সুযোগই তার নেই। মিসাইল ফাটিয়েই কেবল রানাকে ও নিজেকে সে খুন করতে পারবে। লোকটা তার ভয়ঙ্কর, রেডিও অ্যাকটিভ আত্মহত্যার সাথী হওয়ার জন্যেই বুঝি ডেকে পাঠিয়েছে রানাকে।
কিন্তু বিকল্প সুযোগের যে কমতি রয়েছে তা কি বুঝতে পারছে পাগলটা? দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে রানার সর্বাঙ্গে। তিন মিনিট, বড়জোর চার মিনিট পাবে রানা উন্মাদ লোকটার মনের মধ্যে প্রবেশ করার জন্যে, তার পরিকল্পনা আবিষ্কার করে, ব্যর্থ করে দিতে। কালাঙ্গ ন্তক ওই কালো বাক্সটা হাত থেকে ফেলে দেয়ার আগেই কিছু একটা করতে হবে রানাকে। এক্ষুণি ।
'আমাদের জ্বালাতন না করে যুদ্ধের জন্যে অন্য কোনো দিন বেছে নাও। সরকারের ভেতর তোমার বন্ধুরা তো রয়েছেই,' কথার পিঠে কথা বলার সুরে বলল রানা। 'ডানাকিলদের মধ্যে তোমার ভালো প্রভাব আছে একথা সত্যি।'
রানা চাইছে না সহসা বাস্তবে ফিরে আসুক মালদিনি। আজকের যুদ্ধে ডানাকিলরা পরাজিত হবে কল্পনাও করেনি লোকটা। ভেবেছিল জেনারেল হাশমীর কপ্টার অ্যামবুশ করে, তারপর ন্যাভাল টাস্ক ফোর্স ল্যান্ড করতে না করতেই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু অত্যুৎসাহী এক ডানাকিল হাশমীকে দেখামাত্র গুলি করে বসে। এখন আর মালদিনির পিছু হটার রাস্তা নেই। ব্যাপারটা বুঝলেই সেরেছে, সুইচ টিপে, ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট তারের মাধ্যমে চালান করে দেবে ওঅরহেডের ওই টার্মিনালগুলোয়।
তার? রানা ত্বরিত পরখ করে নিল ওগুলো। ওর জীবন বাঁচাবে এগুলো, আশা করছে রানা। প্রত্যেকটা তার মিশেছে গিয়ে ছোট ছোট মেটাল ক্লিপে, টার্মিনালের স্ক্রু হেডের নিচ দিয়ে স্লাইড করা হয় যেগুলোকে। হেডের কাছে সব কটাকে জড়িয়ে দিয়েছে মালদিনি। সন্দেহ না জাগিয়ে যতখানি সম্ভব কাছ থেকে নিরীখ করে নিল রানা। একটা, টপ টার্মিনালটার সঙ্গে সংযুক্ত, ক্লিপের মাত্র দুটো পয়েন্টের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট পাচ্ছে। একটু জোরে টান দিতে পারলে তার সার্কিট ব্রেক করবে এবং ডিটোনেশন হয়ে পড়বে অসম্ভব। এখন রানার কাজ হচ্ছে, লোকটা সুইচ টিপে দেয়ার আগেই যাতে থাবা মারতে পারে ওটায়, এমনি অবস্থান নেয়া।
এক পা আগে বাড়ল ও।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' চেঁচাল মালদিনি ।
টাস্ক ফোর্স টেক অফের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে কপ্টারগুলোর এঞ্জিন।
'দুঃখিত,' মৃদু স্বরে বলল রানা। পায়ে খিল ধরে গেছে আমার। ওই ইথিওপিয়ান কপ্টারটায় এত বেশি যন্ত্রপাতি ছিল, পা ছড়িয়ে বসার জো ছিল না।দ
'পিছিয়ে যাও।'
বাঁয়ে, পেছনে সরে গেল রানা, চাইলেই এখন ওঅরহেড স্পর্শ করতে পারবে। বিদায়ী প্রতিপক্ষ ও রানাকে একই সঙ্গে লক্ষ করতে হলে মালদিনিকে সরে যেতে হত মিসাইলের কাছ থেকে। কিন্তু সরেনি সে। তারমানে ইলেকট্রিকাল কানেকশন যে ঢিলে, নিজেও জানে। অবশ্য জানলেও কিছু করতে পারবে কিনা সন্দেহ।
এমুহূর্তে কপ্টারের শোরগোল ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'জুলেখার কথা মনে আছে, মালদিনি?
'ওকে ফেরত পাব, বড়াই করে বলল লোকটা। 'ওকে ওরা আত্ম মার কাছে পাঠাবে আর নয়তো পৃথিবীর ম্যাপ থেকে মুছে দিয়ে যাব এদেশের নাম।'
'একবার পাখি খাঁচাছাড়া হয়েছে আর কি ফেরত আসবে?' উস্কে দিল ওকে রানা। 'তাছাড়া তোমার মতো একটা বদ্ধ পাগলের কাছে আসতে যাবেই বা কেন?'
রানার মুখে পাগল শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেল লোকটার। কয়েক পা এগিয়ে এল সে রানার উদ্দেশে, ডান হাতে আলগা হয়ে ঝুলছে কালো ডিটোনেটর বক্সটা, টল সুইচের সিকি ইঞ্চি দূরে ওর আঙুল । আরেকটু কাছে এলে সুবিধে হত, কিন্তু কি আর করা। সামনে ঝাঁপ দিল রানা । আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বাঁ হাত উঠে গেল লোকটার। যখন বুঝল রানার লক্ষ্য সে নয়, তার, তখন আর কিছু করার নেই। তারে উড়ে গিয়ে পড়েছে রানার দেহ। বাতাস হাতড়ানো হাত দুটো ওর খুঁজে পেয়েছে ওগুলো। গড়ান দিয়েই সটান দাঁড়িয়ে গেল রানা। সবচেয়ে ওপরের ওয়্যারটা, রানা যেটাকে দুর্বলতম ধারণা করেছে, এক হ্যাঁচকা টানে উঠে এল ওঅরহেডের টার্মিনাল থেকে।
মালদিনি পেছন থেকে মুখ খারাপ করছে শুনতে পাচ্ছে রানা। ঘুরে দাঁড়াতে, টগ্গ সুইচটাকে বৃথা আগু-পিছু করতে দেখল সে লোকটাকে। জুড়ে থাকা একমাত্র তারটা সর্বশক্তিতে টান মারল রানা। ওটাও খুলে এল ওঅরহেড থেকে । মালদিনির হাতের ডিটোনেটরটা এখন আর কিছুর সঙ্গেই না, কেবল ডানাকিল মরুভূমির বালির বুকে সংস্পর্শ পাচ্ছে।
উড়াল দিয়েছে কপ্টারগুলো। রানা আশা করছে অনেকেই ওপর থেকে দেখতে পাবে ওকে, এবং নেমে আসবে কপ্টার। সুইচ অ্যাকটিভেট করার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে হিংস্র চোখে রানার দিকে চেয়ে রয়েছে মালদিনি
'শুয়োরের বাচ্চা!' রাগে ফেটে পড়ল লোকটা। রানা ঈষৎ ঝুঁকে এগিয়ে গেল ওর দিকে। মালদিনি অকেজো ডিটোনেটরটা ছুঁড়ে মারল রানাকে লক্ষ্য করে। মাথা নোয়াল রানা। মালদিনি সেই সুযোগে নরম, অস্থির বালির ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু পালিয়ে যাবেটা কোথায়? রানার শরীরটা ডাইভ দিয়ে গিয়ে পড়ল লোকটার পিঠের ওপর।
'বাপ রে!' অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মালদিনি। ঘাড়ে মোক্ষম এক রদ্দা কষে ওকে অজ্ঞান করে দিল রানা।
মাথার ওপর গোঁ-গোঁ করছে হেলিকপ্টার।
কপ্টারে তোলা হচ্ছে ওঅরহেডের যন্ত্রাংশ। অচেতন মালদিনিকেও তোলা হয়েছে। সুপ্রাচীন, ভূপাতিত গাছের মতো মরুর কোলে পড়ে রয়েছে মিসাইলগুলো। তাজা থাকবে বহুদিন, কেউ খুঁজে পাক বা না পাক ।
'মাসুদ সাহেব,' লেফটেন্যান্ট কমান্ডার খন্দকার বোরহান বললেন, 'কে এই মালদিনি?'
'প্রতিভাবান এক উন্মাদ। ও পূর্ব আফ্রিকার সম্রাট হয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে চেয়েছিল। ওই ওঅরহেডগুলো কায়রো, দামেস্ক আর তেল আবিবে টার্গেট করেছিল।
'উন্মাদ কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের সবাইকে ছিন্নভিন্ন করে দিতেও বুক কাঁপত না ওর। একটা ওঅরহেডই যথেষ্ট ছিল এজন্যে, কিন্তু চেইন রিয়্যাকশন রেডিও অ্যাকটিভ ফলআউট ঢেকে দিত দুনিয়ার এ অংশটুকু।'
রেড সি-র মাঝামাঝি পৌঁছেছে কপ্টার।
মরুভূমিতে চোখ রাখল রানা, গোধূলিলগ্নে ধু-ধু বালির প্রান্তর অস্পষ্ট হয়ে এসেছে প্রায়। ডানাকিলদের উটের কাফেলা, মরুর বুকে পথ করে নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে চলেছে, দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেল রানা। এবার হঠাৎ জুলেখার কথা মনে পড়ল ওর। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মাসুদ রানার বুকের ভিতর থেকে।

কৃতজ্ঞতা ঃ সেবা প্রকাশনী

জীবন স্রোত

প্রণব দত্ত

আমি আকাশটার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতাম। ভাবতাম যদি কাউকে দেখা যায়। কখনো হাঁসের মতো, কখনো পাঠশালার মাস্টারমশাইয়ের মতো, কাউকে মাঝে মাঝে আকাশে উঁকি মেরে চলে যেতে দেখতাম। এই কথাটা দাদাকে বলাতে দাদা আমার মাথায় একটা গাট্টা মেরে বলেছিল, ‘ বুদ্ধু কোথাকার, আকাশে আবার কেউ থাকে নাকি? তুই আকাশে মেঘ দেখেছিস। ওই মেঘগুলোই কখনো কখনো বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। দাদার কথায় একটা জিনিস স্পষ্ট হয়েছিল যে আমার মাথায় কিছুই নেই।

এখন এসব কথা মনে হলে হাসি পায়, আবার আনন্দও হয়। কিন্তু সেই অমলিন হাসি বেশিদিন স্থায়ী হয় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের চাকা এগিয়ে চলে নিত্যগামী রথচক্রের মতো।

বাবা একটা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। একদিন হঠাৎ স্কুল থেকে বুকে অসহ্য ব্যথা নিয়ে ফিরে এসে সেই যে দেহ রাখলেন আর উঠলেন না। বিশ্বজিতের বয়স যখন বড়ো জোর আট বছর। ক্লাস টু, আর দাদা ক্লাস ফোর। দাদা বিশ্বজিতকে জড়িয়ে ধরে থাকে। তারা বুঝতে পারে তাদের কী সর্বনাশ হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু নিদান দেওয়ার পর পাড়ার দাদারা, কাকুরা বাবাকে নিয়ে চলে গেল। ছোট্ট বিশ্বজিৎ দাদাকে জড়িয়ে ধরে বলে , দাদা, বাবাকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল? দাদা চুপ করে থাকে। ভাইয়ের হাতটা চেপে ধরে বলে ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকিস ঠিক দেখ তে পাবি। বিশ্বজিতের মনে পড়ে তার অনুসন্ধিৎসার কথা সে বুঝতে পারে, সব ভালোবাসার মানুষরাই কোনো না কোনোদিন আকাশে ঘর বাঁধে। ওপর থেকে তারা তাদের প্রিয় লোকদের চেয়ে দেখেন।

রাতের বেলায় ছাদে গিয়ে দাঁড়ায় বিশ্বজিৎ। আকাশের দিকে

তাকিয়ে থাকে। ওই কোণের দিকে উজ্জ্বল তারাটা জিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যে তারা মাকে কিন্তু ভেঙে পড়তে দেখেনি। সব মিলিয়ে আবার পর মা তাদের দুই ভাইকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকে। দু চোখে জলের ধারা। কিছুক্ষণ পর চোখের জল শাড়ির আচলে মুছে বলে, 'তোমাদের বাবা আর ফিরবেন না। তবে তিনি তোমাদের সর্বদা আশীর্বাদ করে যাবেন। তোমাদের মানুষের মতো মানুষ হতে হবে।' দাদা আর ভাই দুজনে আরও জোরে মাকে জড়িয়ে ধরে।

ওই অল্প বয়সেই এই ধাক্কা ওদের দুজনকে যেন অনেকটা বড় করে দিয়েছে। দুজন সব সময় যেন মাকে প্রহরা দিয়ে রাখত। যেহেতু বাবা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, তিনি মারা যাবার পর স্কুলের গভর্নিং বডি আলোচনা করে তাদের মাকে স্কুলেই একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে তিনি যোগ দেন। হোকন না চতুর্থ শ্রেণি , একটা নিয়মিত অর্থের জোগান তো রইল। ছেলে দুটো এখনও অনেকটা ছোট। ওদেরকে মানুষ করতে হবে। স্কুলের শিক্ষকরা কিন্তু ওঁকে বেশ সম্ভ্রমের চোখেই চোখেই দেখতেন। বেশিরভাগ সময় তার কাজগুলো সহকর্মীরাই করে দিত।

শহিদুল এসে বলে, ' বৌদি আপনি এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন ? এসব কাজ তো আপনার করার কথাই নয়। আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় সন্দীপ স্যারের স্ত্রী। এটা তো আমরা ভুলতে পারি না। নমিতা চোখ টলটল করে ওঠে । কথা সরে না।

এভাবেই দিন কেটে যায়। সময় তো থেমে থাকে না। পূর্ব দিগন্তে সূর্যের উদয়ের সময় কাশ্মীর তথা আস্তে আস্তে দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারেরও পরিবর্তন হতে থাকে। যতক্ষণ না রাতের অন্ধকার তার কোমল হাতে স্পর্শে সূর্যের প্রবল উত্তাপকে শান্ত করে। সেইমতো বিশ্বজিৎ ও তার দাদা অভিজিৎও স্কুলের শেষ গণ্ডিতে এসে দাঁড়ায় অভিজিৎ উচ্চ মাধ্যমিক আর বিশ্বজিৎ মাধ্যমিক। মোটামুটি ভালো ছাত্র হিসেবে তাদের স্কুলের নাম আছে । যথারীতি ফল প্রকাশের পথ দেখা যায় দুজনেই খুব ভালো রেজাল্ট করে পাস করেছে । স্কুলের মাস্টারমশাইরা খুব খুশি । এই শহরতলির স্কুলে এত ভালো রেজাল্ট অনেকদিন হয়নি। হেডমাস্টার মশাই নমিতাকে ডেকে বলেন, ' ম্যাডাম আপনাকে তো আর বেশিদিন চিন্তা করতে হবে না। আপনার দুটো ছেলেই তো জুয়েল।' নমিতা কোন উত্তর দেয় না। শুধু আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নেয়।

পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেও বিশ্বজিতের মন ভালো নেই। কারণ এবার দাদাকে স্কুল ছাড়তে হবে। দাদার হাতটা চেপে ধরে বলে, ' দাদা এবার আমি কার সাথে স্কুলে যাব ? ' অভিজিৎ ভাইয়ের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, ' দূর বোকা, তুই কি এখন এইটুকু আছিস যে আমার সাথে স্কুলে যেতে হবে ? আমাকে তো অনেকটা দূরে কলেজে ভর্তি হতে হবে। আর মাত্র দুটো তো বছর আমরা আবার একসাথে কলেজে যাব।' বিশ্বজিৎ কিছুটা মনে শান্তি পায়। দাদাকে জড়িয়ে ধরে বলে, ' দাদা আজ মাকে কিছু একটা স্পেশাল জিনিস বানাতে বলব। মায়ের হাতের রান্না, আহা...'

' ঠিক আছে, চল বাড়ি যাই ...'

স্কুলের মাস্টারমশাই খুশি হয়ে দু ভাইকে অনেকগুলো বই উপহার দিয়েছেন, সেগুলো হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢোকে তারা, ' মা, আজ কিন্তু আমাদের জন্য ...'

আর কিছু বলার সুযোগ পায় না। দেখে পাড়ার কয়েকজন কাকিমা মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করছেন। এর মধ্যেই একজন কাকিমা বলে ওঠেন, ' ওই তো এসে গেছে তোমার হিরে মানিক। ' ঘরে ঢুকে ওরা দুজনেই বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। দিপালী কাকিমা বলেন, ' তোমার বড় ছেলে অভিজিৎ ছিল বলেই তো আমার ছোটু পাশ করল। ওর তো পড়াশোনায় একদম মনই ছিল না। তোমার ছেলে ওকে সাহায্য না করলে কিছুতেই পাশ করত না। তোমাদের ঋণ যে কীভাবে আমরা শোধ করব জানি না!'

--- 'এতে আবার ঋণের কি হল ? বন্ধু বন্ধুকে সাহায্য করতেই পারে। দিদি তোমরা বস তোমাদের জন্য চা করে আনি। '

হ্যাঁ হ্যাঁ, চা তো খাবই। আজকের মতো একটা আনন্দের দিনে চা না খেয়ে যাবই না। এর মধ্যে দু ভাই তাদের স্কুলের ড্রেস পাল্টে ঘরে ঢোকে। খিদে পেয়েছে কিন্তু মাকে বলতে পারছে না। এরই মধ্যে হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকে পড়ে বন্ধুর দল শুভ বিলাস সুদীপরা।

---কাকিমা আমাদের খাওয়াতে হবে। মা একটা ক্রেটে করে চায়ের কাপ আর বিস্কুট নিয়ে টেবিলের ওপর রাখেন। আর বন্ধুদের বলেন তোরা বিষু-অভির সঙ্গে ভেতরে যা, কিছু খাবার রাখা আছে ভাগ করে খেয়ে নে।

ওরা আর দেরি করে না। বিশু অভিকে প্রায় পাঁজা কোলা করে ঘরে ভেতর ঢুকে যায়।

সন্ধ্যে পার হয়ে রাত আসে। মায়ের পাশে বসে দুই ছেলে। প্রথমে মুখ খোলে বিশ্বজিৎ, মা আমরা যে পাশ করলাম তা নিশ্চয়ই বাবা উপর থেকে দেখছেন? মার চোখে জল চলে আসে, তোদের বাবা তো সব সময় তোদের সঙ্গেই আছেন। তার আশীর্বাদ না থাকলে তোরা এত ভালো রেজাল্ট করতে পারতিস ? আজ তোদের জন্য পায়েস আর লুচি করে রেখেছিলাম তা তো তোরা খেতেই পেলি না। তোদের বন্ধুরাই নিশ্চয় খেয়ে নিয়েছে !

তাতে কি হয়েছে মা ? আমাদের কিন্তু খুব ভালো লেগেছে। ওরা

এমন ভাবে আনন্দ করে খাচ্ছিল যেন আমরা ওদের কত আপন জন। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মা বলেন, তোরা এমনই থাকিস বাবা , কাউকে কোনোদিন দুঃখ দিস না।

রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো ফোটে। জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো চোখে এসে পড়ে। ওদের ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মুছতে মুছতে বিছানা থেকে উঠে দেখে মা তৈরি কোথাও যাবার জন্য। দেখেই মনে হচ্ছে চানটান সারা।

এত সকালে কোথায় যাচ্ছ মা ?

মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছি বাবা। তোরা আরেকটু শুয়ে থাক। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি। তারপর তোদের জন্য খাবার বানাব। এই বলে মা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বিশ্বজিৎ আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। চোখ জড়িয়ে আসে । দেখে দাদা শহরে কলেজে ভর্তি হয়েছে। কত বড় কলেজ। কত ছাত্র-ছাত্রী। বিরাট লোহার গেটের ভেতর দিয়ে দাদা এগিয়ে যাচ্ছে। 'দাদা দাদা,আমি এখানে' বলে চেচিয়ে ওঠে বিশ্বজিৎ। দাদার ঘুম ভেঙে যায়। ভাইকে ধাক্কা দিয়ে বলে, কিরে স্বপ্ন দেখছিস নাকি ? হ্যাঁ বা না কিছুই তার মুখ দিয়ে বেরোয় না। শুধু দাদার হাতটা চেপে ধরে।

ওদের স্কুলের অংক স্যার অবনী বাবু , যাকে ওরা অভিভাবকের মতো শ্রদ্ধা করে, তার সঙ্গেই অভিজিৎ শহরের কলেজে ভর্তি হবার জন্য রওনা দেয়। অবনী বাবুও ওই কলেজের ছাত্র ছিলেন। অভিজিৎকে নিয়ে অবনী বাবু কলেজে প্রিন্সিপাল স্যারের ঘরের ঢোকে। অগ্নি বাবুকে দেখেই প্রিন্সিপাল স্যার বলে ওঠেন, 'আরে অবনী যে, কি ব্যাপার ? তুমি তো আর যোগাযোগই করো না। শত হলেও আমরা তো বন্ধু রে বাবা...' বলে হাসতে থাকেন।

' তবে তুমি কত বড় কলেজে প্রধান আর আমি গ্রামের স্কুলের সামান্য শিক্ষক। '

--- আচ্ছা অবনী, তাতে কী হয়েছে? এটাতো লুকানো যাবে না যে তুমি স্কুলে আমার থেকে ভালো ছেলে ছিলে।

অবনী বাবু লজ্জা পেয়ে বলেন, 'ওসব বাদ দাও। তুমি হলে আমাদের গর্ব। কত পড়াশোনা করে কত ডিগ্রি হাসিল করেছ। আমি কিন্তু আমার গর্বের দিকটাই বলতে চাইছি।'

--- যাক, তুমি এতদিন পরে, কী ব্যাপার ?

অভিজিৎ এতক্ষণ ঘরে চেয়ারের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে স্যারদের কথা শুনছিল। 'আর ওই ছেলেটিই বা কে ?'

--- ও আমাদের স্কুলের ছাত্র। এবার উচ্চমাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। ওর ইচ্ছে এই কলেজে ভর্তি হবে।

--- দেখো তুমি যে ছেলেকে সঙ্গে করে এনেছ, আমি নিশ্চিত যে, সেই ছেলে খুব ভালো হবে। ওআর ভর্তির ব্যাপারে তোমাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না।

তারপর অভিজিতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার নাম কি?'

--- আমি অভিজিৎ সেন। বলেই প্রিন্সিপাল স্যার এবং অবনী বাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সে ।

--- আরে থাক থাক, তোমার মার্কশিটটা দেখি ---

মার্কশিটটা হাতের ব্যাগ থেকে বার করে প্রিন্সিপাল স্যারের হাতে দেয় অভিজিৎ। স্যার মার্কশিটের ওপর চোখ বুলিয়ে বলে ওঠেন,' বা বেশ। ভর্তি তো হবে কিন্তু আরো ভালো রেজাল্ট করতে হবে যে ! আমার তো মনে হয় তুমি আমাদের কলেজের নাম উজ্জ্বল করতে পারবে ।

বেল বাজিয়ে স্যার একজনকে ডাকলেন, 'কৃষ্ণপদ , ওকে অফিসে নিরাপদ বাবুর কাছে নিয়ে যাও। আর বোলো, ওকে যেন ভর্তি করে নেন।' অভিজিৎ কৃষ্ণপদর সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

' আরেকটা কথা তোমায় বলার আছে, ওরা দুই ভাই আমাদের স্কুলেই পড়তো এবং ছোট ভাই এখনো পড়ে। ওদের বাবা আমাদের স্কুলে ইংরেজি টিচার ছিলেন। উনি হঠাৎ মারা যাবার পর ওদের পরিবারের ওদের দেখার মতো কেউ ছিলেন না। আমাদের স্কুল ওর মাকে একটা সামান্য চাকরিতে বহাল করেছিল। ওই সামান্য মাইনেতেই ওদের সংসার চলে। '

' আর বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। তোমায় চিন্তা করতে হবে না, ওর ফ্রি স্টুডেন্টশিপের জন্য আমি নিজেই রেকমেন্ড করব। নিশ্চয় হয়ে যাবে। আরেকটা কথা , তুমি কিন্তু এখন যাবে না , আমার সঙ্গে লাঞ্চ করে যাবে। আমি তো বাইরের খাবার খাই না বাড়ি থেকে বউ খাবার দিয়ে দেয় , তাই খাই। আজ নয় দু'বন্ধু মিলে ভাগ করে খাব। তুমি তো আর বিয়ে করলে না, তোমার আর বউয়ের হাতে রান্নার কি বোঝাব ! ' হাসতে থাকেন দুজনেই।

আবার সময়ের রথ এগিয়ে চলে নির্দিষ্ট পথে। কালে রথচক্রে কত কী ঘটে যায় চারপাশে, কেউ তার খোঁজ রাখে না।

অভিজিৎ ইতি মধ্যে কলেজের পড়াশোনা শেষ করেছে। প্রিন্সিপাল স্যারের কথা রেখে অভিজিৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করেছে। যেমন পড়াশোনায় তুখোর তেমনি খেলাধূলায়। কলেজের এনসিসি সেরা ক্যাডেট। অনেকগুলো পদক তার ঝুলিতে। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছে হিরো। মেয়েরা তো অভি বলতে অজ্ঞান।

প্রিন্সিপাল স্যার ঘরে ডেকে বলেন, ' অভিজিৎ তোমার তো বাবা এই কলেজের পাট শেষ হল। এবার কী করবে ভাবছ ? হায়ার স্টাডিজে যাবে ? '

' না স্যার, আমার আর হায়ার স্টাডিতে যাওয়া ঠিক হবে না। আমাকে এবার একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। মাকে দেখতে

হবে, ভাইয়ের পড়াশোনা চালাতে হবে। মায়ের শরীরটাও ভালো না। আর বেশিদিন চাকরি করতে দেব না।'

--- সত্যি , তোমার মতো ছেলে হয় না।কি তোমার মাকে আমার প্রণাম জানিও। তবে তোমার যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয় আমাকে জানাতে দ্বিধা কোরো না।

স্যারকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসে অভিজিৎ।

---তোকে আমাদের কথা চিন্তা করতে হবে না, তুই আরো পড়াশোনা করবি। মা গম্ভীর গলায় বলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে অভিজিৎ, মা, তুমি তোমার শরীর খারাপ নিয়ে যেভাবে কাজ করে আমাদের মানুষ করছো তার সামনে আমাদের কোন অবদান নেই। তুমি একদম মত করবে না , আমি ঠিক একটা চাকরি পেয়ে যাব।

মা আর কথা বাড়ান না।

----তোর যা ইচ্ছে তাই করবে যা।

---- মা তুমি রাগ করোনা, ভাই তো আছে , ওকে যত ইচ্ছে পড়াও।

বিশ্বজিৎ দাদার দিকে কটমট করে তাকায়।

--- অভি তুই বাবা আজ একটু ব্যাংকে যাবি , ম্যানেজার বাবু ফোন করে ডেকেছিলেন, কী যেন দরকার আছে বলছিলেন।

--- এখন আমি বেরোচ্ছি। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। এক সময় ব্যাংকে গিয়ে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা করে নেব ।

অভিজিৎ বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

---- সাবধানে যাস বাবা। হঠাৎ এই কথাটা কেন যে মুখে এল নমিতার। কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না ও , তবুও সকাল থেকে মনে একটা কূ ডাকার মতো আভাস পাচ্ছিল। মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে সে। ব্যাংক তো সেই শহরে, অনেকটা দূর।

অভিজিৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠিক করে আগে ব্যাংকের কাজটা সেরে তারপর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবে। এই চিন্তা করে শহরের পথে পা বাড়ায় সে।

ব্যাংকের সামনে এসে তার কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। গেটের সামনে দুটো হেলমেট পরা লোক বাইকে চেপে বসে আছে। কিছু গ্রাহক বাইরে দাঁড়িয়ে। ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করে সে জানল ভেতরে নাকি কী কাজ হচ্ছে, তাই কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু অদ্ভুতভাবে একটা চেনা বন্দুক হাতে সিকিউরিটি কাকুকে তো গেটের সামনে দেখা যাচ্ছে না। কী মনে করে অভিজিৎ গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে যায়। বাইরের দুই হেলমেটধারী তৎপর হয়ে ওঠে। 'অন্দর মত যাও।' ওদের মধ্যে একজন বলে ওঠে অভিজিৎ বুঝতে পারে কোনো গন্ডগোল আছে। জোর করে ভিতরে ঢুকে পড়ে সে। ঢুকেই তাজ্জব বনে যায়। জনা চারেক লোক, মুখ সম্পূর্ণ ঢাকা, একজন পিস্তল হাতে ক্যাশের ভিতর। কিছু গ্রাহককে কোণের দিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ম্যানেজারবাবু আর ক্যাশিয়ারকাকুকে বন্দুকের নিশানায় রাখা হয়েছে। বেঁচে থাকা সিকিউরিটি কাকু এক কোণে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছেন। অভি বুঝতে পারে ব্যাংকে ডাকাত পড়েছে।

তাকেও ওই ডাকাত দলের একজন অন্য গ্রাহকদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াতে বলে। অসীম সাহসী অভিজিৎ, সেরা ক্যাডেট অভিজিৎ এটা সহ্য করতে পারে না। আচমকা সে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক পিস্তলধারীর উপর। সে বোধহয় তৈরি ছিল না। অভিজিতের আচমকা আক্রমণে তার হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ছিটকে পড়ে। দ্রুত পা দিয়ে পিস্তলটা সরিয়ে দেয় অভিজিৎ। ডাকাত দল মরিয়া হয়ে ওঠে। ওদের চিন্তাতেও ছিল না যে এরকম কিছু ঘটতে পারে। তাড়াতাড়ি পালাবার প্রস্তুতি নেয়। তার মধ্যে ওদেরই একজন গুলি চালায় অভিকে লক্ষ্য করে। অভি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ম্যানেজারবাবু কোনোক্রমে থানায় একটা খবর পাঠানোয় পুলিশের গাড়ি ব্যাংকে পৌঁছে গেছে। ওদের দলের দুজন ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। বাকিরা পালিয়ে যায় । জানা গেল কোনো টাকা পয়সা নিয়ে যেতে পারেনি তারা। সবাই ছুটে আসে অভিজিতের কাছে। পুলিশ অতি দ্রুততার সঙ্গে তাকে হাসপাতালে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে তার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফিরে আসার পর হাসপাতালে বেড়ে নিজেকে দেখে অবাক হয়ে ও পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নার্সকে জিজ্ঞেস করে, ‘ আমার কী হয়েছে ?’ মধ্যবয়স্ক নার্স তার মাথায় হাত রেখে বলেন, ‘ তুমি তো আজ বিরাট কাজ করেছ। তোমায় দেখতে পুলিশ কমিশনার আসছেন।

---- পুলিশ, পুলিশ কেন?

--- সে তুমি উনি এলেই বুঝতে পারবে।

আর কথা বাড়ায় না অভিজিৎ। এখন কটা বাজে কে জানে। দেরি হচ্ছে বলে মা হয়তো চিন্তা করছেন। ভাই তো কলেজে গেছে। বলতে না বলতেই সপার্ষদ রাশভারী পুলিশ অফিসার এসে উপস্থিত ।

--- হ্যালো ইয়ং ম্যান, তুমি তো দারুন কাজ করেছ। একটা নটোরিয়াস ডাকাত দলকে ধরতে সাহায্য করেছ। তবে একটা কথা বলি, তুমি কিন্তু অতিরিক্ত সাহস দেখিয়ে ফেলেছ। আর একটু হলে তোমার অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারত। নিশানা ঠিক ছিল না আর পালাবার সময় তোমাকে গুলি করেছিল তাই বা হাতের উপর দিয়ে গুলি ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। তোমার আঘাত খুব মিনিমাম। ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তোমাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হবে। আরেকটা কথা, তুমি কিন্তু অবশ্যই আগামীকাল আমার সঙ্গে অফিসে গিয়ে দেখা কোরো। তোমার মত সাহসী ছেলেকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবার সঙ্গে পরিচয় না করিয়ে দিলে হয় ! অভির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে তিনি বেরিয়ে যাবার আগে তার অধস্তনদের বলে যান ওর কাছ থেকে স্টেটমেন্ট নেওয়ার পর ওকে যেন সাবধানে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। তিনি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন চ্যানেল এবং সংবাদপত্রের লোকেরা ঘরে এসে ঢোকেন । তাঁরা সমস্ত ঘটনা জানতে চান। তার সাহসের তারিফ করেন। তাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করে অভিজিৎ, ‘ ‘আপনারা দয়া করে আমার মাকে কিছু জানাবেন না। উনি খুব চিন্তা করবেন।’

---- আরে উনি তো আপনার মা , রত্নগর্ভা , উনি ছেলেরএই ঘটনা শুনলে খুশি হবেন।

পরের দিন বিভিন্ন কাগজে অভিজিতের সাহসিকতার কথা বিস্তারিত ভাবে লেখা হয়। এইরকম একটা দুঃসাহসিক কাজ করতে পারার মতো মানসিকতার যুবককে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

যথা সময়ে সংবর্ধনা সভায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আর বড়কর্তারাও হাজির। তারা অভিজিৎকে তাদের সংস্থায় চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু পুলিশ কমিশনারের কথা তাকে বেশি আকৃষ্ট করে।

--- পুলিশে যোগ দিলে তুমি জনগণের সেবা করতে পারবে অনেক বেশি, সমাজের খারাপ কাজগুলোর বিরুদ্ধে তুমি পদক্ষেপ নিতে পারবে। তবে পুলিশে চাকরি করতে গেলে তোমাকে তো একটা পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে আমি সর্বতোভাবে সাহায্য করব। অভিজিৎ বড়দের প্রণাম করে সভা থেকে বেরিয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে এসে অভিজিৎ মাকে সমস্ত কথা বলল। মা একটু দ্বিধাভরে বলেন, তুই পুলিশের চাকরিতে রাজি হলি ? পুলিশ সম্বন্ধে তো কত খারাপ কথায় শোনা যায়! কত বিপদের কথাও শুনি।

মাকে থামিয়ে অভিজিৎ বলে, সমস্ত জায়গাতেই ভালো-মন্দ আছে তো মা। আমি তোমার ছেলে, আমার ওপর একটু বিশ্বাস নিশ্চয়ই তোমার আছে, তুমি নিশ্চয়ই মনে কর তোমার ছেলে কোনো অন্যায় করতে পারে না।

মা আর কথা বাড়ালেন না। রাত নামল। রাতের অন্ধকারই শেষ কথা নয়। রাতের শেষে সূর্য ওঠে , ভোর হয়। ভোরের সূর্যের আলো রাতে সমস্ত কালিমাকে মুছে দিয়ে নতুন পথ নির্দেশ করে। অভিজিৎ পুলিশের চাকরিতে যোগ দেয়। সাব-ইন্সপেক্টর-এর চাকরি। প্রথম দিন কমিশনার সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে আশীর্বাদ নেয় সে। কমিশনারও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এইভাবে দিন চলতে থাকে। ছোট ভাই বিশ্বজিৎ স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে কলেজে ভর্তি হয়। অভিজিৎ মায়ের কাছে আবদার করে , মা , তুমি এবার চাকরিটা ছেড়ে দাও। তোমার শরীরটাও তো খারাপ।

--- আর কটা মাত্র বছর, ঠিক চালিয়ে নেব রে। আর এখনো তো আমার অনেক কাজ বাকি । ও তুই বুঝবি না। আমি কি চিরকাল একলা সংসারের দাড় বাইব !

অভিজিৎ মায়ের মনের কথা বুঝতে পারে । আর কথা বাড়ায় না।

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ।

বিশ্বজিৎ কলেজে সবার খুব প্রিয়। একে ভালো ছাত্র, তার উপর ভালো গান গায়, অভিনয় করে। উপরন্তু তার দাদা পুলিশ অফিসার। একবার দাদার কথা উঠলে শেষ হতেই চায় না। ক্লাসের বন্ধু শ্রমণা একদিন বলে, বিশ্বজিৎ , তোমার দাদা তো কোনোদিন আমাদের কলেজে আসেন না। শুনেছি উনিও নাকি এই কলেজেই পড়তেন।

--- হ্যাঁ , দাদা তো এই কলেজেই পড়ত। ও , দাদার সঙ্গে তোমাদের আলাপই নেই, তাই না! একজন তোমাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে যাব। সেখানে আমার দাদা ছাড়াও আমার মায়ের সঙ্গেও কথা হবে ।

শ্রমণা লজ্জা পায়, ধ্যাৎ, আমি কি সেই কথা বলেছি, আসলে তোমার দাদা সম্পর্কে অনেক কথা একটু শুনেছি তাই...

আর কথা বাড়ায় না বিশ্বজিৎ। কলেজ শেষ করে স্কুল সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে একটা স্কুলের চাকরি পায় সেও। ঝাড়গ্রাম জেলার একটি পিছিয়ে পড়া গ্রামের সরকারি স্কুল। মা কি খবর শুনে আনন্দের বদলে আশঙ্কিত হয়ে ওঠেন, তুই ওখানে একলা একলা কিভাবে থাকবি ?

--- মা এটা একটা স্কুলের শিক্ষকতা চাকরি। আমাকে তো যেতেই হবে। আর তুমি চিন্তা করো না । আমি ঠিক মানিয়ে নেব। আগে তো স্কুলে যাই , তারপর দেখা যাবে। বন্ধুরা তার বাড়িতে আসে তাদের প্রিয় বিশ্বজিতকে অভিনন্দন জানাতে। এরই মধ্যে বিশ্বজিৎ শ্রমনাকে একপাশে ডেকে বলে, শ্রমণা, আমি তো অনেক দূরে চলে যাচ্ছি, তুমি মাঝে মাঝে মাকে এসে দেখে যেও।

অবশেষে শুভক্ষণে নৌকা দিল ছাড়ি। বিশ্বজিৎ একটা শুটকেস হাতে নিয়ে ট্রেনে চেপে বসল। স্টেশন থেকে ভ্যান রিক্সায় প্রায় আট ঘন্টা। স্কুলের সামনে এসে দাঁড়ায়। এটাই স্কুল। স্কুলবাড়ির অবস্থা খুব ভালো নয়। দীর্ঘদিন কোনোরকম মেরামত বা রং করা হয়নি। তখনও স্কুল শুরু হয়নি, ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে আসতে শুরু করেছে। বিশ্বজিৎ ধীর পায়ে স্কুলের মধ্যে ঢোকে। একজন মধ্যবয়স্ক লোক তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন ?

--- হ্যাঁ , আমি হেড মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

--- ও, কিন্তু হেডমাস্টারবাবু তো এখনো আসেন নাই। আপনি ওই ঘরে বসেন, উনি এক্ষুনি এসে যাবেন।

বিশ্বজিৎ হেডস্যারের ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। মিনিট পনেরো বাদে সাদা ধুতি আর সাদা ফুল হাতা জামা পরা এক ভদ্রলোক ওই ঘরে প্রবেশ করেন। বিরক্ত মুখে বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, দশটা বেজে গেল , একজন টিচারও এসে পৌঁছায়নি। এইভাবে স্কুল চলে ? টিচাররাই ফাঁকি মারলে আর ছাত্র-ছাত্রীদের কী দোষ ?

হঠাৎ বিশ্বজিতের উপর তাঁর নজর পড়ে, আপনি ?

--- আমি বিশ্বজিৎ সেন , আমায় এই স্কুলের শিক্ষক হিসেবে জয়েন করতে বলা হয়েছে। তাই এসেছি।

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন হেডমাস্টারমশাই , 'আপনি তাহলে জয়েন করলেন। আসলে কী জানেন , এই স্কুলে আপনার আগেও দুবার টিচার পাঠাবার কথা হয়েছিল। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক এই গণ্ডগ্রামে কেউ আসতে চায়নি। আপনি তো ইংরেজির শিক্ষকখ'

--- আজ্ঞে হ্যাঁ , বলে তার ব্যাগ থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা বার করে বিশ্বজিৎ হেড স্যারের হাতে দেয়।

হেড স্যার হাঁক পাড়েন, নন্দদুলাল একবার এদিকে আয়। পিয়ন গোছের একটি ছেলে ঘরের ভেতরে এসে ঢোকে, ' শোন, ইনি আমাদের স্কুলের নতুন টিচার। ওনাকে অফিসে অফিস ঘরে নিয়ে যা। রমেন বাবুকে বলবি উনার জয়েনিং লেটারটা দিয়ে দিতে। বিশ্বজিৎ বাবু, আপনি ওর সাথে যান। তারপরে টিচার্স রুমে এসে বসুন। আমিও আসছি।

এদিকে কিছু ছাত্র-ছাত্রী উঁকি মারছে । এ আবার কে এল ! টিচার্স রুমে এসে পৌঁছয় বিশ্বজিৎ। একটা গোল টেবিলকে ঘিরে গোটা ছয় চেয়ার। অধিকাংশই বিরাট পুরনো। কোন আদ্যিকালের। ইতিমধ্যে অন্য টিচাররাও রুমে এসে বসেছেন। বিশ্বজিৎকে দেখে তারা খুব খুশি বলে মনে হল না। হেডস্যারের সঙ্গে অল্প সময়ের আলাপে জানতে পেরেছিল অধিকাংশ শিক্ষকই স্থানীয়। বহিরাগত একজন লোককে তারা ভালো চোখে দেখবে না, সেটাই স্বাভাবিক। হেডমাস্টার মশাই আর সব মাস্টারমশাইদের সঙ্গে বিশ্বজিতের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে কোনো তাপ উত্তাপ দেখা গেল না।

বিশ্বজিৎ স্কুলের কেরানি রমেনবাবুর সাহায্যে একটা ছোটো ঘরের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী গরিব বা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে। কিছুদিন শিক্ষকতার পর সে বুঝতে পারল তাদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি আকর্ষণ থাকলেও নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হবার ক্ষেত্রে গাফিলতি আছে।

তার প্রথম কাজ হল পড়ানোর পাশাপাশি প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর বাড়ির অবস্থা সম্পর্কে জানা। পরপর দু-তিন দিন কোনো ছাত্র বা ছাত্রী অনুপস্থিত হলে সোজা তার বাড়িতে গিয়ে তার অনুপস্থিতির কারণ জেনে তাদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা। এসব জিনিস গ্রামের মানুষ কোনোদিন দেখেনি। কোনো সময় কোনো ছাত্রের বাবা তাকে নমস্কার জানিয়ে বলেন, 'স্যার , আপনার মতো কেউ তো স্কুলে যাবার কথা বলতে বাড়িতে আসে নাই। আমার ছেলে রহমত তো স্কুলে যাওয়ার নাম শুনলেই পালাইত,

এখন স্কুলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়। ‘ বিশ্বজিতের খুব ভালো লাগে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে ক্লাস সেভেনের সুনন্দা কয়েকদিন ক্লাসে আসছে না। অন্য ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করায় তারা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলে, ‘ স্যার সুনন্দার তো বিয়া, তাই ও আর স্কুলে আসবে না।’

বিশ্বজিতের মাথায় চট করে একটা প্রশ্ন উঠে আসে, ক্লাস সেভেনের মেয়ের বিয়ে ? এ তো বেআইনি কাজ।

পরের দিন সোজা সেই মেয়েটির বাড়ি। মেয়েটির বাবা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে যে, তারা গরিব মানুষ। একটা পাত্র পাওয়া গিয়েছে । একে হাতছাড়া করা যাবে না।

---কিন্তু এ তো সরকারি নিয়ম বিরুদ্ধ। নাবালিকার বিয়ে দেওয়া যায় না।

অনেক অনুরোধ করার পরেও মেয়েটির বাবার সেই এক গোঁ। বিয়ে হবেই। গ্রামের সালিশি সভার অনুমতি অব্দি নেওয়া হয়ে গেছে। শেষকালে বিশ্বজিৎকে গ্রামের মানুষের বিরুদ্ধে না যাবার জন্য সতর্কও করে দেওয়া হল।

কিন্তু বিশ্বজিৎ দমবার পাত্র নয়। সোজা থানায় গিয়ে বড়ো বাবুর সঙ্গে কথা বলল। বড়োবাবু তাকে জানালেন, ‘স্যার আপনি নতুন এয়েছেন। আপনি সব জানেন না। এখেনে এসব হয়েই থাকে।’

--- তাহলে আপনারা কিছু স্টেপ নেবেন না ? গ্রামের মানুষ তো আইন তৈরি করেনি।

কথায় না পেরে উঠে বড়োবাবু থানার মেজো বাবুকে বিশ্বজিতের সঙ্গে ছাত্রীর বাড়িতে যেতে বললেন। থানার মেজোবাবুও বিশ্বজিতের বয়েসী। জিপে উঠতে উঠতে বলে, স্যার, আপনাকে স্যালুট জানাতে ইচ্ছে করছে। আপনার জন্য এই রকম একটা জঘন্য বেআইনি কাজকে বন্ধ করার জন্য আমাকে যেতে হচ্ছে। নইলে ...

পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বজিৎ মেয়েটির বাড়িতে আসে। ইতিমধ্যে মেয়েটির বাবা আগে থেকে বেশ কিছু লোক জড়ো করে রেখেছিল। মেয়েটির বাবাকে ধমক দিয়ে বলে, আপনাদের লজ্জা নেই ! আপনারা একটা বেআইনি কাজ করতে যাচ্ছিলেন ! জানেন কী ১৮ বছরের নিচে কোনো মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না ?

পুলিশ দেখে জড়ো হওয়া লোকগুলি একটু ঘাবড়ে যায়। মেয়েটির ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সুজা এসে দাঁড়িয়েছে বিশ্বজিতের সামনে।

--- স্যার আমি পড়াশোনা করতে চাই। কখনো এইরকম সময় আমি বিয়ে করব না।

মেজ বাবু আর বিশ্বজিৎ মেয়েটির বাবা আর অন্য লোকেদের সঙ্গে বসে এই নাবালিকা বিয়ের খারাপ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা চালায়। নিয়ম না মানলে সামনে কি কি শাস্তি নিদান আছে তাও বুঝিয়ে বলে।

পরের দিন মেয়েটিকে স্কুলের দিকে আসতে দেখে অবাক হয় বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সে বলে , স্যার, আপনি আমার কাছে ভগবান।

--- না না , আমি ভগবান টগবান নই। আমি শুধু চাই আমার ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো করে পড়াশুনা করুক। তারপর নিজের পায়ে দাঁড়াক। বিয়ে-থা তো রইলই।

বিশ্বজিৎকে তাঁর ঘরে ডেকে বলেন, ‘ বিশ্বজিৎ বাবু, আপনি যে দেখছি শিক্ষকতার পাশাপাশি সমাজ সংস্কারেও নেমে পড়েছেন। ‘

--- সমাজ সংস্কার ! সে তো অনেক বড়ো ব্যাপার, আমি মশাই সামান্য শিক্ষক, আমার অত ক্ষমতা আছে ? আমাকে মনে হয়েছে তাই করেছি।

--- কিন্তু এমন করে তো গ্রামের শত্রু বাড়িয়ে ফেলছেন।

--- আমি মনে করি একজন শিক্ষকের কাছে ছাত্র-ছাত্রীরাই শেষ কথা। আমাকে শত্রু মনে করছে ততদিন আমি নিরাপদ।

--- না না, আপনি আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। আমি আপনার সঙ্গে আছি।

বিশ্বজিৎ বেরিয়ে আসে। অদ্ভুতভাবে তার উপস্থিতিতে স্কুলেই যেন প্রাণের জোয়ার এসেছে। তার ক্লাস সব সময় ছাত্র-ছাত্রীতে ভর্তি থাকে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে দেশের কথা, দেশের মনীষীদের কথা, ইতিহাসের গল্প সে প্রাঞ্জলভাবে তাদের সামনে উপস্থিত করে। অন্যান্য শিক্ষকরাও তার পাশাপাশি বিশ্বজিতের কাজ দেখে উৎসাহিত হয়। মাত্র দু বছরের মধ্যেই স্কুলের রেজাল্টের ব্যাপক উন্নতি হয়। মাধ্যমিকে একাধিক ছাত্র-ছাত্রী প্রথম বিভাগে পাশ করে। এটা এই স্কুলে অভাবনীয় ছিল। তাই এটা সম্ভব হওয়ায় হেডস্যারের আনন্দ আর ধরে না।

সমস্ত শিক্ষকদের ডেকে তিনি বলেন, ‘আপনাদের মতো শিক্ষককে পেয়ে আমার খুব গর্ব হচ্ছে। বিশেষত বিশ্বজিৎ বাবুকে ধন্যবাদ দিতে চাই। শহর থেকে এসে এই গ্রামের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অভিভাবকদেরও পড়াশুনা নিয়ে ভাবতে তিনি বাধ্য করেছেন। এই জিনিস ভাবা যায় না। কিন্তু এই আনন্দের দিনেও একটা খারাপ খবর আপনাদের দিতে বাধ্য হচ্ছি।’

সমস্ত শিক্ষকরা উৎসুক হয়ে তাকান, খারাপ খবর , সে আবার কি ! আবার কী হল !

--- দেখুন, বিশ্বজিৎবাবু শহর থেকে এসেছেন। উনি এখানে আসবার পর মনে হয় শহরের কোন স্কুলে বদলি হবার আবেদন করেছিলেন, সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে। ট্রান্সফার অর্ডার আজকে আমার কাছে এসেছে।

পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে। বিশ্বজিৎও এর জন্য তৈরি ছিল না।

বাড়ি থেকে মাও বারবার তাকে ফিরে আসার জন্য বলছেন। তার ধারণা তার ছোটো ছেলে খুব কষ্টে আছে। সে অল্প দিনেই স্কুলের প্রতিটি অংশে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরে এসে যা সামান্য জিনিস ছিল তা ব্যাগে ভরে পরদিন আবার স্কুলে আসে সে। অবাক কাণ্ড, সারা স্কুলের শিক্ষকরা হাজির। স্কুলে যেতেই সবাই তাকে ঘিরে ধরেন। ছোটো ছোটো ছাত্র-ছাত্রীরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। তাদের এক কথা --- স্যারকে ছাড়া চলবে না। হেডস্যার তাদের বুঝিয়ে বলেন, এটা সরকারি নির্দেশ, একে অমান্য করা যায় না। তবুও তারা নাছোড়বান্দা। স্যারকে তারা ছাড়বে না। তাদের সঙ্গে বিশ্বজিতও আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যদি বিশ্বজিৎ রাজি থাকে তাহলে ছাত্র-শিক্ষকরা মিলিতভাবে সরকারের কাছে আবেদন জানাবে এই বদলি বাতিল করার জন্য। বিশ্বজিতের দুচোখ জলে ভরে যায়। ওখানে দাঁড়িয়েই মাকে ফোন করে, 'মা , তোমার কথা রাখতে পারলাম না। এত ভালোবাসা, এত বাচ্চার চোখের জলকে তুচ্ছ করে আমি চলে যেতে পারছি না। আমি শিগগির তোমার সঙ্গে দেখা করে সব জানাচ্ছি। আরেকটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি, ওই যে মেয়েটির কথা তোমাকে বলেছিলাম, সুনন্দা, এবার মাধ্যমিক পাশ করেছে। এর থেকে আনন্দ আর কী হতে পারে !

মা বুঝতে পারেন ছেলে একদম তার বাবার মতো হয়েছে। ছেলেকে সামনে না পাওয়ার দুঃখ আবার স্বামীর স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। আনন্দ আর দুঃখ দুই মিলেমিশে একাকার হয়ে মোবাইলটা হাতে নিয়ে তিনি বসে থাকেন।

বছর পেরিয়ে যায়। ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো শুকনো গাছের পাতার মতো শুষ্ক , পাংশুবর্ণ ধারণ করে। আবার নতুন ক্যালেন্ডার নতুন দিন নতুন সূর্য নতুন আলোকচ্ছটা নিয়ে পৃথিবীকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। বিশ্বজিতের আর সংসার করা হয় না। কেউ কিছু বললেই তার এক উত্তর, আমি তো সংসার নিয়েই আছি। ইতিমধ্যে দেয়ালে বাবার ছবির পাশে মায়ের ছবিও জায়গা পেয়েছে। পুলিশ যে এত জনপ্রিয় হতে পারে অভিজিৎ সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে তার কাজের মাধ্যমে।

তাহলে দুভাই বাবা-মার ছবির সামনে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সুমনা আর তাদের ছোট্ট ছেলে কিংশুক। দুভাইয়ের চোখ জলে ভেসে যায়।

---বাবা , তুমি আর মা আমাদের কাছে ছবি নও। তোমরাই আছো আমাদের প্রেরণা। তোমাদের আশীর্বাদ না পেলে আমরা হয়তো এত মানুষের ভালোবাসা পেতাম না। তোমরাই শিখিয়েছ যে কোনো পেশাতেই যদি সৎ থাকা যায় তবে বিনিময়ে ভালোবাসা পাওয়া অনিবার্য। দু ভাই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। সাক্ষী দেয়ালে থাকা বাবা-মা আর তাদের বৌমা শ্রমণা আর নাতি কিংশুক।

কবি

কস্তুরী সেন

শিরোধার্য হবে দোষ
শিরোধার্য হবে এই পথে পথে মুগ্ধ নির্বাসন
দুয়েক পলকমাত্র, পরে দ্বার বন্ধ হবে
ঘটেছে যা ভিক্ষাভুল শিরোধার্য হবে তার পূর্বাপর দায়
'ওকে সহ্য করেছিলে?' শিউরোবেন
নাগরীটি একান্তে করুণ
শিরোধার্য হবে সেই ব্যাকুলতা আবার নবীন
ফের উঁকি মারবে ছলে
বিতাড়ন মানবে না ভাঙা পথ রাঙা করবে
হাত পাতবে সচন্দন ফের লজ্জাহারা

লোকে নাম দেবে কবি,
দুয়ো দিয়ে ফিরবে নামে পাড়ায় পাড়ায়

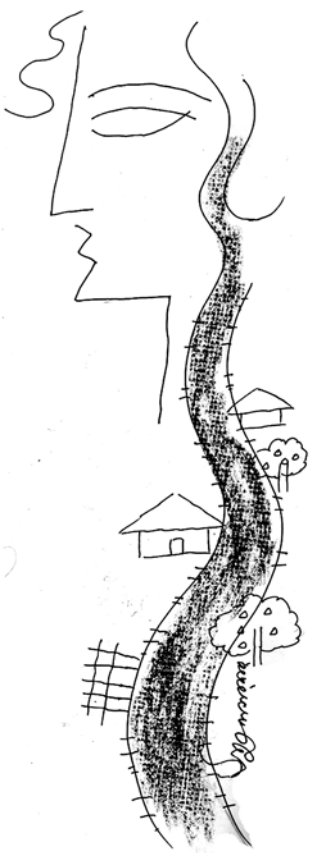

অদেখা

পারমিতা চট্টোপাধ্যায়

দেখা করতে মনে উশখুস, তোমার পাহাড় থেকে হিসেব করে দেখা গেলো আমার পাহাড়টার ঘন্টা পাঁচেক রাস্তা
এবার প্রশ্ন হলো কে যাবে কার পাহাড়ে, অগত্যা আমি আমার পাহাড় পর্বতকে অনেক মানিয়ে গুছিয়ে হাজারটা বুঝিয়ে
পাড়ি দিলাম তোমার পাহাড়ের উদ্দেশ্যে...
মনের ব্যাপার তো !
যোগ বিয়োগ করে চলা পথও কেমন অমসৃণ লাগে মাঝে সাঝে... আমার পাহাড় থেকেই রওনা দিলাম -পথে যদিও পড়বে অনেক বিপদ সংকুল পথ ,চড়াই উৎড়াই ভরা সিদ্ধান্ত কিছু সময়ে বোঝা মনে হবে- তবুও এ দেখা করতেই হবে...
এটাও জানি যখন গিয়ে পৌঁছাবো তখন তোমার পাহাড়েতে নিভু নিভু আলো সঙ্গে অন্ধকারের প্রারম্ভকাল... দূরে আকাশে জমাট বাঁধা ধূসর অভিমান... সমস্ত পাহাড় জুড়ে আমি শুধু খুঁজবো তোমাকে... তখন তুমি অন্যকোনো পাহাড়ে -অন্যরকম অপেক্ষায়... চিঠি আসবে, মন উশখুস করবে আবারো. . আমি এই পাহাড় থেকে তোমার পাহাড়ের উদ্দেশ্যে আবার শুরু করবো যাত্রাখ পথে সেই আবার নানা বিপদ তাও আমি যাবো.. কোনো দিনও তোমার সঙ্গে দেখা হবে না জেনেও আমি যাবো.. ঠিক এমন করেই তো আমি সমস্ত বিশ্ব জয় করবো ঠিকই ..কিন্তু তোমার দেখা পাবো না কোনোদিন..

দেখনধারী

তুলিকা মজুমদার

ওই পাড়ার ওই ময়না, জানো?
হারিয়ে গেছে, কিচ্ছুটি খোঁজ নেই।
গেলো বছর আমার সোনা,
ঠিক যেমনটি হারিয়ে গেলো সেই।
আশেপাশে কতই শুনি হারিয়ে গেছে আরো,
মেয়েগুলো যে কোথায় হারায়, কেউ বলতে পারো ?
সেবার যখন গাঁয়ের হারু কলকাতাতে গেলো,
খারাপ পাড়ায় বেশ কটি মেয়ে, দেখতে নাকি পেলো !
আমার সোনা, সেও কি অমন খারাপ পাড়ায় থাকে?
গাঁয়ের থেকে কে নিয়ে যায়, কেই বা ওদের ডাকে?
কেউ তো বলে নারী পাচার, কেউ বা বলে অভাব,
মেয়েগুলো কি নিজের থেকেই পাল্টে ফেলে স্বভাব?
মেয়ে হয়ে জন্মে যারা এমন হাতের খেলনা,
কেমন করে আগলে রাখি, কেউ তারা নয় ফেলনা।
বছর বছর দুগ্গা মায়ের পুজো করো সবে,
মা, মেয়েকে রক্ষা করা, কঠিন কেন তবে?
গাঁয়ের **লক্ষ্মী**,গাঁয়ের দুগ্গা আতান্তরে পড়ে,
মহামায়ার পুজো তবে দেখনধারীর তরে?

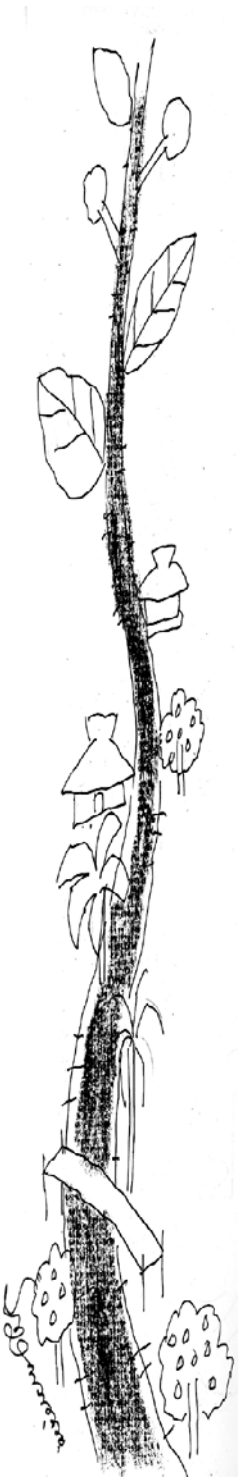

বিস্মরণ

মালবিকা মিত্র

দীর্ঘ ক্লান্তির অবসানে রাত্রি ভোর হয়,
কুসুম সাজে নতুন শৃঙ্গারে,
যদিও রাত্রি ঢেকে রাখে অনেক ক্ষোভ
তবুও ভোরের মায়া, আহিরের সুরে
পূর্বজন্মের ওপার থেকে বার্তা নিয়ে আসে,
যাকে ভুলতে চেয়ে চেনাপথে হাঁটি না আর
যাকে ভুলব বলে ভুলেছি কত প্রিয় গান,
প্রদোষের মেঘে ঢাকা আকাশ লুকিয়ে ফেলে তাকে,
শুধু তাকে ভুলেই দিনের পানে যাত্রা শুরু হয়।
তবু,
অভ্যস্ত জীবন পিছু ডাকে মাঝে মাঝে।
মাঝে মাঝে উতল হাওয়া,
বাতাসে আলতো আতরের ছোঁয়া,
সমুদ্রের গন্ধ
কিংবা বিকেলের হলদে আকাশ...
তবু,
পিছু ফিরে দেখতে নেই জেনেও
পিছু ফিরে দেখি।
বঞ্চনার ডালি উপচে পড়েও
পাথরে ফুল ফোটে।

আবার,
তীব্র ব্যঙ্গে ঢেকে ফেলি
কান্নার অনুরণন।
প্রবল ব্যস্ততায় মুড়ে দিই স্মৃতি।
অনিদ্রার ব্যারিকেডে ঘিরে দিই স্বপ্নের পথ।

স্বপ্নেও সে আসে না এখন...

ওরা থেকে যায়

সহেলী সেনগুপ্ত

মুঠো ভরে আঘাত ধরে
আমি ছাদের কার্নিশে দাঁড়াই শীতঘুমের মতো -
মুঠোর দিকে চেয়ে থাকি অপলক,
দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য আঘাতেরা কেবল নড়ে-চড়ে
আমি ওদের ছাদের পাঁচিল থেকে
পায়রা করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছি

ছাদের আলসেতে চড়ুই বসে খুঁটে খুঁটে খুদ খায়,
ওদের মতো থরে থরে সাজানো আছে যন্ত্রণা,
আমি কাঁটার উপর স্বচ্ছন্দে হাঁটি
জীবনের বেহিসেব বরাবর হেঁটে যায় আমার শীৎকার
ঐ যন্ত্রণাদেরও আমি আলসে থেকে
বৃষ্টিফোঁটা করে ঝরিয়ে দিতে চেয়েছি

আকাশের একটু নীচে থেমে থাকে নারকেলপাতা
সরসর করে সরে শেষ বিকেলে গোধূলির গন্ধে ভিজে
আকাশের গায়ে তারা ফোটার আগে ঘুড়ি ওড়ে
লাল-কমলা-হলুদ-বেগুনি-সবুজ-আকাশনীল
ছাদের চিলেকোঠায় পুরোনো চুমুর মতো স্মৃতি বিছিয়ে থাকে
আমি ওদের ঘুড়িগুলোর মতো আদিগন্ত উড়িয়ে দিতে চেয়েছি
দীর্ঘশ্বাসী বাতাস বয়
আমি জিজ্ঞেস করি,
তকী দিলে তোমরা? কী দিয়ে গেলে?দ
তারা বলে,
তপায়রা হয়ে উড়ে যাইনি,
  বৃষ্টিফোঁটায় ঝরে যাইনি,
  ঘুড়িরও তো নাগাল পাইনি,
এই তো তোমার কাছেই রইলাম -
তোমার স্থৈর্য হয়ে, তোমার মৃদুতা হয়ে, তোমার গভীরতা হয়ে,
আঘাতশেষে আরও আঘাত নেবার ক্ষমতা হয়ে,
নরমিয়া আবেগ হয়ে,
ভয় পাওয়া স্বপ্ন হয়ে,
থাকতে না চেয়েও থেকে যাওয়া হয়ে,
লড়তে না চেয়েও লড়ে যাওয়া হয়ে,
নিঃশেষে ভালোবেসে যাওয়া হয়ে,
এই তো তোমার কাছেই রইলাম,
এই তো রইলাম,
এই তো রইলাম,
এই তো রইলামদ.....

গীতবিতান

সুশীল মণ্ডল

দুপুরগুলো গীতবিতানের সঙ্গে আঁটোসাঁটো হয়ে শুয়ে থাকে।
সুরের বৃষ্টিপাতে আকাশকে ছুঁয়ে আসে রোদ্দুর।

খেয়াঘাটে এলোমেলো উড়ছে পাখিরা
সকালটাকে আগাগোড়া বলা যায়
একটা রবীন্দ্রনাথ, ধ্যানগম্ভীর।

আজকাল অপার্থিব দিনগুলোতে ছড়িয়ে আছে বিপন্নতা। গীতবিতান অবিশ্রাম চেষ্টা করে চলেছে আলোহীন মানুষগুলোকে একটু দুঃখ চেনাতে। চেতনায় জড়িয়ে দিতে চায় সুদূরপ্রসারী বিষাদকথা।

অদ্ভুত দেশ অস্ট্রেলিয়া

সৌরভ অধিকারী

সালটা তখন ২০০৭। সবেমাত্র ইউনিভার্সিটির গণ্ডি পেরিয়েছি। চাকরিও পেয়েছি সদ্য। চাকরি করতে হলে যেতে হবে অস্ট্রেলিয়া। থাকতে হবে সে দেশে গিয়ে। তার জন্য চাই ওখানকার রেসিডেন্ট ভিসা এবং রেসিডেন্ট ভিসা পেতে গেলে অস্ট্রেলিয়া যেকোনো মফস্বল বা গ্রামেগঞ্জে -- ওসব দেশে যাকে বলে কান্ট্রি সাইড --- সেখানে গিয়ে দু'বছর সেখানকার লোকাল বাসিন্দা হয়ে থাকতে হবে। নতুন চাকরি। আর বেশ পছন্দও ছিল কাজটা। ফলে রওনা দিলাম। কোম্পানির অপারেশন ইউনিট অফিস উইন্ডারা নামে ছোটো একটি শহরে। শহরটা পার্থ থেকে ১৪০০ কিলোমিটার দূরে। সেখানেই কোম্পানির অফিস ক্যাম্পাস।

কোম্পানিরই চার্টার্ড ফ্লাইটে গিয়ে পৌঁছলাম লাভাটন নামে ওখানকার একটি ছোটো মফস্বল সদরে। শুনলাম এখান থেকেই যেতে হবে

উইন্ডারা। নেমে দেখি সে এক অদ্ভুত জায়গা। চারিদিকে কেবল লাল মাটি এখানে সেখানে ছোটো ছোটো গাছ। লাভাটন ছোটো শহর বললে খুব বেশি বলা হয়। টাউনের পরিসর এতটাই ছোটো যে সেখানে বাস করে মাত্র দু-তিনশো লোক। সভ্যতার সঙ্গে যোগ বলতে একটা পোস্ট অফিস, একখানা হোটেল , একটা মাত্র ফুয়েল স্টেশন এবং একখানা কনভেনিয়েন্ট স্টোর। কনভেনিয়েন্ট স্টোর মানে আমাদের ভাষায় মুদিখানা বলতে যা বোঝায় তাই। চাল-ডাল, তরি-তরকারি থেকে শুরু করে যা যা দরকার পেতে হলে আপনাকে ওখানে যেতে হবে । ওটাই ভরসা। এছাড়া যেদিকে তাকান কোথাও কিছু নেই। খুবই অবাক হয়েছিলাম প্রথমটায়।

কিন্তু তখনো আমার যাত্রা শেষ হয়নি। উইন্ডারা শুনলাম এখান থেকে আরো ৭০ কিমি দূরে। ওখানেই আমাদের অফিস ক্যাম্পাস। পথে যেতে যেতে লক্ষ্য করছিলাম একটু অন্যরকম চেহারার কিছু লোক রাস্তার ধারে, টাউনের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুবই নিস্পৃহ তাদের ভাব ভঙ্গি। যেন কিছুতেই কিছু যায় আসে না। আমার সঙ্গে ছিল সহকর্মী অ্যালেক্স। জিজ্ঞেস করে জানলাম এরাই এখানকার আদিবাসিন্দা। বলল এরা হল ওদের ভাষায় যাকে বলে অ্যাবঅরিজিনালস। এরাই নাকি আদি অস্ট্রেলিয়ান। ব্যাপারটা একটু জটিল। অস্ট্রেলিয়ান বলতে সচরাচর আমরা বিদেশিরা তো বুঝি ইউরোপের বা ইংল্যান্ডের লোকজনকে। কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে এরা মোটেই অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসিন্দা নয়। এরাও আমাদের মতোই ইমিগ্রান্টস। এদেশের আসল আদি বাসিন্দা হল এই অ্যাবরিজিনালস বলতে যাদের বোঝায় তারা। আজ থেকে বহু যুগ আগে এরা এসেছিল প্রধানত দক্ষিণ এশিয়ার নানা দেশ থেকে। এসব দেশের মধ্যে আছে ফিলিপিন্স , ইন্দোনেশিয়া, নিউ পাপুয়া গিনি, মালয়েশিয়া, ইস্ট তিমর, ব্রুনেই ইত্যাদি। ভূগোল বলছে একদা অস্ট্রেলেশিয়া নামে মহাদেশ তৈরি হয়েছিল এরকম বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ মিলিয়ে। পরে বিভিন্ন ভৌগোলিক কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দ্বীপপুঞ্জগুলি। ফলে এই যে আজ যাদের অ্যাবঅরিজিনালস বলা হয় তাদের মধ্যে ঘটে গেছে বিভিন্ন বর্ণ বৈশিষ্ট্যের মিলন। এইসব লোকেদের পরিবেশ সহিষ্ণুতা প্রবল। ভয়ংকর গরম কিংবা ভয়ানক শীত এরা সহ্য করে নেয় স্বাভাবিকভাবেই। এরা ৫০ ডিগ্রি থেকে - ৫ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত বিভিন্ন তাপমাত্রায় স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। কেবল তাই নয়, প্রায় ২০০ থেকে ৩০০র মতো ভাষাও এদের মধ্যে প্রচলিত।

যত ক্যাম্পাসের দিকে এগোচ্ছি ততো চারিদিকে লাল মাটির দেশ

যেন ঘিরে ধরছে। আমাদের দেশেও লালমাটির এলাকা পাওয়া যায়, কিন্তু এখানকার লাল মাটির চেহারাই আলাদা।
ক্যাঙ্গারুরা রাস্তা পারাপার করছে আপন মনে। এলেক্সা এদের বলে ওয়াইল্ড ক্যাঙ্গারু। এরা অসম্ভব ক্ষিপ্র। সাধারণত মানুষের নাগালে আসে না। চারিদিকে যেদিকেই তাকাই ভূপ্রকৃতি একই রকম। জঙ্গল আছে , তবে খুব ঘন নয়। শুনলাম এই জঙ্গলে একবার রাস্তা হারালে ফেরা খুব কষ্টকর। অ্যালেক্সও বলল একমাত্র আদিবাসী আর অভিজ্ঞ জিওলজিস্টরা বাদে রাস্তা হারালে এইসব জঙ্গল থেকে ফেরা প্রায় অসম্ভব। তার কারণ হল প্রধান যে সড়ক পথ তা একদম সোজা দিকচক্রবালে গিয়ে মিশে গেছে। পথ হারালে একমাত্র সহায় হলো গরু আর ক্যাঙ্গারু। একমাত্র ওদের অনুসরণ করলেই বাঁচা সম্ভব। গরুর পায়ের ছাপি হল এখানে গুগল ম্যাপ। ক্যাঙ্গারুও তাই। তারা অনায়াসে জঙ্গলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চলাফেরা করতে অভ্যস্ত। ক্যাঙ্গারুরা বড় রাস্তায় এসে ওঠে শুধু জলের খোঁজে। আদিবাসীরাও এভাবেই টিকে থেকেছে। এক হিসেবে এরা বিশ্বের সবথেকে প্রাচীন শিল্প ধারারও জন্মদাতা। এই যে শিল্পধারা, পন্ডিতরা বলেন, এটা একটা সামগ্রিক শিল্পধারার ঐতিহ্যই বহন করছে।

এদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কথা উঠতে, অ্যালেক্স বলল এরা নানা রকম ফল, ফলের বীজ, শিকড় এবং বিভিন্ন রকম প্রাণীর মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে। সজারু, ক্যাঙ্গারু, এমু , গোয়ানা, পাখি সহ যেকোনো প্রাণীর মাংসই এরা খায়। আর খায় মাছ। খাবার জোগাড় করার জন্য এরা শিকারকেই প্রাধান্য দেয়। শিকারের অস্ত্র বলতে এরা এমন একটি অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে যা ১০০০০ বছর আগেও মানুষ ব্যবহার করেছে। এর নাম হল বুমেরাং। শুনলাম দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৭৩ সালে এরকম একটি বুমেরাং নাকি পাওয়া গেছে যার বয়স পণ্ডিতরা মনে করেন দশ হাজার বছর। একেই বলা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে সবথেকে পুরনো বুমেরাং।
শিল্পের কথা হচ্ছিল। শুনলাম শিল্পের দিক থেকেও এরা অনেকটাই ইউনিক। ডট পেইন্টিং আর্ট , যেটা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইন্ট্রিগাল আর্ট, তারা অনায়াসে আয়ত্ব করেছে। এই শিল্পকলা দিয়ে এরা নিজেদের শিল্পে, চিত্রকলায় শক্তি, সৌন্দর্য, ব্যাপ্তিকে অতি সাবলীল ভাবে চিত্রিত করে থাকে। এরা আরো পছন্দ করে গান। মিউজিক। এরকমই আরেকটি মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট এরা তৈরি করেছিল যাকে বলা হয় ডিজারিডু। ডিজারিডু হল এক ধরনের কাঠের ট্রাম্পেট , যা, ইউক্যালিপাস কাঠ থেকে তৈরি করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার যাকে ওদের দেশে কান্ট্রি সাইড বলে সেই গ্রাম সম্পর্কে আমার উপলব্ধি একেবারে অন্যরকম। এদেশে নাইলে আমি জানতেই পারতাম না মহাদেশটির আসল বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য কোথায় নিহিত। প্রকৃত অস্ট্রেলিয়া বলতে এই গ্রামকেই বোঝানো হয়। খুব স্বাভাবিক, কারণ পৃথিবীর যেকোনো দেশের সত্যিকারের সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে

আপনাকে তাদের গ্রাম বা কান্ট্রি সাইডে একবার আসতেই হবে। নইলে আপনি সে দেশের মানসিক অবস্থান ধরতেই পারবেন না।

এমনিতে দেশটিকে অভিহিত করা হয় কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া নামে। কিন্তু এ নাম ব্রিটিশদের দেওয়া নাম। এদেশে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক আধিপত্যের শুরুটা হয়েছিল ১৭৮৮ সালে। এই বছরের জানুয়ারি মাসেই এদেশে প্রথম ব্রিটিশদের পদার্পণ ঘটে। এটা ঘটেছিল নিউ সাউথ ওয়েলসের বোটানি বে-তে। সেখানে তখন তৈরি করার কথা ভাবা হয়েছিল ইংরেজিতে যাকে বলে পেনাল কলোনি। ব্রিটেনে কুখ্যাত অপরাধী তাদের এখানে নির্বাসন দেওয়া হত। তারপর থেকে মহাদেশটার বিবর্তন হয়েছে প্রচুর। আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার আবির্ভাব ১৯০১ সালে। ফেডারেশন অফ ফরমার ব্রিটিশ কলোনি হিসাবে। নিউ সাউথ ওয়েলস, ভিক্টোরিয়া, কুইন্সল্যান্ড, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া আর তাসমানিয়া যৌথভাবে মিশে জন্ম হয়েছে আজকের কমনওয়েলথ অস্ট্রেলিয়ার। তবে ইতিহাসের সে এক অন্য কাহিনি।

পাঁচটি কবিতা

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

কাস্তে

কাস্তেটাতে জং ধরেছে
তাই তো ছোবল মারো,
যদিও জানি ঘাসের নিচে
সাপ রয়েছে আরো।
কাস্তেটাতে জং ধরেছে
ছিল যে ভুল হাতে,
তাই তো আজ পেটে লাথি
টান পড়েছে ভাতে।
কাস্তেটাতে জং ধরেছে
ভাবছো লড়াই শেষ,
এই ভেবে মনের সুখে
লুটছো সাধের দেশ।
কাস্তেটাতে জং ধরেছে
শান দেবো একদিন,
অত্যাচারীর যত আওয়াজ
হবে সেদিন ক্ষীন।
কাস্তে হাতে লড়াই করে
ছিনিয়ে নেবো জয়,
যুগে যুগে বাঁচবো মোরা
নেইকো মোদের ক্ষয়।

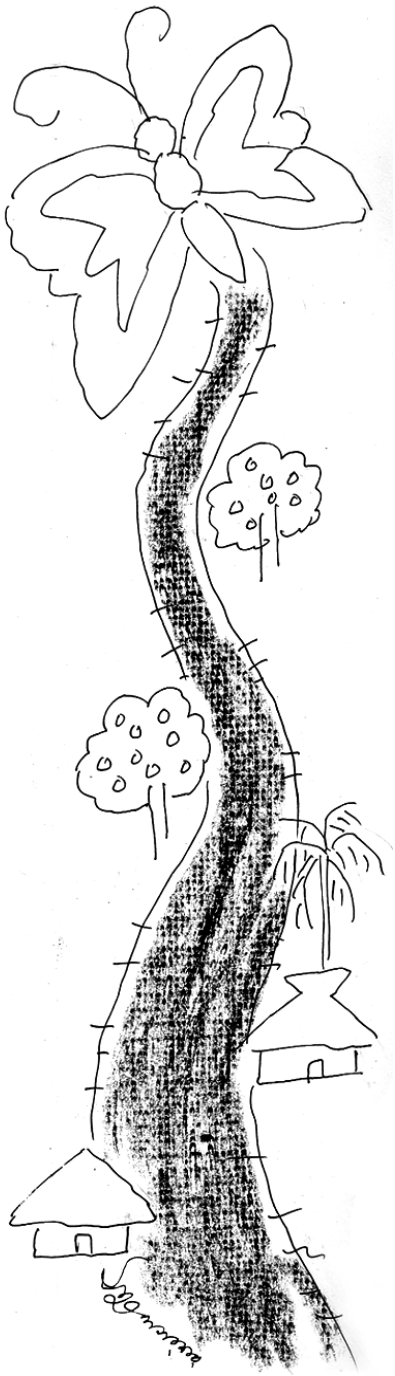

বিপ্লব ফিরে আয়

বিপ্লব, তোর মনে আছে মাঠটা কত বড় ছিল
আর জেলটা কত ছোট!
আমরা মাঠটাকে ঘিরে রাখতাম আর মাঠটা আমাদের।
মাঠটার নাম তখন ছিল জেল ময়দান;
নামের মধ্যেও ময়দানটাই বড়।
মাঠে চোরকাঁটা হলে তুই আর আমি টেনে তুলতাম
বারবার, ক্লান্তি ছিল না আমাদের।
মাঠের ঘাস ছিল সবুজ, কোথাও ধূসর নয়।
পাশেই ছিল রানিপুকুর; টলটলে জল তার।
বলেছিলি,আমাকে ডুব সাঁতারে অতলের সাক্ষাৎ করাবি।
কবে শেখাবি আমাকে ডুব সাঁতার?
বিপ্লব, কোথায় চলে গেলি?
এখন মাঠটা ছোট হয়ে যাচ্ছে আর জেলটা বড়!
মাঠটার এখন নাম কারাগারের মাঠ;
নামের মধ্যেও কারাগারটাই বড়।
এখন মাঠটা চোরকাঁটায় ভর্তি,সবুজের বুক চিরে
অনাদরের ধূসর রুক্ষ পায়ে হাঁটা পথ।
রানিপুকুরে আর জল নেই; শুকনো অগভীর তল।
বিপ্লব, তুই একবার ফিরে আয়-
আমরা আবার মাঠটাকে সবুজ করি,
চোরকাঁটা উপড়ে ফেলি এক এক করে।
জেলটাকে ঠেলে ঠেলে ছোট করে দিই,
রানিপুকুর খুঁড়ে খুঁড়ে গভীর করি;
যতক্ষণ না জলের দেখা পাই,
যতক্ষণ না অতলের সাক্ষাৎ পাই।

অপেক্ষা এক বসন্তের

সেদিন কত তারিখ ছিল? কী বার?
পাঁজিতে লগ্ন কী ছিল?
না, কিছুই বোধ হয় ছিল না;
ছিলাম শুধু তুমি আর আমি।
মাথার ওপর খোলা আকাশ,
চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ
আর বড় বড় শালগাছের আলিঙ্গন।
পায়ের গোড়ালি ভিজিয়ে যখন
রুকরুকা বয়ে চলেছে,
হঠাৎ দূরে কোথাও অসময়ে
কোকিল ডেকে উঠেছিল বোধ হয়।
তখনই, ঠিক তখনই তোমার ঠোঁট
স্পর্শ করেছিল আমার ঠোঁট।
হঠাৎ জলোচ্ছাস এসেছিল রুকরুকায়
আর তীব্র আগুনে জ্বলেছিল
দুই সজীব সতেজ দেহ।
সেই স্রোতে তুমি ভেসে গেছ
আজ অজানায়,
আর আমি পোড়া দেহ নিয়ে
অপেক্ষায় আছি আর এক বসন্তের।

আমি, সে আর রুকরুকা

সে এসেছে আজ রুকরুকার তীরে
সাতাশ বছর পরে।
আমি জানতাম সে আসবে-
তাই তো সমস্ত ঝড় উপেক্ষা করেছি
দীর্ঘ সাতাশ বছর।
শালবনে আমার গায়ে জমেছে শ্যাওলা,
পাতা ঝরেছে ক্রমাগত; তবুও শিকড় গেঁথেছি
মাটির গভীরে- তার ফেরার পথ চেয়ে,
রুকরুকা বয়ে গেছে বুকে অবিরত।
আজ তীব্র স্রোত নেই নদীতে,
পূর্ণিমার চাঁদ আজ ঢেকে আছে
খানিক মেঘের আড়ালে।
তবুও সে ছুঁয়েছে আমায়,
রুকরুকা বলেছে কানে কানে
আজ স্রোত নয়, প্রাণ ভরে
চেয়ে দেখো আমার স্বচ্ছতা।
শ্যাওলা জমুক, পাতা ঝরুক,
চাঁদ খানিক আঁধার হোক-
তবুও হাত ধরে থাকি আমরা;
আমি, সে আর রুকরুকা।

অবশিষ্ট

অনেকদিন পর আজ সুন্দর গন্ধটা পেলাম-
সঙ্গে বসন্তের হাওয়া।
এই গন্ধ আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম আমার
অন্তরতম অন্তরে; ভালোবাসার রঙিন তোরঙ্গে।
এই তোরঙ্গ আমি দিনের পর দিন মুড়ে রেখেছি
অনুভূতিহীন মোটা চাদরে; গন্ধটা হারায়নি
কিন্তু আমি হারিয়ে গেলাম!
আজ হঠাৎ উতল হাওয়ায় উড়ে গেল বেরঙ চাদর-
পেলাম তোরঙ্গের চাবি।
এই চাবি দিয়ে আমি ফিরে পেলাম জীবনের স্পর্শ-
তাজা নিঃশ্বাস নিয়ে ডুব দিলাম গভীর জলে।
তুলে আনলাম হারিয়ে যাওয়া মার্বেল গুলি,
ভাঙা ব্যাট, স্লেটের টুকরো আর প্রথম পাওয়া
প্রেমের চিঠি-
যার অক্ষর আজ ধুয়ে গেছে, থেকে গেছে শুধু
সূর্যাস্ত আর একফালি চাঁদের প্রেম।

বাঙালিকে আপডেট করতে

বাংলা ST. online

www.banglastreet.com

প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে

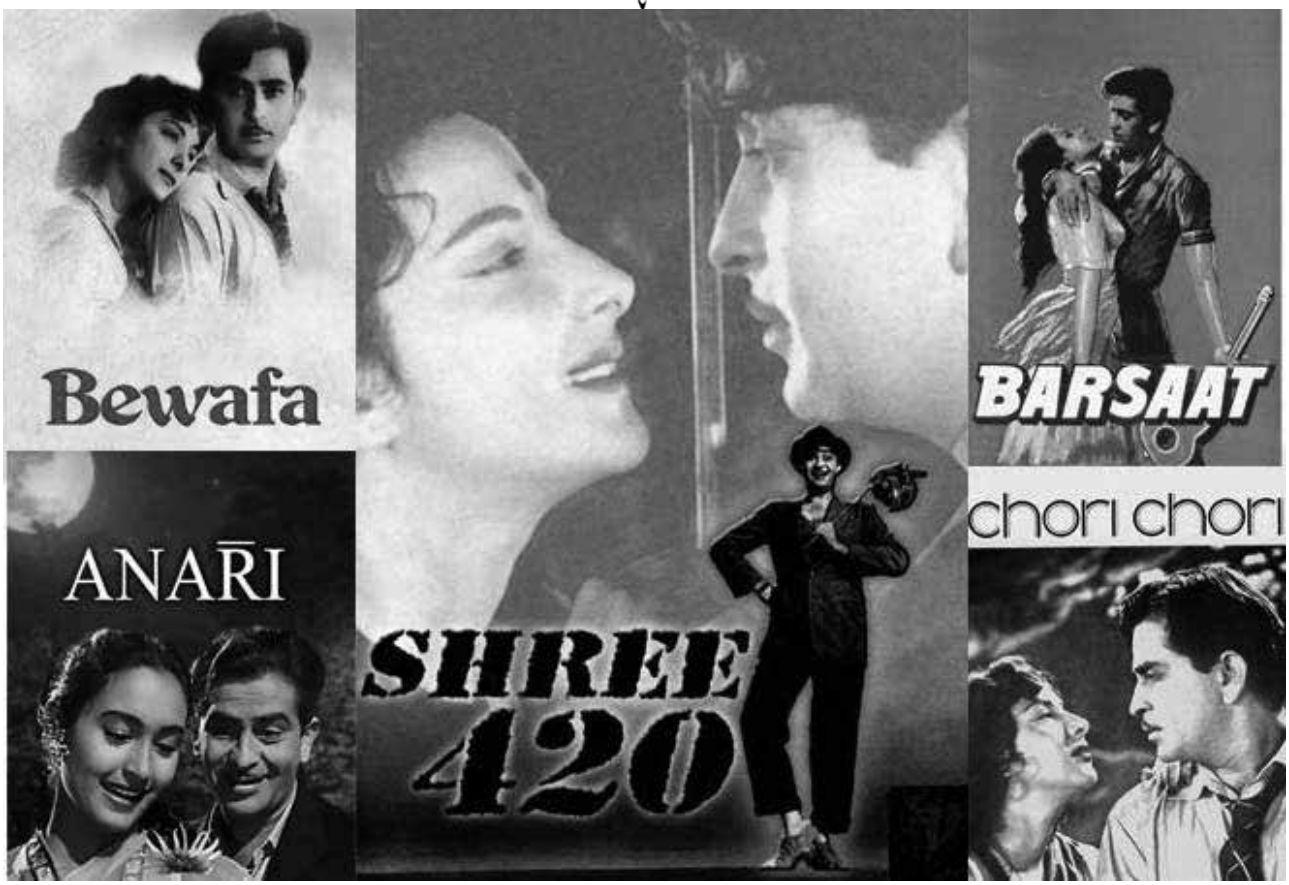

দ্য গ্রেটেস্ট শোম্যান

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

১

রাজ কাপুর কি নিছকই এন্টারটেইনার বা শোম্যান? ভারতীয় সিনেমায় অনেকটা এভাবেই চিহ্নিত হয়ে আছেন রাজকাপুর। তাঁর শিল্পী সত্তা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করে উঠতে পারিনি আমরা। এর কারণ বোধহয় স্বয়ং রাজকাপুরই। তিনি সিনেমাজীবন শুরু করার সময় থেকেই নিজেকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন ভবঘুরে জোকার হিসেবেই।এই ব্যাপারে তাঁর আদর্শ অবশ্যই দুনিয়া কাঁপানো ট্র্যাম্প চার্লি চ্যাপলিন। অভিনয় সূত্রে তিনি চার্লিকে সরাসরি অনুসরণ করেছেন। শুধু অভিনয়সূত্রেই বা কেন, তিনি চলচ্চিত্রে বহিরঙ্গেও হয়ে উঠতে চেয়েছেন চার্লিই। ভারতীয় চার্লি চ্যাপলিন হিসেবেই তিনি চিহ্নিত হয়েছেন ভারতীয় সিনেমায়। তবে এটা ঠিক যে চ্যাপলিন পরবর্তীকালে যে রাজনৈতিক সচেনতা দেখান সেই পথ কখনই নেন না রাজ কাপুর। সেখানে তিনি কখনই চার্লি-পন্থি নন। চার্লির কাছ থেকে তিনি ধার নেন শোম্যানশিপটাই। চার্লিকে রাজনীতির জন্যেই হলিউড ভালো চোখে নেয়নি। তাঁকে হলিউড তথা আমেরিকা থেকে কমিউনিস্ট অ্যাখ্যা দিয়ে একপরকার তাড়িয়েই দেওয়া হয়েছিল। চার্লিকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল অ্যান্টি আমেরিকান অ্যাক্টিভিটি কমিটি-কে। তিনি কি কমুনিস্ট -- এই প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হয়েছিল তাঁকে। কেননা চার্লি সারা জীবন তাঁর ছবিতে চিহ্নিত করেছেন বঞ্চিত মানুষদের। তাদের নিয়ে মজার ছলে ছবি করে সারা পৃথিবীর

দর্শকদের হাসতে হাসতে কাঁদিয়েছেন। স্বয়ং হিটলারকে ব্যঙ্গ করে ছবি করেছেন ,যা ক্রমশ তাঁকে কমুনিস্ট হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে। শুধু সিনেমা করার জন্যে চার্লিকে পোয়াতে হয়েছে নানা ঝক্কি ঝামেলা। তাঁর কর্মভূমি মার্কিন রাষ্ট্র ত্যাগ করতে হয়েছে শুধু রাজনীতির জন্যেই। আমাদের রাজ কাপুরকে এসব কিছুরই মুখোমুখি হতে হয়নি। বরং চার্লিকে বহিরঙ্গে অনুকরণ করে তিনি ক্রমশ পেয়েছেন অর্থ, কীর্তি, নারী, বৈভব এবং জনপ্রিয়তা। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে কখনই নিজেকে সরাসরি জড়াননি তিনি। অথচ রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই ছোটবেলা কেটেছে তাঁর। জন্ম দেশভাগপুর্ব ভারতের পেশোয়ারে।১৯২৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর । রাজ কাপুরের বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুর পেশোয়ারেই কৈশোর যৌবন কাটিয়েছেন। তাঁর বাবা বলেশ্বর কাপুর ছিলেন পেশায় পুলিশ ইন্সপেক্টর। বাবা চেয়েছিলেন পৃথ্বীরাজ আইনজ্ঞ হন। সেই কারণেই পৃথ্বীরাজকে ভর্তি করা হয় লাহোরের আইন কলেজে। কিন্তু পৃথ্বীরাজের স্বপ্ন অভিনেতা হবেন। ইতিমধ্যে রাম সারনী মেহরার সঙ্গে তাঁর বিবাহও দিয়ে দিয়েছেন তাঁর বাবা। জন্ম নিয়েছে পুত্র সৃষ্টিনাথ কাপুর। এই সৃষ্টিনাথ কাপুরই পরবর্তী কালের রণবীর রাজ কাপুর, যিনি পরে রণবীর নাম ছেঁটে ফেলে হয়ে উঠবেন ভারতীয় সিনেমার গ্রেট শোম্যান।

আইনবিদ হবেন কখনই এ স্বপ্ন দেখতেন না পৃথ্বীরাজ। বরং তাঁর স্বপ্ন ছিল অভিনেতা হবেন। চলচ্চিত্র তখন ভারতে তখন বিনোদন মাধ্যম হিসেবে বেশ জাঁকিয়ে বসছে।এদিকে বোম্বাইতে থিয়েটার তখন বেশ জনপ্রিয়ই।পৃথ্বীরাজ সেই স্বপ্নের ঝোঁকেই স্ত্রী পুত্রকে বাবার কাছে পেশোয়ারে রেখে বোম্বাই চলে এসে ইম্পিরিয়াল কোম্পানিতে যোগ দলেন। ছ'ফুট দুইঞ্চি চেহারার পৃথ্বীরাজ সহজেই বোম্বাই থিয়েটার জগতে জায়গা করে নিলেন। বোম্বাইয়ের ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানিতে এক্সট্রা হিসেবে অভিনয় জীবন শুরু করলেন তিনি। তারপর এলেন বোম্বাইয়ের এক রেপার্টরি থিয়েটারে। শোনা যায় ইম্পেরিয়ালে থাকাকালীন তিনি ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'আলম আরা' সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বোম্বাই নয় ভারতের চলচ্চিত্রের রাজধানী তখন কলকাতা। পেশোয়ার থেকে ইতিমধ্যেই স্ত্রী পুত্রকে বোম্বাই নিয়ে আসেন তিনি। সেই বোম্বাই থেকে অভিনয় করার জন্যেই কলকাতায় চলে এলেন তিনি। এখানে এসে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে মাসিক ৪৫০ টাকা মাহিনার চুক্তিতে যোগ দিলেন। কলকাতায় স্ত্রী পুত্র নিয়ে হাজরা রোডে বাড়ি ভাড়া করে বাস করতে শুরু করলেন। রাজের বয়স তখন পাঁচ। ভর্তি হলেন কলকাতার সেন্ট-জেভিয়ার্স স্কুলে। প্রায় আট বছর প্রাথমিক পঠনপাঠন এখানেই। শুধু তা-ই নয়, রাজকাপুরের

প্রথম অভিনয় অভিজ্ঞতাও কলকাতাতেই। চলচ্চিত্র অভিজ্ঞতাও। বাবার সঙ্গে প্রথম 'চারুদত্ত' নামে এক নাটকে অভিনয় করেন তিনি। তখন তাঁর বয়স বছর দশেক। আর শিশু অভিনেতা হিসেবেও চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় এই কলকাতার নিউ-থিয়েটার্সেই। ১৯৩৫ সালে। কিন্তু সেই একবারই। তারপর তাঁর অভিনয় জীবনের শুরু ১৯৪৩-এ। বোম্বাইতে।

যতদূর মনে পড়ছে সেটা আশির দশকের মাঝামাঝি সময়,সদ্য মুক্তি পেয়েছে 'মেরা নাম জোকার'। রাজকাপুরের ড্রিমপ্রজেক্ট। যতটা আশা করেছিলেন সেইভাবে বক্সঅফিসে সাড়া জাগাতে পারেনি। খানিকটা ভেঙ্গে পড়েছিলেন রাজকাপুর। সেই সময় সাংবাদিকতা সূত্রে আমি বোম্বাই-তে। জানা গেল আর কে স্টুডিও-তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন রাজকাপুর। সকলের সঙ্গে নয়। কিছু নির্বাচিত সাংবাদিকের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন।এক এক করে। এই সুযোগটা হাতছাড়া করা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। এর আগে রাজকাপুরের সেক্রেটারি হরিশজীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। হরিশজীর ফোন নম্বরটা সেইসময় থেকেই কাছে ছিল।একটু ঝুঁকি নিয়ে ফোন করলাম। মিঠুনের রেফারেন্স দিয়েই করলাম। জানালাম কলকাতার এক প্রভাবে প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের তরফে রাজকাপুরের একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই। হরিশজী সব শুনে জানালেন আধঘন্টা পরে তিনি জানাচ্ছেন। তখন মোবাইলের সময় নয়। ঠিক আধঘন্টা পরেই আমার ল্যান্ডফোন বেজে উঠল। হরিশজীর গলা, কাল বিকেল চারটেয় চলে আসুন আর কে স্টুডিও-তে।

চেম্বুরে আর কে স্টুডিও। পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করার পর প্রথম দুটো ছবি অন্য স্টুডিও-তে করার পর রাজ ঠিক করেন এবার নিজেই স্টুডিও তৈরি করবেন। সেইমতো চেম্বুরে চার একর জমি নিয়ে তৈরি হয় আর কে স্টুডিও। বিশাল এই স্টুডিও-য় ঢোকার মুখেই রয়েছে লার্জার দ্যান লাইফ আর কে মুভিজের সেই লোগো। ডান হাতে বেহালা নিয়ে এক যুবক বাঁহাতে এক যুবতীকে কাছে টেনে নিতে চাইছে। দুজনেই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিমায়। 'বরসাত' ছবিতে রাজ ও নার্গিসের এক ঘনিষ্ঠ দৃশ্য থেকেই নির্মিত এই লোগো। তার পাশেই বিশাল শিব মুর্তি। সেই শিবমূর্তি যাকে রাজকাপুর পরিচালিত সব ছবির শুরুতে দেখি। ছবির শুরুতে রাজ-পিতা পৃথ্বীরাজ কাপুর পুজো করেন এই শিবমূর্তি। এক আকাশের তলায় এই স্টুডিও-তে সব রয়েছে---সাউন্ড রেকর্ডিং রুম, এডিটিং রুম ইত্যাদি ইত্যাদি। স্টুডিও চত্বর পেরিয়ে পেছনে শুটিং-এর ফাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে রাজের সুসজ্জিত বাংলো। লাগোয়া রাজ কাপুরের নিজস্ব অফিস ঘর। সেখানে পৌঁছে খোঁজ করলাম হরিশজীর। তিনি বেরিয়ে এসে অপেক্ষা করতে বললেন। ডাক এল মিনিট পনেরোর মধ্যেই। একটা ইজি চেয়ারে আধোশোয়া অবস্থায় রাজ। পাশে একজন ডাক্তার। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই রাজের সঙ্গে প্রায় সবসময় এক পারিবারিক ডাক্তার থাকতেন। হরিশজী আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয়পর্ব শেষ হতেই রাজ বলে উঠলেন, 'কলকাতা, মাই ফেভারেট সিটি। ছোট বেলার আমার অনেকটা সময় কেটেছে আমার ওখানে।' চমৎকার বাংলা বলেন। বললেন, 'আচ্ছা হাজরা পার্কটা ওই রকমই আছে? শুনেছি কলকাতা অনেক পালটে গেছে?' 'না, কলকাতার অনেক কিছু পালটালেও',বললাম, 'হাজরা পার্ক প্রায় ওই রকমই আছে।আর আর আপনি যেখানে থাকতেন সেই হাজরা রোডও প্রায় একইরকম।' একটু থেমে আবার বলি,' এরপর তো আপনি বেশ কয়েকবার কলকাতায় গেছেন। ছোটবেলার পাড়ায় যাননি?' 'না, কাজে গেছি, হোটেল থেকে কাজের জায়গা, ব্যস। যেবার স্টার ক্রিকেট খেলতে গেছিলাম সেবার বাবার পুরোনো স্টুডিও নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও-তে গেছিলাম। একইরকম। সেই গোলঘরটা অবধি রয়েছে। অনেক কথা মনে পড়ছিল। ওই স্টুডিও-তেই তো আমার ফিল্মে অভিনয়ের হাতেখড়ি।'বেশ নস্টালজিক হয়ে পড়ছিলেন রাজ। প্রশ্ন করলাম, 'সেই সময়ের কলকাতার আর কিছু মনে পড়েনা?' আবার বাংলাতেই বললেন, 'মনে পড়ে, একটা বড় লেক ছিল। বাবা ওখানে আমায় সাঁতার শিখিয়েছিলেন।ধরে ছুঁড়ে জলে ফেলে দিতেন। কিন্তু সর্তক নজর রাখতেন। হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে যখন এক পেট জল খেয়ে ডুবতে চলেছি তখন ঠিক কোলে তুলে নিতেন।এই করতে করতে আমি সাঁতার শিখে গেলাম, যা বোধহয় আজও মনে হয় ভুলিনি।এই রকম আরও কত কী? মেট্রো সিনেমায় বাবার হাত ধরে প্রথম সিনেমা দেখা।' এইসব নানা কথার পরে এক সাক্ষাৎকার। যেটা প্রকাশিত হয় সেইসময় 'আজকাল' দৈনিকে। সেই সাক্ষাৎকারের পুনরাবৃত্তি-তে যাচ্ছি না। তবে সেদিন রাজকাপুরের সঙ্গে কথা বলে একটা কথা বুঝেছিলাম যে রাজকাপুরের মধ্যে রয়েছে এক বাংলার প্রতি প্রেম, বাঙালির প্রতি প্রেম। নাহলে সেই কৈশোরে কাটানো কলকাতার ভাষাকে এত যত্ন করে মনে রেখেছেন। সেদিন উত্তমকুমার প্রসঙ্গে কথা উঠেছিল।রাজ সরাসরি সেদিন জানান, উত্তমের বোম্বাইতে ছবি করতে আসা ভুল ছিল।এই টিনশেল টাউনে শুধু প্রতিভা নিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়।এখানে নানা ধরনের অভ্যন্তরীন রাজনীতি। সেসব রপ্ত না থাকলে এই মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত। তবে উত্তম যে খুবই শক্তিশালী অভিনেতা এক কথায় স্বীকার করে নেনে তিনি। শম্ভু মিত্রকে তিনি ছোটবেলা থেকে চিনতেন।তাঁর বাবা 'গণনাট্য'-এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন।সেই সূত্রে শম্ভু মিত্রকে আঙ্কেল বলতেন তিনি।তাই 'জাগতে রহো' চবি করার পরিকল্পনাটা যখন তাঁর কাছে আসে এককথায় রাজি হয়ে যান তিনি।

সেসময় একাধিকবার বাংলায় কাজের কথা হলেও ঠিক সেরকমভাবে হচ্ছিল না। হঠাৎ এল সুযোগ। বাংলা ছবির প্রযোজনায় রাজ কাপুর। একইসঙ্গে অভিনয়ও। বাংলা ছবির ১৯৫৬-এ শম্ভু মিত্র এবং অমিত মৈত্র পরিচালনায়। শুধু বাংলা নয় ।ডাবল ভার্সান।বাংলা ও হিন্দি।হিন্দিতে নাম হল 'জাগতে রহো'।আর কোনো বাংলা ছবিতে অভিনয় করেননি তিনি।তবে এক বাঙালি অভিনেত্রীকে ছবিতে অভিনয়ের অফার দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হন তিনি।এই অভিনেত্রী আর কেউ নন। স্বয়ং সুচিত্রা সেন। শোনা যায় সুচিত্রা সেনের বাড়িতে গিয়ে একগুচ্ছ লাল গোলাপ নিয়ে সুচিত্রার পায়ের কাছে বসে পড়ে নিজের ছবিতে অভিনয়ের অফার দেন তিনি। সুচিত্রা কিন্তু সবিনয়ে এই

প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। রাজ চরিত্রগত ভাবেই রোমান্টিক।তেরো বছর বয়সে কলকাতার এক বাঙালি কিশোরীর প্রেমে পড়েছিলেন।সারা জীবন তো তিনি একের পর এক নারীর প্রেমে পড়েছেন।আমৃত্যু।তবে তাঁর জীবনের প্রথম প্রেমিকা হল এক বাঙালিনী এ কথা স্বীকার করেন তিনি।

রিল লাইফ থেকে রিয়েল লাইফ।আর কে ফিল্মের লোগো হল ফিল্মের একটা ফ্রেম।সিনেমার পর্দায় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে নার্গিস ও রাজকাপুর।'বরসাত' ছবির একটি দৃশ্য। সিনেমার ইতিহাসে এই ঘটনা আগে কোনো দিন ঘটেনি। 'আর কে ফিল্মস' এর সেই লোগো, রাজকাপুরের মৃত্যুর পরেও তার ছেলেরা বজায় রেখেছিল, যতদিন আর কে ফিল্মস ছিল।

আর কে ফিল্মস ১৯৪৮ সালে মুম্বইয়ের চেম্বুরে রাজ কাপুর প্রতিষ্ঠা করলেন।তখনও অভিনেতা রাজকাপুর তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা পাননি। আশ চিরকালের স্বপ্ন ছিল ছবি পরিচালনা করবেন।তবে অন্য কোনও প্রযোজকের অধীনে নয়। কেননা সেখানে হয়ত তিনি নিজের ভাবনার ছবি তৈরি করে উঠতে পারবেন না। কেননা প্রথম থেকেই রাজ ঠিক করেছিলেন বাণিজ্যিক ছবি করলেও গতানুগতিক ধারায় তিনি চলবেন না।তাই ঠিক করলেন তিনি হবেন প্রযোজক পরিচালক।আর সেই চিন্তা থেকেই তৈরি হল আর কে ফিল্মস।এবার দরকার নিজস্ব স্টুডিও।বোম্বাইয়ের শহরতলী চেম্বুরে তিন একর জমি কিনে রাজ কাপুর নির্মাণ করলেন নিজস্ব- আর কে স্টুডিও।এই স্টুডিও-তেই নির্মাণ করলেন নিজের প্রযোজিত পরিচালিত অভিনীত ছবি।

স্টুডিওর প্রথম চলচ্চিত্র, আগ (১৯৪৮) এর বাণিজ্যিক ব্যর্থতার পরে, এটি বারসাত (১৯৪৯) এর মাধ্যমে সাফল্যের সন্ধান পায়।ততদিনে নায়িকা নার্গিসের প্রেমে পড়েছেন বিবাহিত রাজ। সিনেমায় আসার আগেই কৃষ্ণার সঙ্গে রাজের বিবাহ হয়ে যায়। অভিনেতা প্রেমনাথের বোন কৃষ্ণা নার্গিসের সঙ্গে তিনি যখন প্রেমে জড়াচ্ছেন তখন দুই সন্তানের জনক। দীর্ঘ পাঁচ বছর নার্গিস প্রেম পর্ব। কিন্তু স্ত্রী কৃষ্ণার সঙ্গে শারিরীক যোগাযোগ যে ভালই ছিল তার প্রমাণ এই পর্বেই তিনি আরও তিন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। 'বরসাত' এরই সাফল্যের পরে, 'বরসাত' ছবির ফ্রেম থেকেই সংস্থার লোগো তৈরী করা হল। এই লোগো এবার ব্যবহার করা হল আর কে ফিল্মসের সব ছবিতেই। যেমন আওয়ারা (১৯৫১), বুট পালিশ, জাগতে রহো এবং শ্রী ৪২০ । বলিউড তারকা মনোজ কুমার দাবি করেছেন যে লোগোটি ডিজাইন করেছিলেন বাল ঠাকরে ।

২

রাজের 'মেরা নাম জোকার' কি আত্মজৈবনিক? রাজ নিজের স্বীকার করেন এই ছবির মধ্যে রয়েছে তাঁর আত্মজীবিনীর নানা উপাদান। রাজ নিজের পরিচালিত ছবিতে অভিনয় 'মেরা নাম জোকার'-এরই শেষ। এরপর তিনি অভিনয় করেছেন অনেক ছবিতেই, কিন্তু নিজের পরিচালনার ছবিতে নয়। 'মেরা নাম জোকার' সেই দিক থেকে নিজের জীবনকে চলচ্চিত্রগত ফিরে দেখার এক চেষ্টাও। কলকাতা থেকে বোম্বাই আসার পর হিউজ রোডের নিউ এরা বয়েজ স্কুল-এ ভর্তি হন। সেখানে এক সুন্দরী শিক্ষিকাকে দেখে মুগ্ধ হন কিশোর রাজ। তখন তিনি টিন এজার। সেই বয়সেই তাঁর মধ্যে এই শিক্ষিকাকে দেখে যৌনতার অনুভূতি জাগে এটা প্রৌঢ় বয়সে এসে অনায়াসে স্বীকার করেন। সেই অনুভূতিই তো ফিরে আসে 'জেরা নাম জোকার'-এ সিমি গারওয়াল এপিসোডে। 'মেরা নাম জোকার'-এর মধ্যেই রয়েছে আত্মজৈবনিকতা। 'মেরা নাম জোকার'-এর গল্পটা অনেকটা এইরকম রাজু একজন পেশাদার-জোকার যে মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। তার জীবনে তিনজন নারী আসে, তিনজন নারীই তাকে পছন্দ করে, ছোটোবেলায় সর্বপ্রথম সে তার স্কুল-শিক্ষিকা মেরিকে কাপড় বদলানো অবস্থায় দেখে ফেলে, তাকে সে মনে মনে পছন্দও করে এবং তার ভালোবাসা পেতে চায়। মেরি তার প্রেমিক ডেভিডকে বিয়ে করলে রাজু মনঃক্ষুণ্ণ হয়। রাজু বড় হয়, জোকারগিরি করতে করতে এক সার্কাসে এক রাশিয়ান সুন্দরীর সঙ্গে তার

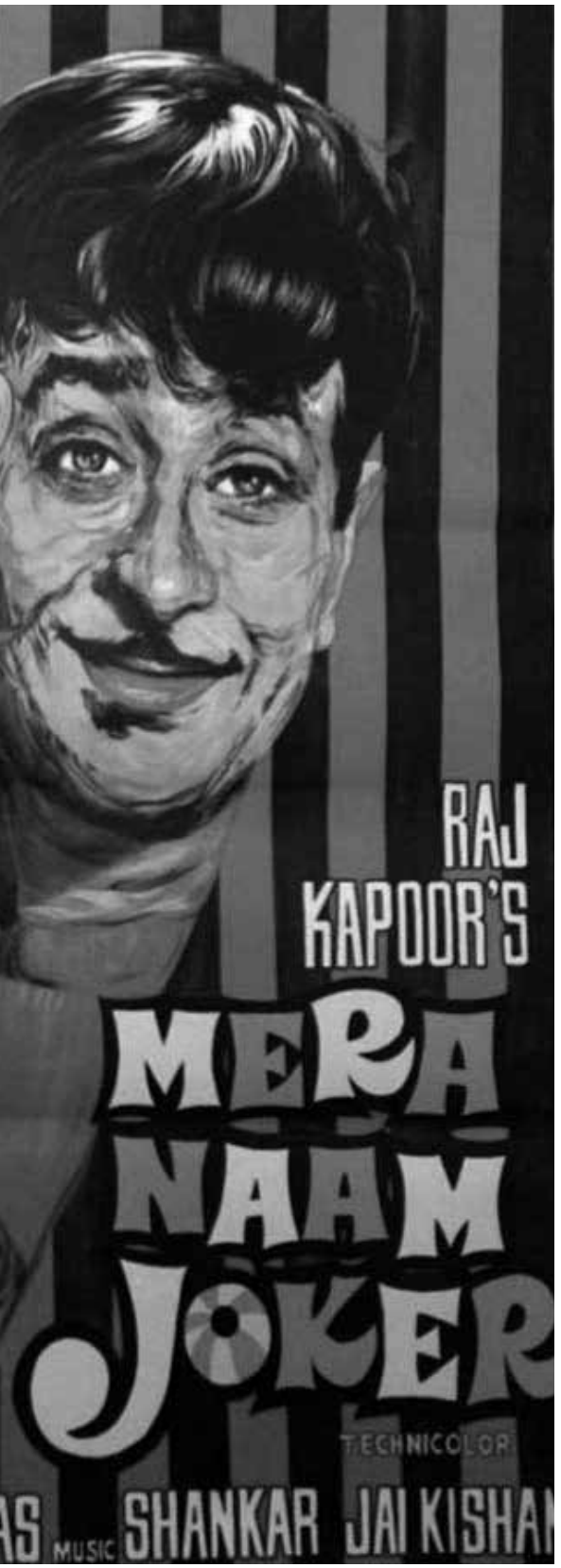

পরিচয় হয়, তার সঙ্গে বন্ধুত্বের এক পর্যায়ে তারা দুজন চুম্বনও করে, কিন্তু সার্কাসের মালিক মহেন্দ্র সিং রাজুকে বকা দিলে রাজুর আবার মনঃক্ষুণ্ণ হয়। রাজুর সঙ্গে এরপরে মুম্বইয়ের এক বস্তির মেয়ে মিনুর সঙ্গে পরিচিত হয়, এই মেয়েটির সঙ্গেও রাজুর সম্পর্ক বেশি দিন টেকে না। রাজু বুড়ো বয়সে তার জীবনে আসা তিনজন নারীকে তার সার্কাসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায় চিঠির মাধ্যমে এবং তারা সবাই রাজুর সার্কাস প্রোগ্রাম দেখতে আসে। সেদিনের সেই সাক্ষাৎকারে রাজ জানিয়েছিলেন , 'চলচ্চিত্রের রেফারেন্সে যদি ভাবেন তাহলে আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় আমি একজন জোকার। মেরা নাম জোকার।' রাজকাপুর প্রযোজক, রাজকাপুর পরিচালক, কিন্তু তিনি মনে করেন তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় রাজকাপুর এক জন জোকার। যে এন্টারটেইন করে দর্শকদের।

অভিনয় জীবন শুরু করার কিছুদিন পর থেকেই তিনি এই জোকার কনসেপ্টটা বেছে নেন। তার প্রধান অনুপ্রেরণা অবশ্যিই চ্যাপলিনের ট্রাম্প বা ভবঘুরে কিংবা রাজের ভাষায় জোকার। তাই ছবির নাম যেখানে মেরা নাম জোকার হয়, সেটা আত্ম আত্মজৈবনিক হয়ে ওঠায় বাধা কোথায়? 'মেরা নাম জোকার' ,এর পরে রাজের প্রযোজনা এবং পরিচালনায় তৈরি হয় 'ববি'। টিন-এজার লাভ স্টোরি। এই ছবিতে কোথাও রাজ কাপুর অভিনয় করেননি । এই ছবির নায়ক তাঁর পুত্র ঋষি কাপুর। নায়িকা নবগত ডিম্পল কাপাডিয়া। চলচ্চিত্রটির গল্প হল বোম্বে শহরের একজন অল্প বয়সী তরুণ এবং এক উঠতি বয়সী মেয়ের প্রেম কাহিনি । রাজ নাথ (ঋষি কাপুর) হচ্ছে এক বড় ব্যবসায়ীর ছেলে আর অপরদিকে ববি ব্র্যাগাঞ্জা (ডিম্পল কাপাডিয়া) একটা জেলের মেয়ে। রাজ তার বোর্ডিং স্কুল থেকে পাশ করে বাড়িতে আসে। বাসায় তার মা-বাবা তার জন্য জন্মদিনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাজ যখন ছোটো ছিল তখন ব্র্যাগাঞ্জা নামের এক মহিলা তার দেখাশোনা করত, রাজ তাকে আন্টি বলে ডাকত। মিসেস ব্র্যাগাঞ্জা রাজের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তার নাতি ববিকে নিয়ে আসে কিছুক্ষণের জন্য এবং ছোটোখাটো একটা উপহার দিয়ে চলে যায়। রাজের ববিকে দেখে ভালো লেগে যায় এবং সে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে বলে মনস্থির করে। রাজ মিসেস ব্র্যাগাঞ্জাদের বাসায় যায়। ববির সঙ্গে রাজের কথা হয়, ধীরে ধীরে বন্ধুত্বও বাড়তে থাকে।এই ছবিতেও রাজ কাপুরের ব্যক্তিগয় অতীত ফিরে আঙ্ম সে। ঋষি-ডিম্পলের প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটাই নির্মাণ হয় রাজ এবং নার্গিসের প্রথম দেখার দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করে। রাজের সঙ্গে নার্গিসের যখন প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অবিকল 'ববি'-র দৃশ্যের মতই হাতভর্তি ময়দা নিয়ে দরজা খুলেছিলেন। আবার ছোটবেলায় রাজ কাপুর খুব ছোলা ভাজা বা চানা খেতে ভালবাসতেন। টিফিনের পয়সা সরিয়ে তিনি এক সুন্দরীর কাছ থেকে ছোলা কিনতেন।কিশোর বয়সেই তিনি যৌন আকর্ষণ বোধ করতেন ঐ ছোলাওয়ালীর প্রতি।এই ছোলা রেফারেন্সও ফিরে আসে 'ববি'-তে।ঋষি ববি তথা ডিম্পলকে বলে, চলো একটু চা খেয়ে আসা যাক। ডিম্পল তখন ঋষিকে বলে, চা নয় চলো চানা খেয়ে আসি। চানা মানে ছোলা। এইভাবেই অতীত ফিরে ফিরে আসে রাজের শেষের দিকের ছবিগুলোতে। এবং যৌবনের যৌনতাও।

ববিদের আর্থিক অবস্থা রাজদের চেয়ে অনেক খারাপ হওয়ায় রাজের মা-বাবা চায় না যে রাজ ববির সঙ্গে মিশুক। এটা নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়। যদিও সিনেমার শেষের দিকে ববি আর রাজের সম্পর্কটাকে তাদের অভিভাবকেরা ইতিবাচকভাবেই দেখে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রসঙ্গে রাজ কাপুর নিজের প্রসঙ্গে বলতেন, 'আমার শিক্ষাগত ড্রিগ্রি হল এম এ বি এফ। ম্যাট্রিক অ্যাপিয়ার বাট ফেল।' পড়াশুনায় বেশিদূর এগোননি।কিশোবয়স পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন বোম্বাই ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রি-তে। অভিনেতা হিসেবে নন, টেকনিসিয়ান হিসেবেই। সেই সময় মাটির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ফিল্ম নির্মাণের খুঁটিনাটি শিখেছেন।সেই প্রাথমিক কাজ থেকে ফিল্ম পরিচালনা এডিটিং ইত্যাদি। তখন আর রাজ কাপুরের বয়স কত? আঠারোর কাছাকাছি হবে। ভাইদের মধ্যে তিনিই প্রথম ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রির সঙ্গে জড়ান। বাবা পৃথীরাজ কাপুর বিয়ে করেছিলেন খুব কম বয়সেই। কুড়ি বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় রামসরনী দেবীর সঙ্গে। পৃথ্বীরাজের ছয় সন্তান---পাঁচ পুত্র, এক কন্যা। যথাক্রমে---রাজকাপুর, দেবেন্দ্র কাপুর,বিন্দি কাপুর,শাম্মী কাপুর,উর্মিলা,ও শশী কাপুর।রাজ কাপুরের পাশাপাশি তাঁর আরও দুই ভাই শাম্মী এবং শশীও চলচ্চিত্রের জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।পৃথ্বীরাজ ক্রমে বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতে প্রভাবশালী হয়ে উঠছিলেন।আর রাজ কাপুর সিনেমা জগতে এসে সেই প্রভাবকে সম্বল করে ক্রমেই বোম্বাইতে গড়ে তুললেন রাজ সাম্রাজ্য। খুব সহজ ছিল না ব্যাপারটা। তবে প্রথম থেকেই চলচ্চিত্র জগতে রাজ-সাম্রাজ্য তৈরি করার কথা মাথায় রেখেছিলেন।

৩

রাজের প্রথম থেকেই স্বপ্ন ছিল পরিচালক হবেন। সেইমত চলচ্চিত্রের সমস্ত খুঁটিনাটি শিখে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। এই সাত বছর তিনি ফ্লোর ঝাঁট দেওয়া, ট্রলি বয়, লাইট বয় নিয়ে আসা ইত্যাদি থেকে শুরু করে ক্রমে লাইটিং, এডিটিং, ইত্যদি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগেও তিনি কাজ শেখেন। স্কুল ছাড়ার পর বাবা তাকে জিজ্ঞেস করেন এখন কী করবে ঠিক করেছ ? তার দ্বিধাহীন জবাব থাকে, আমি ছবি পরিচালনা করব। বাবা পৃথ্বীরাজ বলেন, চলচ্চিত্র পরিচালনা করতে হলে চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে তো শিখতে হবে , জানতে হবে।

তখন কোনো চলচ্চিত্র শেখার জন্যে স্কুল ছিল না। বাবার সঙ্গে থিয়েটারে কাজ করেছেন তিনি। কারিগরি কাজে সহায়তা ছাড়াও মাঝে মধ্যে ছোট কোনো ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন।কিন্তু কলকাতার চলচ্চিত্রে একবার ছোট ভূমিকায় অভিনয় করা ছাড়া সেই অর্থে তার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। তাই বাবা বললেন, তোমাকে চলচ্চিত্র শিখতে হলে স্টুডিও গিয়ে শিক্ষানবিশী করতে হবে। বাবার কথা বেশ মনে ধরে রাজকাপুরের। তিনি টানা তিন বছর শিক্ষানবিশী করেন বিভিন্ন স্টুডিও-তে। তারপর পরিচালক কেদার শর্মার সহকারী পরিচালক হয়ে ওঠেন। আর এই কেদার শর্মাই তাকে বোম্বাই ফিল্ম জগতে অভিনয়ে নিয়ে আসেন। ইন্ড্রাস্ট্রিতে প্রায় তিনি বছর তিনি পরিচালক কেদার শর্মার সহকারী হিসেবে কাজ করেন। চোখে স্বপ্ন -- নিজে ছবি পরিচালনা করবেন। কিন্তু সেই সুযোগ আসার বদলে সুযোগ এল অন্য। পরিচালনা নয় বরং ছবিতে অভিনয়ের।পরিচালক কেদার শর্মা তাকে তাঁর ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার অফার দিলেন। অভিনেতা হবার ইচ্ছে খুব একটা রাজের মধ্যে ছিল না। তার লক্ষ্য তো একটাই। কিন্তু বাবা পৃথ্বীরাজ বললেন, এই সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না। রাজি হয়ে গেলেন রাজ কাপুর। মনে মনে বললেন, অভিনয়ের সরাসরি শিক্ষানবিশীটা বাদ ছিল সেটা সরাসরি হয়ে যাক। অবশ্য কেদার শর্মার ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার আগে তিনি ছোটোখাটো অভিনয় যে করেননি তা নয়। ১৯৩৫-এর সেই শিশু-অভিনেতা হিসেবে 'ইনকিলাব' ছবির কথা বাদ দিলেও বোম্বাই ফিল্ম দুনিয়ায় নায়ক হবার আগে অন্তত তিনটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তিনি ভারতীয় সিনেমার নায়ক হয়ে উঠলেন ১৯৪৬ সালে। 'নীলকমল'। স্বাধীনতার ঠিক একবছর আগে। নায়ক হিসেবে রাজের এই প্রথম ছবিতে দুই নায়িকা---মধুবালা এবং বেগম পারা। অবশ্যই শেষ অবধি এক নায়িকা মারা যাবেন। সেই অর্থে মধুবালাই হলেন রাজকাপুরের প্রথম নায়িকা। ১৯৪৭ সালে তিনি আরও তিনটি ছবি করেন---'জেল যাত্রা', 'দিল কি রানি' এবং 'চিতোর বিজয়'।এই খান সাতেক ছবিতে অভিনয়ের পরেও মনের দিক থেকে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না রাজ কাপুর। ভারতের স্বাধীনতার পরেই ঠিক করলেন এবার এই পুরোনো স্বপ্নে ফিরে যাবেন। পরিচালক হবেন। কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি সিদ্ধান্ত নিলেন যে ছবি পরিচালনার পাশাপাশি ছবি পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবির নায়কও হবেন তিনি। অন্য কোনো প্রযোজকের টাকায় কাজ করলে মনের মতো কাজ করতে পারবেন না তিনি। তাই নিজেই নিজের ছবির প্রযোজনা করার জন্যে তৈরি করলেন নিজের প্রযোজনা সংস্থা আর কে ফিল্মস।এবং এই আর কে ফিল্মসের প্রথম ছবি 'আগ'।

৪

নায়ক হিসেবে রাজকাপুর খুব যে প্রতিষ্ঠিত এমন নয়। তাই প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন যে হিন্দি ছবির কোনো প্রতিষ্ঠিত নায়িকাকে নিয়েই ছবি করবেন। প্রথমে ঠিক করেন নায়িকা করবেন মধুবালা-কে। কিন্তু চিত্রনাট্য লেখা হয়ে যাবার পর মনে হল একটা নিষ্পাপ মুখ দরকার। মধুবালার মুখ সন্দেহহীন ভাবে সুন্দর কিন্তু কোথায় যৌনতার ছোঁয়া রয়েছে। তখন মনে পড়ল নার্গিসের কথা। নার্গিসের সঙ্গে তখনও মুখোমুখি দেখা হয়নি রাজকাপুরের। সিনেমায় দেখেছেন। ঠিকানা জোগাড় করে নার্গিসের বাড়ি চলে গেলেন তিনি। নার্গিস নিজেই দরজা খোলেন। সেই দৃশ্যের রিপ্লে দেখি 'ববি' ছবিতে। ডিম্পল আর ঋষিকাপুরের প্রথম দেখা হবার দৃশ্যে। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। সেই রাজ-নার্গিসের প্রেমের শুরু। নার্গিস রাজের ব্যক্তগত জীবনে ও ফিল্মে এক বড় ভূমিকা পালন করেছেন। রাজ প্রসঙ্গে আশ্বু লোচনায় নার্গিসের জীবন অবশ্যই আসা দরকার।

নার্গিস প্রেমিকা ও মা। দুটো ইমেজেই তিনি সমান সফল। তাই বা বলি কী করে ? সিনেমা-মায়ায় যিনি হৃদয় কাঁপানো প্রেয়সী, বাস্তবে তিনিই তো আবার ব্যর্থ প্রেমিকা। আবার মাতৃ-ইমেজে তিনি সত্যিই মাদার ইণ্ডিয়া। রাজকাপুরকে তিনি যেমন প্রেম দিয়েছেন তেমনি স্নেহও দিয়েছেন। সেটা মাতৃকল্প স্নেহই। তিনি রাজকাপুরের নীলচোখের প্রেমে পড়েছিলেন। বুঝেছিলেন মানুষটার মধ্যে কোথাও এক অতৃপ্তি আছে । যদিও রাজকাপুর তখন বিবাহিত। পাগলের মতো ভালোবেসেছিলেন

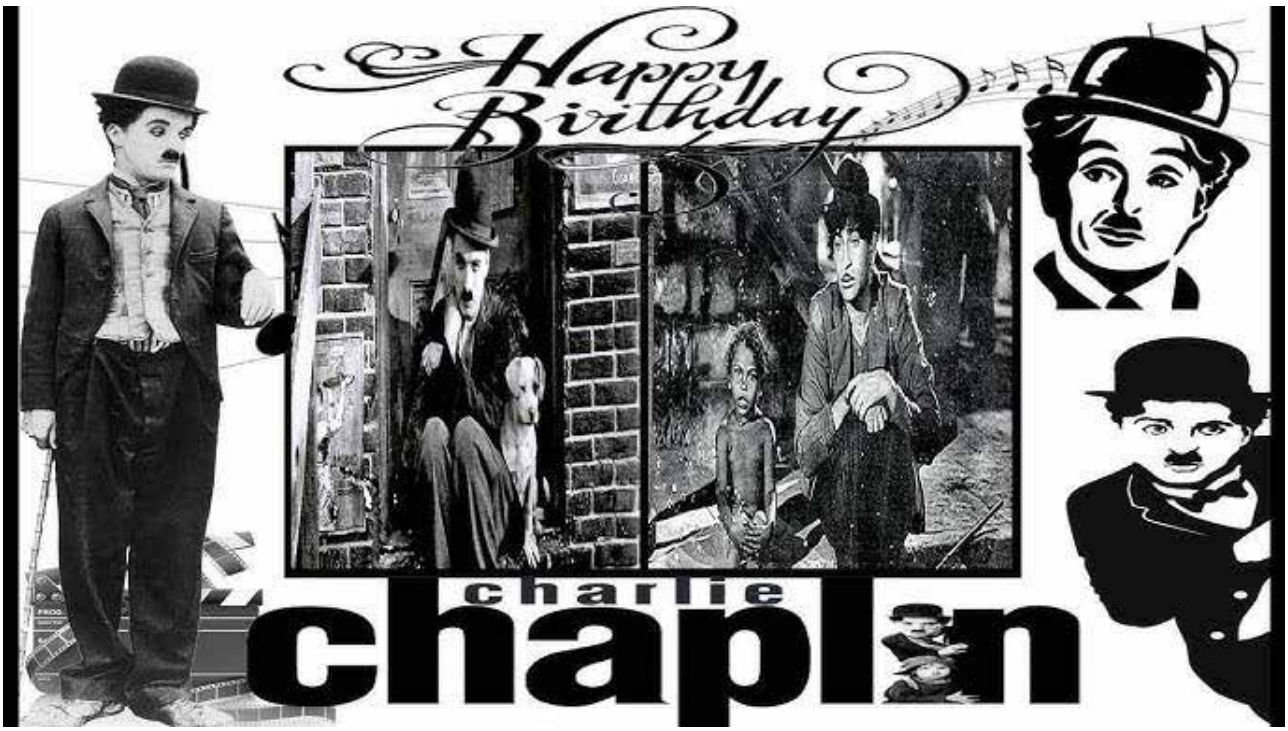

রাজকাপুরকে। কিন্তু রাজকাপুর তাঁকে ঠকান। জীবনের প্রথম প্রেমে ঠকে গিয়ে তিনি জীবনের কাছে হার মানেননি। বরং যৌবনে প্রেমের প্রত্যাখ্যান তাকে আরও বেশি জীবনের কাছে নিয়ে এসেছে। হয়ে উঠেছেন ভারতীয় সিনেমার মাতৃকল্প।

এদিকে পঞ্চাশের দশকে হিন্দি সিনেমার প্রেমের প্রতীক মানে নার্গিসই। তিনি তখন যেন ভারতীয় সিনেমার মেরলিন মনরো বা গ্রেটা গার্বো। আমাদের সিনেমার নায়িকা-ইতিহাসে একমাত্র দেবিকারানির সঙ্গেই তুলনীয় তিনি। দেবিকা ও নার্গিস; দুই নারী, দুই সময়। অভিজাত এক বংশের আভিজাত্য নিয়ে সিনেমায় এসেছেন দেবিকারানি, পেয়েছেন কাছে হিমাংশু রায়ের মতো সিনেমা বিশেষজ্ঞকে। কিন্তু নার্গিস তো সেই বংশ পরিচয়ের সূত্র পাননি বরং পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর কাছের মানুষ ? জীবনের প্রথম কাছের মানুষটাই করে বিশ্বাসাতকতা। যাকে যৌবনে ভালবেসে দেহ-মন সব দিয়েছিলেন তার কাছ থেকে পান চরম আঘাত। সেই আঘাত কিন্তু তাঁকে ভেঙে ফেলতে পারেনি। জীবনের গতি হয়তো পরিবর্তন হয়েছে তাঁর। কিন্তু সেই সূত্রেই পেয়েছেন নানা সম্মান। সম্পর্ক তৈরি হয়েছে নেহেরু পরিবারের সঙ্গে। বন্ধুস্থানীয় হয়েছেন ইন্দিরা গান্ধীর। পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছেন, হয়েছেন ইমপা'। তির সভাপ বিষয়ে সত্যজিৎ রায়ের ছবি নিয়ে 'পথের পাঁচালি' মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। এ সবই তো আমরা জানি। মৃত্যুর আগে তাঁর পরিচয় সফল অভিনেতা সুনীল দত্তের স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্রের জননী। পুত্র সঞ্জয় দত্ত হিন্দি সিনেমার অন্যতম নায়কও।

সিনেমায় যখন শব্দ এল তখন নার্গিসের বয়স দুই। তখন তিনি অবশ্য নার্গিস নন, তখন তার নাম ফতিমা আব্দুল রশিদ বা তেজেশ্বরী মোহন। প্রথমটা মুসলিম নাম, দ্বিতীয়টা হিন্দু। ফতিমা বা তেজেশ্বরীর মা মুসলিম, বাবা হলেন গোঁড়া হিন্দু পরিবারের। প্রথম নামটা মায়ের দেওয়া, দ্বিতীয়টা বাবার। ফতিমার জন্ম কলকাতায়, ১৯২৯-এর ১ জুন। যে বছর দেবিকারানিকে নিয়ে হিমাংশু রায় জার্মান পরিচালক অস্টেনের সঙ্গে তৈরি করছেন 'এ থ্রো অফ ডাইস'। যে বছর গ্রেট ডিপ্রেশন; ওয়াল স্ট্রিটের স্টক মার্কেট ভেঙে পড়ছে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে অর্থনৈতিক মন্দা। এলাহাবাদ থেকে আসা কলকাতার এক কোঠাওয়ালি। গানের গলায় বুলবুল, রূপে অপরূপা। সেই সময় মোহনচাঁদ নামে এক যুবক পাঞ্জাবের রাউলপিণ্ডি থেকে কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার প্রাথমিক কোর্স করতে এসেছিল। ঠিক ছিল, এই পড়া শেষ করে সে পুরোপুরি ডাক্তারির জন্যে চলে যাবে ইংলন্ড। নেহাতই বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একদিন কলকাতায় বাঈজি পাড়ায় গিয়েছিল। পৌঁছেছিল জদ্দনবাঈয়ের কোঠায়। তার নাচ দেখে এবং গান শুনে মোহনবাবু প্রথমদিনই ঠিক করে নেয় পৃথিবীতে যদি বাঁচতে হয় এই নারীর সঙ্গেই বাঁচব। নচেৎ নয়। মা-বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেয় ডাক্তারি পড়ার জন্যে আর ইংল্যান্ডে যাচ্ছে না, জদ্দনবাঈকে বিয়ে করে কলকাতাকেই বা ভারতেই থাকছে।

আর জদ্দনবাঈ ? এই ২৭ বছর জীবনে অনেক পুরুষ দেখেছেন। কিন্তু তারা তো শুধু আঁধার রাতের ভ্রমর। কিন্তু এই যুবক অদ্ভুত। তার প্রেমের জন্যে সে জীবনটা বাজি রাখছে। এখানে আত্মসমর্পণ না করে কি কোনো উপায় আছে? কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়, জদ্দনবাঈ বিবাহিত। দুই সন্তানের জননী তার ওপর মুসলিম। হিন্দুর সঙ্গে তার

বিয়ে কি করে সম্ভব? বিবাহিত বা সন্তানের জননীটা কোনো সমস্যা হিসেবে দেখলেন না মোহনবাবু। আর হিন্দু মুসলিম সমস্যাটাও এক নিমেষে সমাধান; মোহনবাবু মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে বিয়ে করলেন বাঈজিকে।

একদিকে মোহনবাবুর প্রেম, অন্যদিকে গায়ক সায়গলের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা, কোঠাওয়ালি জদ্দনবাঈকে করে তুলল এক নম্বর শিল্পী। তিনি লাহোরের প্লেয়ার অ্যান্ড ফোটোফোন কোম্পানির নিয়মিত গায়িকা হয়ে উঠলেন। একের পর এক রেকর্ড বেরল তাঁর। এরপর তিনি মুম্বাই এসে জড়িয়ে গেলেন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে। হয়ে উঠলেন অভিনেত্রী ও ভারতীয় সিনেমার প্রথম নারী সঙ্গীত পরিচালক। ছবির নাম 'তালাশে হক'।

এই মায়েরই মেয়ে ফতিমা বা তেজেশ্বরী কিংবা পরবর্তীকালের নার্গিস। চার বছর বয়সে প্রথম সিনেমায় নামেন নার্গিস। মা নায়িকা, সঙ্গীত পরিচালক, মায়ের লেখা গল্প, তাতে ছোট ভূমিকায় তিনি। ছবি; 'তালাশে হক'। ছবির জন্যে তার নতুন নাম বেবি রানি। ওই একটাই। মা বা বাবা কেউই আর চান না মেয়ে সিনেমায় নামুক। বরং পড়াশুনা করানোর দিকেই তাঁদের বেশি নজর। আর সেই মুম্বাইয়ের এক নম্বর স্কুল কুইনমেরি-তে। নিজে সিনেমা জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে থাকলেও মেয়েকে সেই জগত থেকে সবসময়ই দূরে রাখতে চাইতেন। বালিকা বয়স থেকেই সিনেমার নায়িকা হবার অফার পেতে শুরু করেন মেয়েটি। মা-ই আটকে রাখেন। সিনেমা থেকে যত দূরে রাখা যায়। বাবার অপূর্ণ স্বপ্ন পূর্ণ করবে মেয়ে; ফতিমা ডাক্তার হবে। কিন্তু তা হল না। হলে তো আমরা কিংবদন্তী নার্গিসকে পেতাম না। তাই বোধহয় সেই সময় বিধাতা একটু অলক্ষ্যে হেসে পাঠালেন সেই সময়ের মুম্বাই সিনেমার মুভি-মোঘলকে। জদ্দন নয়, কন্যা ফতিমাকে দেখেই সেই মুভি মোঘল জানালেন তাঁর আগামী ছবির নায়িকা হবে এই ফতিমা। তাঁর কথা অমান্য করার মত মনের জোর ছিল না জদ্দন বাঈয়ের। কেননা এই মুভি-মোঘলের নাম মেহবুব খান। তাঁর কথাকে অমান্য করবে ইন্ডাস্ট্রিতে বোধহয় তখন তেমন কেউ ছিল না। ফতিমা নয়, বেবি রানিও নয়। মেহবুব খান তাঁর নবাগতা নায়িকার নামকরণ করলেন নার্গিস।

ম্যাটিনি আইডল চন্দ্রমোহন ও মতিলালের বিরুদ্ধে একা পঞ্চদশী নার্গিস। মেহবুব খানের দুরদর্শীতা ছিল, প্রথম আবির্ভাবেই মুম্বাই সিনেমা জগতকে কাঁপিয়ে দিলেন তিনি। 'তকদীর' ছবি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে একটাই নাম ; নার্গিস , নার্গিস। বার্নার্ড শ-এর 'পিগমেলিয়ন' নাটকের আদলে তৈরি করা হয়েছিল 'তকদীর'। নায়িকা কেন্দ্রিক ছবি। 'তকদীর' ছবিতে সর্ব অর্থেই প্রধানা হয়ে উঠলেন নার্গিস। ভিনি ভিডি ভিসি। যেন এলেন দেখলেন জয় করলেন। সত্যিই, এরপর আর নার্গিসকে পেছনে তাকিয়ে দেখতে হয়নি। চারদিক থেকে নতুন ছবির ডাক। নার্গিসের সৌন্দর্যই হয়ে উঠল নার্গিসের সৌভাগ্য। ক্যামেরার প্রেমিকা যেন তিনি। যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি সুন্দর। আর অদ্ভুত নিষ্পাপ চাহনি। ভ্রূপল্লবে যেন এক কিসের আহ্বান। সেটা যেন শুধু যৌনতা নয়, বরং প্লেটনিক এক ভাবনা তার চোখে। তিনি কোনো কারণেই নিছক 'সেক্স-সিম্বল' হয়ে ওঠেন না। তবে যৌনতা তার অভিনয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে। যেমন তিনি হিন্দি সিনেমায় প্রথম আমদানি করেন হলিউড স্টাইল। যখন সমস্ত নায়িকাদের বড় চুলের ঢল, তখন তিনি চুল কাটেন হলিউড স্টাইলে ছোট করে। কিন্তু অন্ধভাবে অনুসরণ না করে বরং হলিউড স্টাইলের ভারতীয়করণ করেন। 'তকদীর' ছবির পরের বছরেই, ১৯৪৪- এ মুক্তি

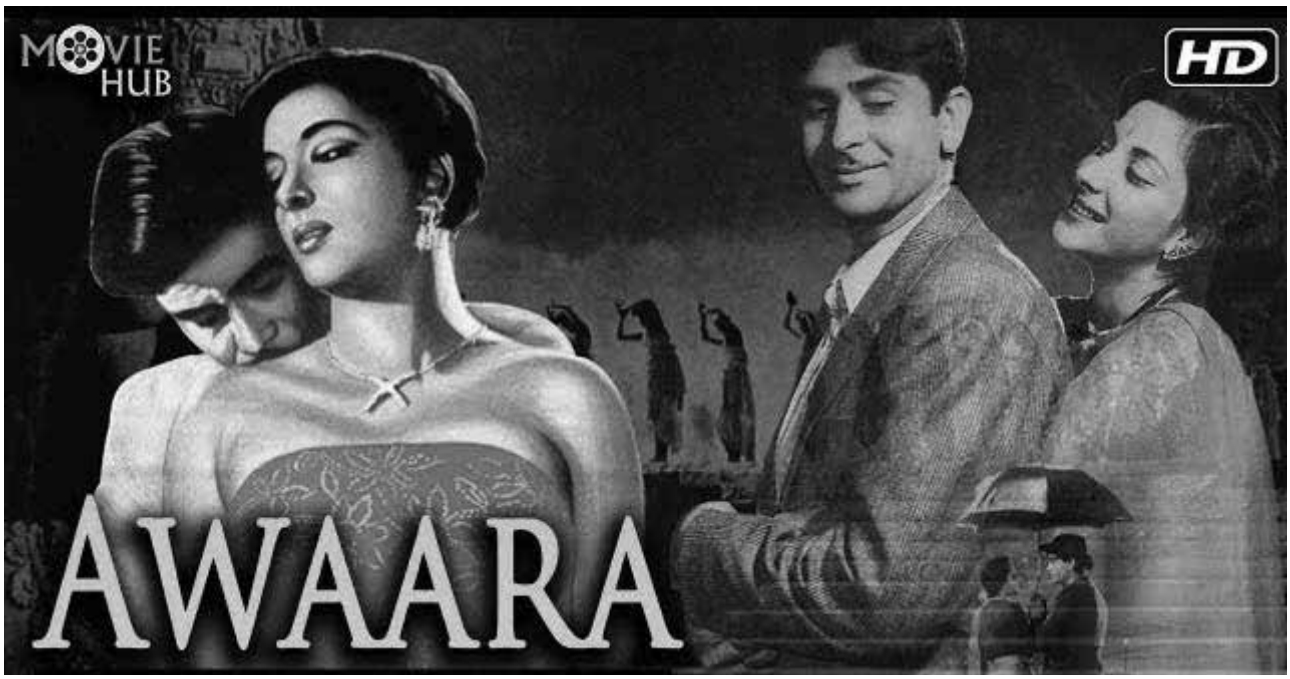

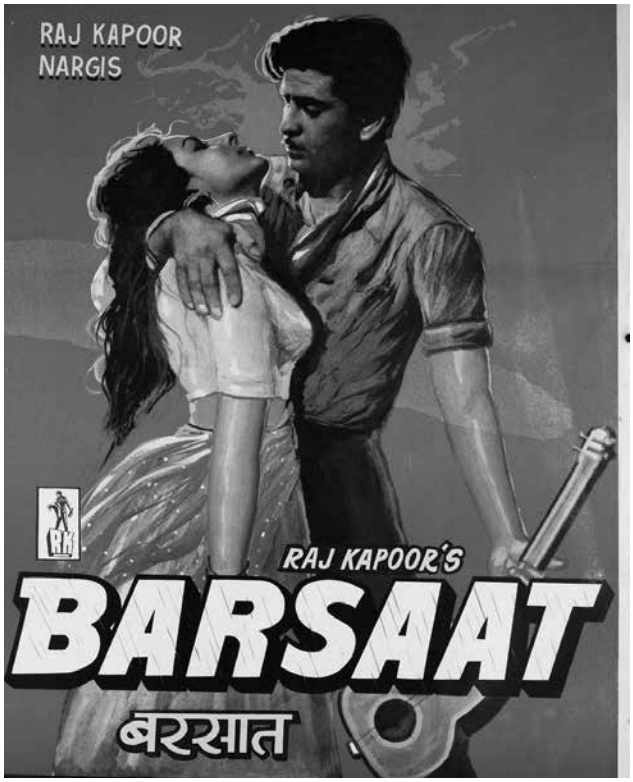

পায় 'ইসমাৎ'। ফাজলি ব্রাদার্সের ছবি। নায়ক হলেন মেহতাব। এই ছবি অবশ্য 'তকদীর'-এর মত জনপ্রিয়তা পায় না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নার্গিস তাঁর অভিনয় ও সৌন্দর্যের যথেষ্ট প্রশংসা পান। তবে নার্গিসের গ্লামারের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে এর পরের ছবি 'হুমায়ুন'-এ। ছবির পরিচালক আবার মেহবুব খান-ই।

'হুমায়ুন' ঐতিহাসিক ছবি। তৎকালীন সুপারহিট নায়ক অশোককুমারের বিপক্ষে তাঁর প্রথম অভিনয়। সেটা কথা নয় ! 'হুমায়ুন' ছবি থেকেই 'নার্গিস' হয়ে উঠলেন 'ঘটনা'। যাকে বলে ফেনোমেনন। দেখা যাক, কী কী বিশেষ উপাদানের জন্য তৎকালীন আর পাঁচজন নায়িকা থেকে নিজেকে আলাদা করে তিনি হয়ে উঠলেন 'ঘটনা'। প্রশংসা ও বিতর্কের মুখোমুখি।

অবশ্যই আগেই বলেছি, তাঁর সাফল্যের প্রথম উপাদান তাঁর মুখ। ভারতীয় চলচ্চিত্রে এমন ফটোজিনিক মুখ তখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে নার্গিসের ছবি তুলে দেখা গেছে তাঁর মুখের স্বাভাবিক আবেদন ও লাবণ্য কোনোভাবেই কমে না। তাঁর ওই মুখটিকে এই জন্যেই নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন একের পর এক পরিচালক। তাঁর অতি সুন্দর কপাল, ভরপুর টানা টানা চোখ, নিখুঁত কিঞ্চিৎ উন্নত নাক, তাঁর ঠোটের বিষণ্ণ ডৌল, তাঁর উজ্জ্বল সুঠাম দাঁতের সারি; এইসব কিছু বক্স-অফিসের পক্ষে যে কত প্রয়োজনীয় হতে পারে তা নার্গিসের চলচ্চিত্রে ৩২ বছর ধরে আমরা দেখেছি। 'মেহেন্দী', 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট', 'অঞ্জুমান' , ''আনোখী প্যার' ইত্যাদি ছবির কথা মনে এলেই প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নার্গিসের মুখ। ওই মুখের এমনি অপ্রতিহত আবেদন এই অনেক কিছুর যথার্থ মিলন ছাড়া সম্ভবই হত না। নার্গিসের স্ক্রিন প্রেজেন্স বা পর্দায় উপস্থিতির সম্মোহন। আর এই নার্গিসের বেশিরভাগ ছবিতেই তাঁর মুখের 'ক্লোজ আপ'-এর ছড়াছড়ি। রাজকাপুর বা সুনীল দত্ত প্রসঙ্গে আমরা আসছি। তার আগে এটা বলা দরকার, সমসাময়িক সমস্ত উল্লেখ যোগ্য নায়কের সঙ্গেই অভিনয় করেছেন নার্গিস। তার মধ্যে রয়েছেন দিলীপকুমার, অশোককুমার, জয়রাজ, দেব আনন্দ, শ্যাম, ভরতভূষণ, প্রদীপকুমার, নাসির খান প্রমুখ হিন্দি সিনেমার বাঘা বাঘা নায়কেরা। এই সমস্ত সুপারহিট নায়কদের সঙ্গে কাজ করার সময়ও কিন্তু দর্শকমধ্যে তিনি সবসময়ই ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন তাঁর সৌন্দর্য--- গ্ল্যামারের চুম্বক আকর্ষণ।

সুচিত্রা-উত্তম সুপারহিট জুটির সঙ্গে নার্গিস-রাজকাপুর জুটির একাধিক মিল থাকলেও একটাই অমিল--- ব্যক্তিগত জীবনে সুচিত্রা-উত্তম প্রণয়ী-প্রণয়িনী ছিলেন না, কিন্তু রাজ- নার্গিস ছিলেন। প্রথম দর্শনেই নার্গিসের প্রেমে পড়েছিলেন রাজকাপুর। সময়টা ১৯৪৭-৪৮ সাল।

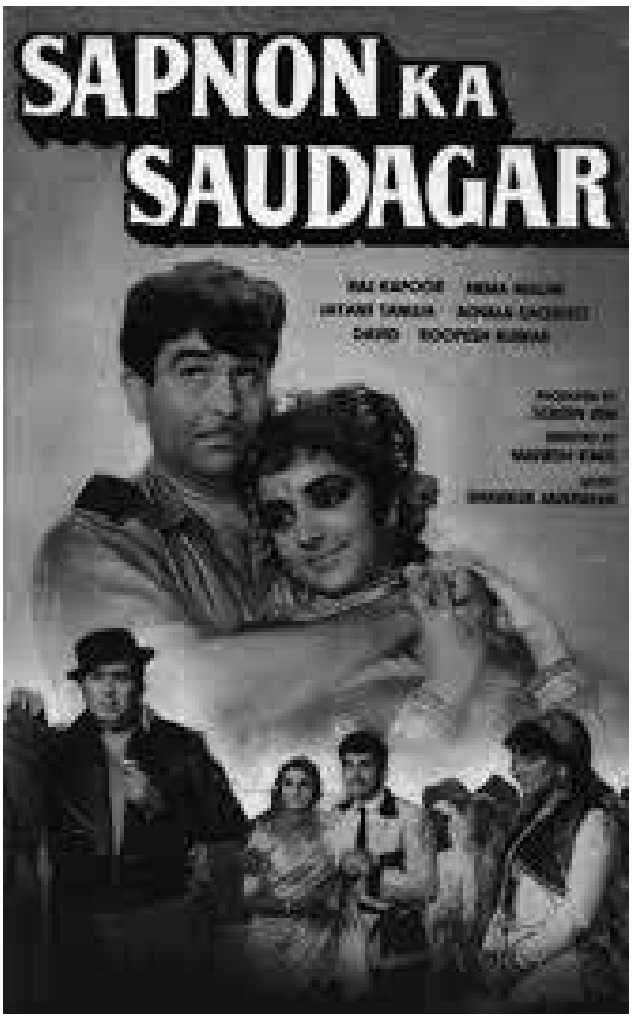

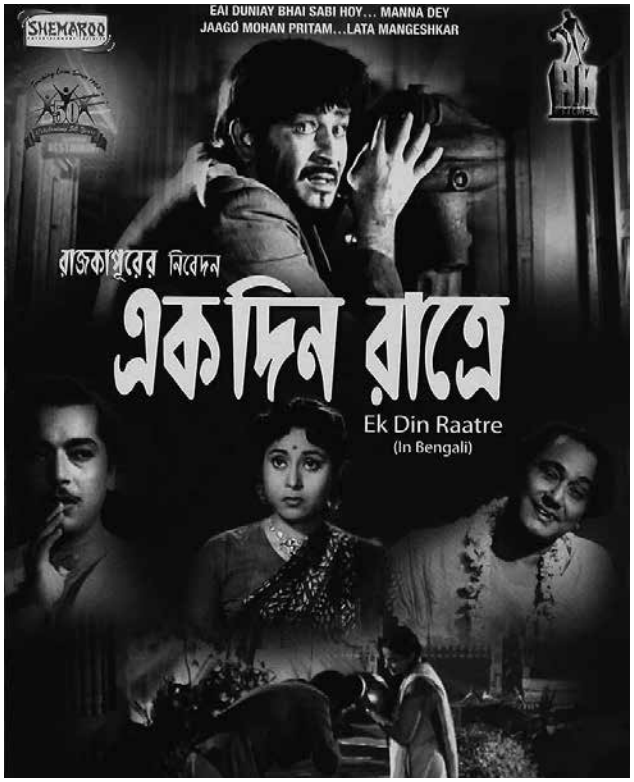

রাজকাপুর তাঁর 'আগ' ছবিটি তৈরি করার জন্য স্টুডিও খুঁজছিলেন। তিনি শুনেছিলেন যে জদ্দনবাঈ তাঁর 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' ছবিটি তৈরি করছেন মুম্বাইয়ের 'মহালদী'-র কাছে ফেমাস স্টুডিওতে। সেই ব্যাপারে কথা বলতে রাজ গিয়েছিলেন জদ্দন-এর বাড়িতে। দরজা খুলেছিলেন নার্গিস। অবিকল কি ঘটেছিল সে দৃশ্যকে পর্দায় অমর করে রেখেছেন রাজকাপুরই । 'ববি' ছবিতে ঋষিকাপুর-ডিম্পলের মোলাকাত স্মরণ করুন। মন্ত্রমুগ্ধ রাজকাপুর। দরজায় নার্গিস। প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে গেলেন এমনই যে 'আগ' ছবির নির্ধারিত নায়িকাকে সরিয়ে নার্গিসকেই নায়িকা করলেন তিনি। সেই শুরু শুধু পর্দায় নয়, বাস্তবেও প্রেম। একদিকে রাজ-নার্গিস জুটি মানুষের ভাল লেগে গেল। অন্যদিকে নার্গিস হয়ে উঠল রাজকাপুরের জীবনে শরীরী উৎসবের মতো। আর কে স্টুডিওতে চলে প্রেম-লীলা। নার্গিসের জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষ ঘটালেন নব উদ্ঘাটন। নার্গিস ক্রমশই তাঁর রোমান্টিক প্রেম নিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন রাজকাপুরকে। পাশাপাশি 'আন্দাজ', 'বরসাত', 'আওয়ারা', 'আহ্', 'শ্রী ৪২০'। একের পর এক রাজ-নার্গিস জুটির ছবি সুপারহিট। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬। এই সময় ক্লাসিক্যাল হিন্দি সিনেমার স্বর্ণযুগে রাজ-নার্গিসের সোনার জুটি বক্স- অফিসে ম্যাজিকের মত কাজ করেছে। নার্গিস আর নিজেকে আটকে রাখছেন না রোমান্টিকতার মধ্যে বরং তিনি নিয়ে এলেন অকপট সেক্সুয়ালিটি; ভারতীয় সিনেমায় সেই প্রথম ; সুইমিং কস্টুম বা পুরো নগ্নতার ইঙ্গিতময়তা নিয়ে অভিনয় করছেন তিনি। 'আওয়ারা' ছবিতে তিনি সনাতন মূল্যবোধ, অন্যায়বোধকে ভেঙে পাশ্চাত্য সৌন্দর্য ধারণার প্রশ্রয় দিলেন। 'সিংগিং ইন দ্য রেন'-এর আদলে এক ছাতার তলায় বৃষ্টিস্নাত হয়ে নায়ক রাজের সঙ্গে গান গাইলেন। রাজের জন্যে তিনি সব করতে পারেন। রাজও তখন প্রেমমগ্ন নার্গিসের। রাজ আর নার্গিস মোট ষোলটা ছবি করেছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আগ', 'আন্দাজ', 'বরসাত, 'আওয়ারা', 'প্যার', 'জান পহেচান', 'আহ', 'ধুন', 'পাপি', 'শ্রী ৪২০', 'চোরি চোরি' ও 'জাগতে রহো। ছবিগুলো যে সবকটি রাজ কাপুরদের নিজের ব্যানার 'আর কে ফিল্মস'-এর তৈরি তা নয় বা সবকটি ছবিই যে বক্স অফিস সফল এমনও নয়। তবে এটা এককথায় বলা যায় ভারতীয় সিনেমার রোমান্টিক যুগ পরিণতি পেয়েছে রাজ-নার্গিস সোনার জুটির মধ্যেই। এই সোনার জুটির রসায়নই সেই সময়কে করে তুলেছে হিন্দি সিনেমার স্বর্ণযুগ। কিন্তু রাজ-নার্গিসের প্রেম পরিণতি পেল না। প্রথমত রাজকাপুর আগেই বিবাহিত, দুই সন্তানের জনক। দ্বিতীয়ত রাজ হিন্দু, নার্গিস মুসলিম। তাই নিয়ে নানা বাধা। রাজের জীবনে পারিবারিক অশান্তি চারিদিকে ওলোটপালোট ;মনের দিক থেকে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন রাজকাপুর। নার্গিস ভাবতে পারেন না রাজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবেন। যে মানুষটির জন্যে সর্বস্ব দিয়েছেন তিনি, তাঁর আজ এ কি ভূমিকা, বুঝলেন তার শরীরী আকর্ষণের মধ্যেই জড়িয়ে আছে মানস বিপর্যয়ের বীজ; যেমন হয়তো ছিল মেরলিন মনরোর। কিন্তু আত্মহত্যা ? অসম্ভব, জীবন তার কাছে অনেক প্রয়োজনীয়। রাজ-বিহীন জীবনটাকে তাই অনিবার্য হিসেবেই বেছে নিলেন নার্গিস। কিছুকাল অপেক্ষা, তারপর আবার নিজের জীবনের পথ নিজেই বেছে নিলেন তিনি।

সোনার জুটি ভেঙে গেল ১৯৫৬-এ। শেষ ছবি 'চোরি চোরি'। এরপর কি আর নার্গিস রাজকাপুরের সঙ্গে ছবি করেছেন ? হ্যাঁ, আর একটাই, সেই বছরেই পুরনো স্মৃতি মনে রেখে 'জাগতে রহো' ছবিতে নিছক অতিথি শিল্পী হিসাবে কাজ করেছিলেন। রাজকাপুরের বড় পছন্দের ছিল সাদা রঙ। তাই নার্গিস তাঁর চলচ্চিত্র জীবনে বেশির ভাগই সময়ই ব্যবহার করেছেন সাদা পোশাক। এই জন্যে তো ইন্ডাস্ট্রিতে নার্গিসের নামই হয়ে গিয়েছিল; 'লেডি ইন হোয়াইট'। সোনার জুটির শেষ ছবি হিসেবে যদি আমরা 'জাগতে রহো'-কে ধরি তাহলে এই ছবিতে নার্গিসের ভূমিকাটি বেশ সিম্বলিক। শেষ দৃশ্যে চরম পিপাসার্ত রাজকাপুরকে পানীয় জল দেন নার্গিসই। সেই শেষ। স্বাভাবিকভাবেই জীবনবিমুখ হননি। এই সময় যে মানুষটির কাছ থেকে সবচেয়ে আশ্বাস ও অনুপ্রেরণা পেলেন তিনি হলেন সেই মেহবুব খান। যিনি একদা কিশোরী ফতিমাকে সিনেমায় এনে নার্গিস নাম দিয়েছিলেন। সেই মেহবুব খান তাঁর 'ম্যাগনাম ওপাস', 'মাদার ইন্ডিয়া' ছবির জন্যে ডাক দিলেন নার্গিসকে। কোনো রোমান্টিক বা ট্র্যাজিক নায়িকা নয়, পুরোপুরি এক অন্য ধরনের অন্য ভাবনার চরিত্র-ভারতের মাতৃকল্প। সমস্ত ভারতীয় নারী জাতির প্রতি সম্মান 'মাদার ইন্ডিয়া'। হৃদয় হারানো ট্র্যাজিক নায়িকা চরিত্রে অনেক অভিনয় করেছেন নার্গিস। ট্রাজিক নায়িকা ইমেজ থেকে বেরিয়ে আসার একটা বড় সুযোগ 'মাদার ইন্ডিয়া'। মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। বাস্তবে দু'জনেই প্রায় সমবয়সী। দু'চার

বছরের এদিক ওদিক হতে পারে। মেহবুব খানের স্বপ্নের ছবি 'মাদার ইন্ডিয়া'।

'মাদার ইন্ডিয়া' আবার নার্গিসের জীবনের আরেক টার্নিং পয়েন্ট। এই ছবির শ্যুটিং চলাকালীন সেটের মধ্যে একবার আগুন লাগে। আগুনের লেলিহান শিখা ঘিরে ফেলে নার্গিসকে। সুনীল দত্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে আনেন তাকে। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তাঁকে যেন নতুন জীবন দেন সুনীল দত্ত। শুধু বাঁচানোই নয়, তাকে বিবাহেরও প্রস্তাব দেন তিনি। নার্গিস রাজি হয়ে যান। 'মাদার ইন্ডিয়া' মা-ছেলের ইমেজ ভেঙে তারা বিয়ে করেন ১৯৫৮ সালের ১১ মার্চ। ১৯৫৮-তে ছবির জগত থেকে পাকাপাকিভাবে সরে আসেন নার্গিস। এই ১৯৫৮ সালে তার তিনটি ছবি মুক্তি পায়; 'লাজবন্তী', 'আদালত' ও 'ঘর-সংসার'। দীর্ঘ ন'বছর বিরতির পর ১৯৬৭-তে তিনি সত্যেন বসু পরিচালিত আরেকটি ছবিতে অভিনয় করেন; 'রাত আউর দিন'। সুখী বিবাহিত জীবন। এক পুত্র দুই কন্যা। আর সিনেমা নয়। বরং ক্রমশ সামাজিক কাজের মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে থাকেন তিনি। পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হন। রাজ্য সভার সদস্য হন। ১৯৭৯ সালে হঠাৎ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। স্বামী সুনীল দত্ত সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার জন্যে আমেরিকা নিয়ে যান তাকে। আপাতভাবে সুস্থও হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু বছর খানেক যেতে না যেতে আবার আক্রমণ। সুনীল দত্ত আপ্রাণ লড়াই চালিয়ে যান। নিউইয়র্ক থেকে শুধু নার্গিসকে দেখার জন্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে উড়িয়ে আনেন তিনি। পাগলের মত নার্গিসের মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই চালান স্বামী সুনীল দত্ত। একদা ব্যর্থ প্রেমিকা নার্গিস মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেন এক সফল প্রেম। তবু অমোঘ মৃত্যু তাকে ছাড় দেয় না। ৩ মে ১৯৮১। নার্গিস মারা যান। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুর হেড লাইন হল; 'নার্গিস সো এন্ডস দ্য লিজেন্ড লাস্ট জার্নি অফ এ ক্যুইন, এ টাইম ফর ফেয়ারওয়েল, স্যালুট টু দ্য লেডি ইন হোয়াইটদ। নার্গিসের মৃত্যুর বছরই তার সন্তান সঞ্জয় দত্ত নায়ক হন ছবির নাম 'রকি'। অ্যান্ড দ্য প্যারেড গোজ অন।

৫

এই নার্গিসই রাজকাপুরের ফিল্ম জীবনের প্রধান অনুপ্রেরণা। যদিও তাদের প্রেম সার্থকতা পায়নি। কিন্তু রাজকাপুর আজীবন মনে রেখেছেন নার্গিসকে। বিভিন্ন ছবিতে বার বার ফিরে এসেছে নার্গিস স্মৃতি। নার্গিসকে নায়িকা করে তিনি বাংলা ছবিও করেছেন। ডাবল ভার্সান। হিন্দিও হয়েছিল। বাংলায় 'একদিন রাত্রে', হিন্দিতে 'জাগতে রহো'। নার্গিসের সঙ্গে তার প্রথম ছবি 'আগ', তারপর থেকে একের পর এক ছবি। তৈরি হল হিন্দি সিনেমার চিরকালীন প্রেমের জুটি।

'আগ'। রাজের পরিচালনায় প্রথম ছবিতেই সৌন্দর্য আর প্রতিভার মিল হল। নার্গিস আর রাজকাপুর। এঁরা পরর্বতীকালে ভারতীয় সিনেমার প্রেমের ইতিহাসে এক নতুন সৌধ তৈরি করবেন। বিগোয়ান্ত ইতিহাস। যা আজ প্রবাদসম।

যখন রাজকাপুর 'আগ' তৈরি করার পরিকল্পনা করছেন তখন নার্গিস রীতিমত প্রতিষ্ঠিত নায়িকা। সেই অর্থে রাজ তেমন পরিচিত নাম নয়। 'আগ' ছবির নায়িকা ঠিক হল নার্গিস। নীলনয়নের রাজকে দেখে বোধহয় প্রথম দিনই প্রেমে পড়েছিলেন নার্গিস। নাহলে নবাগত এক পরিচালকের ছবিতে অভিনয় করতে এক কথায় রাজি হবেনই বা কেন ? আর কে ফিল্মসের প্রথম ছবি 'আগ'। এই ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য খাজা আহমেদ আব্বাসের। গল্পটা আব্বাস ভেবেছিলেন অন্য এক পরিচালকের জন্যে। ইচ্ছে ছিল প্রধান দুই পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করবেন অশোককুমার ও দিলীপকুমার।এক নিজস্ব আড্ডায় গল্পটি বলেন তিনি রাজকাপুরকে। শুনে রাজ এই গল্পটা নিয়েই ছবি করবেন বলে ঠিক করে ফেলেন।এই গল্পটি অবলম্বন করে চিত্রনাট্য লেখেন ইন্দর রাজ । ছোটবেলা থেকে থিয়েটারের জগতটা বেশ ভালই চেনেন রাজ। আর এই গল্পের কেন্দ্রেই রয়েছে থিয়েটার। ছবির নায়ক কেওল বড়লোকের ছেলে। বাবা বিচারক। বাবা চান ছেলে আইন পড়ে ওকালতি পড়ুক।কিন্তু ছেলের ইচ্ছে সে থিয়েটার করবে। বাবার সঙ্গে এই নিয়েই দ্বন্দ্ব। কপর্দকহীন অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে কেওল। চোখে স্বপ্ন সে নিজের থিয়েটার গড়ে তুলে অভিনয় করবে। রাজকাপুর পরিচালিত প্রথমদিককার বেশিরভাগ ছবির নায়কই ঘরছাড়া, পথবাসী। শহরের রাস্তায় সে স্ট্রাগল করে বেঁচে থাকে। আর পথেই তার সঙ্গে দেখা হয় নায়িকার। সে হয়ে ওঠে তার অনুপ্রেরণাদাত্রী।'আগ' থেকেই এই সূত্রের শুরু। 'আগ'-এ দেশভাগের ফলে পথবাসী এক নারীর দেখা পায় রাজ। মেয়েটির নাম নিম্মি। ইতিমধ্যে বিনয় নামে এক বড়লোকের সন্ধান পেয়েছে রাজ বা কেয়ল। যে থিয়েটার তৈরির জন্যে কেয়লকে টাকা দেয়। তৈরি হয় কেয়ল থিয়েটার। কেয়ল থিয়েটারে কেয়লের পরিচালনায় অভিনয় করে নিম্মি।থিয়েটার যখন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ একদিন থিয়েটারে আগুন লাগে। সেই আগুনে বীভৎসভাবে পুড়ে যায় কেয়ল।মুখ বিকৃত হয়ে যায়। নিম্মি তাদের প্রেম অস্বীকার করে বিয়ে করে থিয়েটারে টাকা দেওয়া সেই রাজের বন্ধুকে।

'আগ'-এর গল্পটা যেরকম সরলরৈখিক ভাবে বলা হল ছবির স্ট্রাকচারাল গঠন কিন্তু সেইরকম সরলরৈখিক নয়। ছবিটা শুরুই হয় ফ্লাস-ব্যাকে। কেওলের মধুচন্দ্রিমা বা সোহাগ রাত। কেয়লের স্ত্রী সুধা এর আগে কেয়লকে দেখেননি।এই প্রথম দেখবেন।প্রথম দর্শনেই চমকে উঠলেন সুধা।কি বীভৎস মুখ কেয়লের।পুড়ে ঝলসানো।নববধুকে কেয়ল তার জীবনের গল্প বলে। ফ্ল্যাশব্যাকের মধ্যে আবার ফ্ল্যাশব্যাক। ছোটবেলা থেকেই তার নাটকের দিকে ঝোঁক।স্কুলজীবনে নিম্মি বলে তার এক বাল্যবন্ধু ছিল।খুবই কাছের।তার সঙ্গে সে নাটক করত।দেশভাদের ফলে সেই ছোটবেলার সঙ্গী নিম্মি হারিয়ে যায়।তারপর বড় হয়ে সে নিজে যখন থিয়েটার তৈরি করে তখন সে খুঁজে পায় আরেক নিম্মিকে। থিয়েটারে তার পুড়ে যাওয়া, প্রেমে ব্যর্থতা ইত্যাদি শুনে এই নববধূ সুধা আবিষ্কার করে সে-ই আসলে কেয়লের ছোটবেলাকার নাট্য-সঙ্গী নিম্মি।

ছবিতে তিনজন নিম্মি।ছোটবেলার নিম্মি,পথসাথী নিম্মি, বিবাহিত নিম্মি।এই তিন ভূমিকায় রয়েছেন তিন নায়িকা-নিগার সুলতানা,

নার্গিস ও কামিনী কৌশল। অবশ্য অন্য দুই নায়িকা নিগার ও কামিনী ছবির সামান্য অংশ জুড়েই রয়েছেন ।প্রায় পুরো ছবি জুড়েই রয়েছেন নার্গিস ।যার কোনো নাম নেই। ঘর নেই। দেশভাগের শিকার। ছবির নার্গিসের ভাষায় তিনি নরক পেরিয়ে এসেছেন। কেয়লই তার নাম দিয়েছে নিম্মি। হয়তো সে বাল্য প্রেমিকার কথা মনে রেখেই হয়তো।পুরো ছবি জুড়েই নানাভাবে গ্ল্যামারাস করে তুলতে চেয়েছেন পরিচালক রাজ। নানা ক্লোজাআপ-এ ও ব্যাক লাইটের অমোঘ ব্যবহারে।এই ছবির আরেকটি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে থিয়েতার হল-টি। বিদেশি অপেরা হাউসের আদলে তৈরি করা হয়েছিল এই হল-টি।এখানেই ছবির একটা বড় অংশ অভিনীত হয় ।হলিউড ছবির সরাসরি প্রভাব ছিল এই থিয়েটার অংশে।'আগ' হিন্দি পপুলিস্ট ছবির দুনিয়ায় স্পষ্ট এক বিভাজন রেখা নিয়ে আসে।'আগ' পূর্ববর্তী হিন্দি সিনেমা এবং 'আগ' পরবর্তী হিন্দি সিনেমার মধ্যে।

মধ্যরাত্রির স্বাধীনতা। দেশভাগের ফলে ১০লক্ষ লোক দেশছাড়া হল। মৃত্যু হল প্রায় ১ লক্ষের। ভারত দুভাগ হওয়ার ফলে ভারতের সিনেমা-বাজারও দুভাগ হল। তবে বোম্বাইয়ের সিনেমায় নতুন হাওয়া এল এই চল্লিশ দশকের শেষে।পঞ্চাশের দশককে হিন্দি সিনেমার স্বর্ণযুগ বলা হয় ।চল্লিশে এবং পঞ্চাশে হিন্দি সিনেমার তিন সর্বকালীন সেরা নায়ক অভিনয় জীবন শুরু করেছেন। এক দেব আনন্দ, দুই রাজকাপুর, তিন দিলীপকুমার। এই তিন মুভি সম্রাট রাজত্ব করছেন পঞ্চাশ দশকের বলিউডে ।একমাত্র রাজকাপুরই সেই সময় চলচ্চিত্র পরিচালক হয়ে উঠছেন ।চল্লিশ দশকের শেষে জন্ম হচ্ছে এক শক্তিশালী মুভিমোঘলের, যিনি পঞ্চাশের দশকেই বোম্বাই সিনেমাকে আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় করে তুলবেন। এই পঞ্চাশের দশকেই তো ভারতীয় সিনেমা দুনিয়ার দরবার থেকে শৈল্পিক মোহর নিয়ে এল----কান চলচ্চিত্র উৎসব বিশেষ শিরোপা দিল সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী-কে ।এদিকে পঞ্চাশের দশকেই তো বোম্বাই সিনেমা সোনা ফলিয়েছে ।মেহবুব খনের 'মাদার ইন্ডিয়া', গুরু দত্তের 'পিয়াসা' বা 'কাগজ কি ফুল', বিমল রায়ের 'দেবদাস' ইত্যাদি একের পর এক ক্লাসিক ছবির ধারার মধ্যে পরিচালক রাজকাপুর খুঁজে নিচ্ছেন এক নিজস্ব জঁর যা চলচ্চিত্র মনোরঞ্জনের ভাবনাটাকেই আস্তে আস্তে বদলে দেবে ।নায়ক হিসেবে তখন তো তিনি প্রতিষ্ঠিত ।'স্টার' তকমাটা তখনও তাঁর গায়ে এঁটে যায়নি। তিনি 'স্টার' হয়ে উঠলেন নিজের পরিচালনার ছবিতেই। তার জন্যে অবশ্য খুব বেশিদিন প্রতীক্ষা করতে হয়নি ।এটা যেন তাঁর জন্যেই অপেক্ষায় ছিল।

কমুনিস্টদের সাংস্কৃতিক সংগঠন আই পি টিএ বা ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সক্রিয় সদস্য ছিলেন রাজের বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুর ।এখানেই তাঁর নাটক চর্চার শুরু ।তখন কলকাতাতেই থাকতেন পৃথ্বীরাজ। সেখ ান থেকে বোম্বাই গিয়ে নিজেই নাট্যদল গড়ে তোলেন। তৈরি করলেন পৃথ্বী থিয়েটার। যা আজও মোম্বাইতে অন্য গ্রুপ থিয়েটার চর্চা কেন্দ্র। বাবার কাছেই অভিনয় শিক্ষার শুরু রাজের ।বোম্বে টকীজের ছবিতেও বেশ কিছুকাল জড়িয়ে ছিলেন তিনি ।সেখান থেকে বেরিয়ে সরাসরি ছবি পরিচালনায় নামলেন। ছবির নাম 'আগ'। রাজ-এর পরিবারেরর মধ্যেই এক সোসালিস্ট আবহাওয়া ছিল। আর সেই সূত্রেই রাজ-এর প্রথম ছবিতে সোসালিস্ট ভাবনার প্রভাব পড়ল। শুধু এই ছবিতে নয়, রাজের ছবিতে সারা জীবনই নানা বিনোদনের আড়ালে কোনও না কোনও ভাবে সোসালিজমের কথা এসে পড়ে।

৬

সোসালিস্ট শোম্যান। রাজকাপুরের এটাও এক অন্যতম পরিচয়। ছবির মধ্যে দিয়ে এই পরিচয়টা তিনি আজীবন অক্ষুন্ন রেখেছেন ।তাঁর পরিচলিত প্রায় সবকটা ছবিই কোনো না কোনো ভাবে বিনোদনের মোড়কে শেষ অবধি সোসালিজমের প্রশ্ন নিয়ে আসে। আর বৈপরীত্য হলেও সত্যি। এরই মধ্যে মিশে থাকে যৌনতার নানা আলপনা। ধর্ম, পৌরাণিক,আর সস্তা মেলোড্রামায় ভরা হিন্দি ছবির জগতকে পালটে দিলেন পরিচালক রাজকাপুর। ছবিতে মেলোড্রামা রইল না যে তা নয়, তবে সেই মেলোড্রামায় প্রায় আমূল বদল আনলেন ।আঙ্গিকের দিক থেকে তার প্রথম পরিচালিত ছবি 'আগ' থেকেই বোম্বাই সিনেমা ঘরানায় এক এক নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন, যা 'বরসাত'-এ এসে পরিপূর্ণ রূপ পেল। বোম্বাই সিনেমায় প্রথম হলেও এই আঙ্গিকটি আদতে হলিউড-প্রাণিত। রাজ হিন্দি সিনেমায় নিয়ে এলেন হলিউড ধারা। হলিউডের পরিচালক ফ্রাঙ্ক কাপরার ছবির ধরনরনের অনেককিছুই নিলেন তিনি। বিষয়গত ভাবে তিনি হয়ে উঠলেন কাপরা অনুগামী। কাপরা যেমন তার ছবিতে 'কমনম্যান'কে সুপারম্যান করে তোলেন, ঠিক সেইরকমভাবেই 'আগ' এবং বরসাত-এ সাধারণ-মানুষ ক্রমে সুপার হিরো হয়ে ওঠে ।আর আঙ্গিকের দিক থেকে রাজ অনুগামী হলেন আরেক প্রবাদপ্রতিম হলিউড পরিচালক অরসন ওয়েলসের। তার ছবির আলো আঁধারি, ক্লোজ-আপে ব্যাক-লাইটের স্বপ্ন-প্রয়োগ দেখা দিল রাজের ছবিতে। 'বরসাত'-এর পরে তিনি 'আওয়ারা'-তে এসে আলোক-চিত্রী বদলেছেন। এসেছেন রাধু কর্মকার ।এই রাধু কর্মকার এরপর থেকে পরিচালক রাজ কাপুরের সঙ্গে 'রাম তেরি গঙ্গা ময়লি' অবধি কাজ করেছেন ।রাজ পরিচালিত ছবি মানেই রাধু কর্মকার। রাজ কাপুর পরিচালিত দশটি ছবির মধ্যে নটি-রই আলোকচিত্রী হলেন রাধু কর্মকার, যিনি ছিলেন ভারতের সিনেমা দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রী। এই রাধু কর্মকারকে দরকার ছিল পরিচালক রাজ কাপুরের। পরিচালক রাজকাপুরের উত্থানের পেছনে যে দুজন নিশ্চিতভাবে রয়েছেন তারা হলেন নার্গিস এবং রাধু কর্মকার। রাজের মৃত্যুর পর রাধু কর্মকার এক স্মৃতিচারণে বলেন,'একদিন ওঁকে 'মিলন' ছবির কিছু অংশ দেখবার জন্য ডাকলাম ! উনি দেখলেন । মাত্র রীল দুয়েক দেখেছিলেন । তারপর সেখান থেকে আমাকে নিয়ে গেলেন ওঁর ছোট্ট অফিসে । আমার হাত দুটো ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'আপনিই আমার ক্যামেরাম্যান। এবার আপনাকে নিয়ে 'আওয়ারা' শুরু করছি।' তখন কিন্তু কথা হয়েছিল শুধু একটা ছবি, মানে ওই 'আওয়ারা'-তেই আমি কাজ করব। কিন্তু যা কথা হয়েছিল তেমনটা ঘটল না। 'আওয়ারা'র পর আমাকে ছাড়লেন না। বললেন, 'আমি তোমায় না ছাড়লে তুমি কেমন করে যাবে । আমি তোমাকে

ছাড়তে রাজি নই। তুমিই আমার কাজ করবে।' তাই হল । উনি ওঁর কথা রেখেছিলেন, আমিও। 'আওয়ারা' থেকে 'রাম তেরী গঙ্গা ময়লী' পর্যন্ত আমরা কেউ কাউকে ছাড়িনি । কিন্তু আজ যে উনি কথা না রেখে ছেড়ে গেলেন তার জন্য নালিশ করব কার কাছে?'

ভারতীয় সিনেমায় প্রথম কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধরা পড়ে এই 'বরসাত' ছবিতেই। আউটডোর হিসেবে ছবির বড় অংশ জুড়ে থাকে কাশ্মীর।রামানন্দ সাগরের লেখা গল্পে ও চিত্রনাট্যে আলাদা কোন চমক না থাকলেও আঙ্গিক আর চিত্রকল্পে চমক আনেন পরিচালক রাজকাপুর।প্রাণ ও গোপাল দুই বন্ধু কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে প্রেমে পড়েন এই উপত্যকার দুই নারীর, যথাক্রমে রেশমা ও নীলার।এই দুই ভূমিকায় অভিনয় করেন নার্গিস এবং নিম্মি।এই ছবিতেই নিম্মির প্রথম আত্মপ্রকাশ।প্রাণ ও গোপাল হলেন রাজকাপুর এবং প্রেমনাথ। গোপাল উম্যানাইজার।সে শুধু নীলার সঙ্গতেই খুশি নয়, অন্যান্য নারীদের দিকেও তার লোলুপ দৃষ্টি।তাই শেষ অবধি সে ফাঁকিই দেয় নীলাকে। প্রাণ ও রেশমার প্রেম রাধাকৃষ্ণসম। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে শেষ অবধি মিল হয় প্রাণ ও রেশমার।এই ছবিতে অলিখিত এক মরাল এনেছেন পরিচালক রাজকাপুর।

যদি ভালবাসা সাচ্চা হয় তবে নানা বাধা পেরিয়ে সে জীবনের সমাধান দেয়। আর প্রেম যদি হয় ফ্লার্ট বা ধান্দাময় তাহলে তা শেষ হয় মৃত্যুতে। আপনি যদি প্রেমে প্রাকৃতিক ট্র্যাজেডির মুখোমুখি হন তবে আপনি শেষ পর্যন্ত তা পেরিয়ে জয়ী হবেন। আর আপনি যদি নিজেই একটি ট্র্যাজেডি তৈরি করেন তবে আপনি চিরতরে আলাদা হয়ে যাবেন। ছবির শিরোনাম 'বারসাত' খুবই উপযুক্ত কারণ ছবির সব প্রধান চরিত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কাঁদে। এছাড়াও বৃষ্টিতে ভরা খরস্রোতা নদীর জলে হারিয়ে যায় রেশমা। দৃশ্যটি ইউনিক ভাবে টেক করেন রাজ। দারুন ভিশ্যুয়াল। সে দিক থেকে ভাবলে 'বরসাত' ছবির অ্যাসেট প্রাকৃতিক ভিশুয়াল এবং নার্গিসের সৌন্দর্য।ক্যামেরা ও আলোর কায়দায় নার্গিসের মধ্যে রাজ নিয়ে এসেছেন এক আদিম সরলতা। বোঝা যায় রাজ আলাদা করে নার্গিস্কে বিশেষ পাধান্য দিতে চাইছেন।এই ছবির আরেক বক্স-অফিস গান। এই ছবি থেকেই শঙ্কর জয়কিশান রাজের ছবির সঙ্গীত পরিচালক হন।এরপর থেকে রাজকাপুর পরিচালিত ছবিতেই এরা সঙ্গীত পরিচালক। 'বরসাত' ছবির দুটি গান- 'মুঝে কিসি সে পেয়ার হো গয়া' এবং 'জিয়া বেকারার' তো প্রবাদপ্রতিম হয়ে যায়।। শঙ্কর-জয়কিশান এই সিনেমায় তাদের তখনও অবধি সেরা সাউন্ডট্র্যাক তৈরি করেছেন। অবশ্য রাজকাপুর ছবির সমস্ত গানের ক্ষেত্রেই নিজে সক্রিয় থাকতেন। রাজ কাপুরের গানের ক্ষেত্রে নিজস্ব এক ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল।তিনি কলকাতায় যখন তার বয়স দশ, নিউ থিয়েটার্স-এ কানন দেবী, পঙ্কজ মল্লিক,রাইচাঁদ বড়ালের কাছে গানের তালিম নিয়েছেন।সারা জীবন সিনেমা জগতে আসার আগে তিনি গানের চর্চা ছাড়েননি। ফলে যেই সঙ্গীত পরিচালক হোন

না কেন, তাঁকে নিজের ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করতেন।নিজস্ব টেপ রেকর্ডারে রাজ নানা জায়গার নানা লোক সঙ্গীতের সুর তুলে রাখতেন।ছবির ক্ষেত্রে সেগুলো সঙ্গীত পরিচালকদের দিয়ে সুরসৃষ্টি করতে বলতেন।একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।একবার গোয়া ভ্রমণে একটা গোয়ানিজ গানের সুর তুলে রেখেছিলেন রাজ। যখন 'ববি' ছবি করছেন তখন সেই সুর তুলে দেন 'ববি'র সঙ্গীত পরিচালক লক্ষীকান্ত প্যারেলালের হাতে। সেই সুরকে কেন্দ্র করেই তৈরি সেই প্রবাদপ্রতিম গান,' না চাহে সোনা চাঁদি'। এইরকম একাধিক ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। চলচ্চিত্রের শুরুতে নিম্মির এক বিশাল ভুমিকা থাকলেও শেষ অবধি কিন্তু 'বরসাত'' ছবিটি হয়ে ওঠে নার্গিসময়।

'আগ' ছবিতে যেমন মেলোড্রামায় মিলেছিল সোসালিস্ট বাঙ্ময় স্তবতা।থিয়েটারের মধ্যেও আনা হয়েছিল রিয়েলিটিকে।নায়িকের গরীবীয়ানাকে অহংকার করে তোলা হয়েছিল। চালু নিছক মেলোড্রামা নির্ভর তৎকালীন দর্শক সেইভাবে নিতে পারেননি 'আগ' ছবিটিকে। সেইকারণে 'আগ' সেইরকম বক্স অফিস সাফল্য পায়নি। আর সেই কারণেই মনে হয় প্রেমের ম্রেলোড্রামার সাসপেন্সগুলোর ওপর জোর দেন রাজ 'বরসাত' ছবিতে। হলিউড ঘরানা থেকে সামান্য সরে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে নিয়ে আসেন কৃষ্ণ-রাধা কনসেপ্ট। এই ফর্মুলা অবশ্য বেশ ফলপ্রসূ হয়। সুপারহিট হয় 'বরসাত'।এরপর থেকে পরিচালক রাজকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আমৃত্যু।

৭

'আওয়ারা' বিশেষত সফল হয়েছিল, কেবল ভারতে নয়, সারা বিশ্ব জুড়ে। অনেক আর কে ফিল্ম মুভিতে অভিনেত্রী নার্গিসের বিপরীতে রাজ কাপুর উপস্থিত হতেন। আর কে-র ব্যানারে রাজ কাপুর নার্গিসের সঙ্গে ১৬ টি সিনেমায় অভিনয় করেন এবং স্টুডিওর চলচ্চিত্রগুলির প্রচারের জন্য তাঁর সাথে বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেছিলেন। শঙ্কর জয়কিশনের সংগীত দলও এই সময়ের মধ্যে আরকে ফিল্মস প্রযোজনায় প্রায়শই কাজ করেছিল। আওয়ারা (১৯৫১) দিয়ে শুরু করে, রাধু কর্মকার তার শেষ রামতেরি গঙ্গা মাইলি (১৯৮৫) অবধি চার দশক ধরে রাজ কাপুরের পরবর্তী সমস্ত ছবির শুটিং এখানে করেছিলেন।

আর কে ফিল্মস পরবর্তী কয়েক দশকগুলিতে অনেকগুলি চলচ্চিত্রের প্রযোজনা করেল, যার মধ্যে রয়েছে জিস দেশ মে গঙ্গা বেহতি হ্যায়(১৯৬০), মেরা নাম জোকার (১৯৭০), ববি (১৯৭৩), সত্যম শিবম সুন্দরম (১৯৭৮), প্রেম রোগ (১৯৮২) এবং রাম তেরি গঙ্গাসহ মাইলি (১৯৮৫), রাজ কাপুরের শেষ ছবি, ১৯৭০ এর দশকে, রণধীর কাপুর স্টুডিওতে তাঁর বাবার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং ১৯৭১ সালে কাল আজ অর কাল -এর মাধ্যমে তাঁর অভিনয় ও পরিচালনার সূচনা হয়েছিল, তাঁর ভবিষ্যত স্ত্রী ববিতা, বাবা রাজ কাপুর এবং দাদা পৃথ্বীরাজ কাপুরও এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তিনি ধর্ম করম (১৯৭৫) ও রাজ কাপুরের একটি অসম্পূর্ণ চলচ্চিত্র সহ সংস্থার সঙ্গে আরও দুটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছিলেন, যা তিনি ১৯৮৮ সালে তার বাবার মৃত্যুর পরে সম্পন্ন করেন এবং হেনা (১৯৯১) এর পরে শেষ করেছিলেন। তাঁর ভাই শশী কাপুরও বেশ কয়েকটি আরকে ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯৮৮ সালে রাজ কাপুর মারা যাওয়ার পরে, রণধীর স্টুডিওটি দেখাশোনা করেছিলেন। তাঁর ছোট ভাই রাজীব কাপুর ১৯৯৬ সালে প্রেম গ্রন্থ এবং ঋষি কাপুর পরিচালিত আ আব লৌত চলে (১৯৯৯) পরিচালনা করেছিলেন। এরপরে, কাপুররা আরকে ফিল্মসের ব্যানারে আর কোনও চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেননি।ছোটবেলায় বেশ কিছুকাল কলকাতায় কাটিয়েছেন রাজ কাপুর।তার বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুর কলকাতার নিউ-থিয়েটার্স স্টুডিও-র সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন।হতে পারে কলকাতার সেই নিউ-থিয়েটার্সের স্মৃতিও কাজ কাপুরের কাজে লেগেছে এই আর কে স্টুডিও নির্মাণে।

এই স্টুডিওর ভেতরেই রাজকাপুর করেছিলেন ফিল্ম মিউজিয়াম। সেখানে আর কে ফিল্মসে ব্যবহার করা নানা 'প্রপস' সংরক্ষণ করা হত।এতে বরসাত, আওয়ারা, আগ, মেরা নাম জোকার এবং ববির পোস্টার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি একটি বৃহৎ কালো ছাতা দ্বারা আবৃত কাপল ছিল, যা পেয়ার হুয়া, ইকরার হুয়া, শ্রী ৪২০ এর ছিল, এছাড়া আওয়ারার নার্গিস এর দীর্ঘ কালো পোশাক, সঙ্গম এর বৈজয়ন্তীমালা এর শাড়ি, ববি এর ডিম্পল কাপাডিয়া এর ফ্রগ, জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হায় এর পদ্মিনীর শাড়ি, মেরা নাম রাজুতে ব্যবহৃত ডাফলি এমনকি রাজ কপুরে ছবিতে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি টুপিও ছিল। এগুলি সব আগুনে হারিয়ে যায়। ঋষি কাপুর জানিয়েছিলেন আগুনের কারণে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছিল ফিল্ম স্ক্রিপ্ট ও ক্যামেরা এবং আরও অনেক আনুষঙ্গিক উপকরণের। এই স্টুডিও-তে বেশ কিছু ছবির সেট সংরক্ষণ করা ছিল। যেমন স্টুডিওতে নির্মিত সেটগুলির মধ্যে ছিল,এলিফ্যান্টা অনুপ্রাণিত চিত্র নিয়ে রাজ কাপুরের তস্কর আওয়ে মেরা পরদেশীদ স্বপ্নের সিকোয়েন্সের সেট, 'পেয়ার হুয়া ইকরার হুয়া'র সেট, ইয়ে গালিয়া ইয়ে চৌবারা ইহা না না আনা দোবারদ গানের জন্য হাভেলি সেট, প্রেম রোগ-এর এবং রাম তেরি গঙ্গা মইলি হো গেয়ি-র বিভিন্ন জিনিস। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ এ, আর কে স্টুডিওতে আগুন লেগেছিল এবং ভেঙে পড়ে। একটি টেলিভিশন রিয়েলিটি শোয়ের শুটিং চলাকালীন স্টুডিওতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং স্টুডিওতে আগুন লেগে যায়।ফলে মিউজিয়ামের সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়।রাজ কাপুরের মৃত্যুর পর ক্রমবর্ধমান লোকসানের কারণে কিংবদন্তি অভিনেতা রাজ কাপুর নির্মিত আইকনিক আরকে ফিল্মস এবং স্টুডিও বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয় কাপুর পরিবার।

'মুম্বই মিরর'কে এক সাক্ষাৎঅকারে ঋষি কাপুর পরিবারের পক্ষে জানান স্টুডিওটি পুনর্নির্মাণে বিনিয়োগ এটি চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত আয় অর্জন করতে পারত না। আগুনের আগেও কয়েক বছর ধরে আর কে স্টুডিও এক বিশাল সাদা হাতি হয়ে গিয়েছিল, মোট লোকসানের ক্ষতির সম্মুক্ষীন হছিল।

তিনি উল্লেখ করেন যে কয়েক বছর ধরে বুকিংয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, প্রযোজকরা গোরগাঁও এবং অন্ধেরীর কাছে স্টুডিও পছন্দ

করেন। পূর্ব শহরতলির অংশ হওয়ায় চেম্বুরকে আর লাভজনক শুটিংয়ের জায়গার মতো দেখা হয় না, যেমনটি চল্লিশ এবং ৫০ এর দশকে ছিল। তবে, আগুন স্টুডিওগুলিকে পুনরায় জীবিত করার পরিকল্পনা তাদের অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। শেষ অবধি স্টুডিওটি বিক্রি হয়ে যায়।

এই স্টুডিওর ভেতরেই ছিল রাজ কাপুরের এক নিজস্ব অতি ব্যক্তিগত বাংলো।এই বাংলো অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়াতে শেষ হয়ে যায় রাজকাপুরের পরকীয়া প্রেম-পর্বের নানা ইতিহাস।এখানে ছিল এক সভাঘর। তিনি প্রায়শই ছোট ছোট অন্তরঙ্গ সভা এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। আরকে ফিল্মসের ২৫ তম বার্ষিকী এখানে উদযাপিত হয়েছিল। দোলের দিন মুম্বাই ফিল্মি দুনিয়ার প্রায় সব মানুষ জড় হয়ে দোল খেলতেন এই আর কে স্টুডিও-তে'।রাজ কাপুরের এই আর কে আর কে স্টুডিও স্টুডিও নির্মাণের পেছনে অনুপ্রেরণা ছিল সেই হলিউডই। চেষ্টা করেছিলেন একই ছাদের তলায় সব কিছু-শুটিং, এডিটিং, মিউজিক-টেকিং আরও অন্যান্য ফিল্মি অনুষঙ্গ সব কিছু। সার্থকও হয়েছিলেন তিনি বোম্বাই সিনেমার ধরনে নানা পরিবর্তন আনতে।

৮

সুরা, নারী এবং সিনেমা। রাজকাপুরের তিনটি প্যাশন। এই নিয়েই আজীবন বেঁচেছেন।পরিচালকের বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন বটে কৃষ্ণা,কিন্তু প্রেমিকা ছিল সিনেমা।সিনেমার সঙ্গেই তার যত প্রেম। আর তার প্রায় সব ছবিরই প্রধান স্তম্ভ হয় তার ছবির নায়িকারা। তাই নায়িকার সঙ্গেও তার অন্তরঙ্গ প্রেম।অনেকটা মনে পড়ে যায় ফরাসি নবতরঙ্গের পরিচালক জঁ লুক গোদারকে।তিনি যেন নায়িকার জন্যেই ছবি করতেন।ছবির নায়িকা আনার যেমন প্রেমে পড়েছেন তিনি,তেমনই আনা তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পড়েছেন তিনি তার অন্য নায়িকার প্রেমেও। পরিচালক অভিনেতা রাজকাপুরের ক্ষেত্রেও ঘটেছে ঠিক তাই। আর কে ফিল্মস-এর প্রহম ছবি 'আগ' থেকেই তিনি প্রেমে পড়লেন নার্গিসের।তবে তা পরিচালনার ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু সেই আগুন বৃষ্টিধারা হয়ে এল 'বরসাত'। আর আওয়ারা ,তে প্রেমের ভুবন খুলে দিলেন পরিচালক রাজ।আর নিজে ছবিতে হয়ে উঠলেন ভ্যাগাব্যান্ড।'আওয়ারা' ছবিতে তিনি হলেন রাজ রঘুনাথ।রাজ চোর, রাজ লোক ঠকায়, এমনকী রাজ খুনী। এর ঠিক বিপরীতে নার্গিস বা রীতা। যে প্রায় দেবীতুল্য। রাজপ্রেমিকা। ইঙ্গিতটা আগের ছবিতে ছিল,এখানে এসে রাজ চ্যাপলিনকে অনুসরণ করতে থাকেন।আর এর পরের ছবি শ্রী৪২০-তে তিনি পুরোপুরি ভারতীয় চ্যাপলিনই হয়ে ওঠেন। 'আওয়ারা' প্রেমের ছবি, 'আওয়ারা' কোর্ট-রুম ড্রামা।ভারতীয় সিনেমায় প্রথম কোর্ট-রুম বা বিচার দৃশ্য বাস্তব হয়ে ওঠে এই ছবিতেই। আর রাজ কাপুরের প্রথম দিককার প্রায় সব ছবিতেই থেকেছে এক সামাজিক বাস্তবতার আবহাওয়া। আর এই আবহাওয়ায় তিনি অনায়াসে নিয়ে আসেন জনমনোরঞ্জন বা ইন্টারটেইনমেন্ট। চ্যাপলিনের মতই এন্টারটেনমেন্টকে কখনই অস্বীকার করেন না পরিচালক রাজকাপুর। 'আওয়ারা' চিত্রনাট্যে ও গল্পে রয়েছে নানা টুইস্ট। মা আছে, বাবা কে জানেন না আওয়ারা রাজ। শেষ অবধি বাবার সন্ধান পান তিনি। অবশ্যই মায়ের মৃত্যুর পর।রাজ আব্বাসের গল্পের মধ্য যোগ করেন এক রিফর্মেশনের কাহিনি।আর এই রিফর্মার হলেন নায়িকা নার্গিস।তিনিই অসৎ জগতের সমস্ত গ্লানি মুক্ত করে বিশুদ্ধ করে তোলেন।নার্গিস যেন রাজের জীবনে পরশমণি। নার্গিসের সৌন্দর্যকে রাধু কর্মকারের ক্যামেরার জাদুতে কাজে লাগিয়ে প্লেটনিক করে তোলেন পরিচালক রাজকাপুর। শুধু ভারতে নয় 'বরসাত' আন্তর্জাতিক স্তরে হিট হয়।বিশেষ করে রাশিয়া ও চিনের মত কমুনিস্ট-দেশে দারুনভবে সাড়া জাগায় এই ছবি। শোনা যায় স্বয়ং মাও সে তুং ছবিটি দেখে পছন্দ করেছিলেন।রাজকাপুরের 'আওয়ারা' ছবিতে অন্তস্রোতে সোসালিস্ট ভাবনা কাজ করে, সেই সোসালিস্ট ভাবনাটি নেহেরু-মডেলে অনুপ্রাণিত।পরের কয়েকটি ছবিতে এই ধারার সম্প্রসারণ দেখতে পাওয়া যায়।

তইয়ে ৪২০ নেহি, শ্রী ৪২০ হ্যায়দ । ফোর টোয়েন্টি ভারতীয় দণ্ডবিধিতে প্রতারণার ধারা।তার আগে শ্রী কেন? শ্রী সম্মানসূচক।এই ফ্যালাসিই ছবির ভিত।তারপর আছেন চ্যাপলিন।রাজকাপুর এই ছবিতে স্পষ্ট লিটল ট্রাম্প ইমেজ কাজে লাগিয়েছেন। চলনে বলনে কহনে তিনি চ্যাপলিনের প্রতিচ্ছবি।পঞ্চাশের দশকে সেটাই ম্যাজিক ঘটায়।সুপারডুপার হিট হয়। স্বদেশে এবং বিদেশে। ছবির শুরুতেই নায়ক রাজ জানিয়ে দেন,'মেরা জুতা হ্যায় জাপানি,এ পাতলুন ইংলিশতানি, সর মে লাল টুপি রুশি, ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানি'।পরিচালক রাজকাপুর বাণিজ্যিক কৌশল হিসেবেই দেশ আর বিদেশকে মিশিয়ে দেন। জাপান রাশিয়াকে গানে এনে ট্রিটমেন্টে চলে যান হলিউডের কাছে।বলিউডের ছবিতে হলিউড থেকে ধার করে আনেন সিংগিং ইন দি রেন। বৃষ্টিস্নাত রাজ ও নার্গিস।তখন আর প্রেমের আত্মা নন। যৌনতাময় শরীর। এর আগে অবধি পরচালক রাজ নার্গিসের প্লেটনিক-ইমেজ নিয়েই খেলেছেন। এই ছবিতে নার্গিসকে তিনি শরীরী করলেন। যদিও আগের ছবিগুলোর মত নার্গিস এখানেও রিফর্মার। ৪২০ রাজ তার সক্রিয়তাতেই হয়ে ওঠেন শ্রী৪২০। প্রতারক থেকে সাম্মানিক প্রতারক। এই সিনে দর্শনটাই সারা ছবিতে ছড়িয়ে রাখেন পরিচালক রাজকাপুর, যিনি শিল্পের সঙ্গে অনায়াসে ব্লেন্ড করতে পারেন বাণিজ্য।পরিচালক রাজের এটাই জাদুকাঠি।

গ্রাম থেকে শহরে আসা এক কপর্দকহীন যুবক শহরে। সঙ্গে শুধু সততার জন্যে পাওয়া এক সোনার মেডেল। পেটের দায়ে এই 'ইনাম' মেডেলটা বেচে দিতে হয়। এখানেই তার সঙ্গে দেখা নায়িকা রীতা বা নার্গিসের। নার্গিস বলেন মানুষের জীবন থেকে 'ইনাম' চলে গেলে আর রইলটা কী? রীতার সঙ্গে রাজের সেই প্রেমের শুরু।এদিকে রাজ অসৎমানুষের সঙ্গে জড়িয়ে পরে প্রতারক হয়ে উঠেছে।ফোর টোয়েন্টি।শ্রীহীন।এরপর নানা নাটকীয়তার মধ্যে সে রীতা বা নার্গিসের অনুপ্রেরণায় ভাল হয়ে যায়। এইসবের মধ্যে বেশ কিছু সুপারহিট গান সে গেয়ে নেয় নার্গিসের সঙ্গে প্রেমপর্বে। সব শেষে ৪২০ হয়ে ওঠে শ্রী৪২০।

রিয়েল লাইফে নার্গিসের সঙ্গে তাঁর প্রেম তখন চরমে। নার্গিস তখন

নিজেকে মিসেস রাজকাপুরই ভাবছেন। নার্গিস রাজকাপুরকে বিয়ে করার কথা ভাবছেন। কিন্তু রাজকাপুর যা কিছু করছেন নার্গিসের সঙ্গে তা ঘর বাঁচিয়ে। স্টুডিওয় তিনি নার্গিসের কিন্তু কৃষ্ণার সঙ্গে যে তার শারিরীক-নৈকট্য এতটুকু কমেনি তার প্রমণ নার্গিসের সঙ্গে প্রেমপর্বের মধ্যেই কৃষ্ণার গর্ভে একের পর এক সন্তান জন্ম দিয়েছেন রাজ।এরই মধ্যে এক ঘটনা ঘটে।'মাদার ইন্ডিয়া' ছবির সেটে এক ভয়াবহ আগুন ধরে। সেই আগুনের মধ্যে আটকে পড়েন 'মাদার ইন্ডিয়া' ছবির নাম ভূ মিকার অভিনেত্রী নার্গিস। কেউ যখন সেই আগুন থেকে নার্গিসকে উদ্ধার করার কথা ভাবতেই পারছেন না তখন সুনীল দত্ত জীবন বাজি রেখে সেই আগুনের মদ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করেন নার্গিসকে। সুনীল দত্ত এই ছবিতে নার্গিসের ছেলের চরত্রে অভিনয় করছিলেন। নার্গিস তার প্রাণের পুরুষকে সুনীলের মধ্যে খুঁজে পান।সুনীল দত্তকে বিয়ে করেন নার্গিস।

রাজকাপুরের ছেলে ঋষি কাপুর 'খুল্লম খুল্লা' নামে তার আত্মজীবনীতে তাঁর বাবা রাজকাপুর প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখছেন, 'আমার বাবার প্রিয় জিনিস ছিল তিনটি, 'সিনেমা, মদ এবং সিনেমার নায়িকারা। আমার পিতৃদেব মানুষটি প্রতি মুহূর্তে প্রেমের মধ্যে থাকতে পছন্দ করতেন। দুঃখের বিষয়, আমার মাতৃদেবী ব্যতিরেকে অন্যান্য নানা মহিলাই ছিলেন তাঁর প্রেমিকা'।রাজকাপুর নায়িকাদের প্রেমের জোয়ারে ভাসছেন যখন তখন তিনি বিবাহিত। যারা রাজকাপুরকে জানতেন বা চিনতেন তারা সকলেই একমত হবেন ঋষির এই খুল্লম খুল্লা স্টেটমেন্টটি সত্যি। রাজকাপুরের প্রথম প্রেম অবশ্যই সিনেমা। তিনি সিনেমা-পুরুষ। সিনেমাপরিবারে জন্ম। বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুর প্রায় চলচ্চিত্রের জন্মলগ্ন থেকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। থিয়েটার দুনিয়াতেও এই পরিবারের যথেষ্ট নামডাক। এহেন পরিবারের মানুষের চলচ্চিত্র প্রিয়তম বিষয় হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মাত্র এগারো বছর বয়সে শিশুশিল্পী হিসেবে সিনেমায় অভিনয় করেছেন রাজ। ছবির নাম 'ইনকিলাব'। তখন দেশ স্বাধীন হয়নি। ৪৭-এ স্বাধীনতা এল। দেশভাগ হল। কাপুর পরিবারের আদি বাড়ি পেশোয়ার, পাকিস্থানের ভাগে পড়ল।কাপুর পরিবার কিন্তু রয়ে গেলেন এই ভারতেই। আর স্বাধীনতার আগেই তো হিন্দি ছবির নায়ক হলেন রাজ। তখন বয়স আর কত হবে? ২০ ছুঁই ছুঁই। সিনেমাকে চিনছেন তখন থেকেই। অভিনয় ঠিক আছে কিন্তু নিজে চলচ্চিত্র তৈরির বাসনা তখন থেকেই। আর সেই কারণেই অভিনয় করতে করতে চলচ্চিত্রের খুঁটিনাটির দিকে তীক্ষ্ণ নজর। পরিচালক কেদার শর্মার সহকারী হিসেবে কাজ করলেন। আবার এই কেদার শর্মার ছবির নায়ক হলেন তিনি। ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই স্বাটীনভাবে চলচ্চিত্র পরিচালনয় নেমে পরলেন তিনি।ইতিমধ্যেই ন'টা ছবিতে অভিনয় হয়ে গেছে তাঁর। দশম ছবিতে

তিনি প্রযোজক অভিনেতা এবং পরিচালক।রাজ নিজেই প্রযোজক হিসেবে বোম্বাইয়ের চেম্বুরে তৈরি করলেন নিজস্ব স্টুডিও- আর কে স্টুডিও এবং প্রযোজনা সংস্থার নাম হল আর কে ফিল্মস। সিনেমা প্রেমের পাশাপাশি এই আর কে ফিল্মস থেকেই রাজ-এর নারী প্রেমের শুরু।বয়সের সব বাধাকে সরিয়ে এই প্রেম তিনি বজায় রেখেছেন আমৃত্যু।আর তার প্রেমিকা সবসময় তার সাম্প্রতিক ছবির নায়িকা। এখানেও কোথায় যেন সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে সিনেমা প্রেম। ছবি পরিচালনায় আসার আগে তার ঝুলিতে ছিল আটটি ছবিতে অভিনয় অভিজ্ঞতা।আর এই সময়ই তিনি শিখতে থাকেন চলচ্চিত্র পরিচালনার খুঁটিনাটি।

৯

রাজকাপুর অভিনীত ছবির সংখ্যা ৭৪। তাঁর পরিচালিত ছবির সংখ্যা ১০। নিজের আর কে ফিল্মস ব্যানার ছাড়া অন্য কারুর ব্যানারে ছবি পরিচালনা করেননি তিনি। নার্গিস ছাড়া আর কোন নায়িকাই তার পরিচালনায় দ্বিতীয়বার ফিরে আসেননি। অভিনয় করলেও নার্গিসের বিয়ের পর প্রায় আট বছর তিনি আর পরিচালনায় ফিরে আসেননি। শোনা যায় ব্যর্থ প্রেমের শোকে তার মদ্যপান নাকি বহুগুণ বেড়ে যায়। তিনি বলতেন কৃষ্ণা আমার সন্তানের মা,আর নার্গিস আমার সিনেমার মা। সেই ১৯৬৪-তে 'সঙ্গম'। নায়িকা বৈজয়ন্তিমালা।এই নায়িকার সঙ্গেও ফিল্মের বাইরে অন্তরঙ্গতায় মেতেছিলেন তিনি।ততদিনে হিন্দি ছবির জগতে বেশ পরিবর্তন এসেছে।তার রিফর্মার ফিলজফি খুব যে আর একটা কাজ করবে না এটা তিনি ভালই বুঝলেন। এই ছবি থেকেই তিনি এলেন যৌনতার দর্শন।সুইমিং কস্টিউমে বৈজয়ন্তিমালার স্নানের দৃশ্য দেখলেন নায়ক রাজকাপুর। সঙ্গের গানও হয়ে উঠল যৌন-ইঙ্গিতময়। ফ্যামিলি ড্রামা থেকে সরে ত্রিকোণ প্রেমের ট্রাজেডি। ত্রিভুজের আরেক পুরুষ রাজেন্দ্রকুমার। পরিচালনার আঙ্গিকেও এল বড় বদল আর হলিউড ঘরানার মধ্যে এল ইওরোপিয়ান সিনেমার মডেল। ছবি হল রঙিন। ষাটের দশকের এই প্রণয়ধর্মী চলচ্চিত্রটির কিছু অংশের শুটিং ইউরোপের কয়েকটি দেশ ইতালি, ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডে হয়েছিল। ১৯৬৪ সালেই চলচ্চিত্রটি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৬৮ সালে এটি তুরস্কে, বুলগেরিয়াতে, গ্রিসে এবং হাঙ্গেরিতে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এতদিনকার পরিচালক রাজ কাপুর ঘরানায় এল প্রায় আমূল পরিবর্তন। যৌনতাকে সম্বল করে এগোতে চাইলেন তিনি।

নিজের পরিচালনার ছবিতে আর অভিনয় নয়।এবার 'ববি'তে নায়ক ঋষি পাপুর। নায়িকা হলেন এক নবাগতা---ডিম্পল কাপাডিয়া।টিন এজার প্রেম কহানি।এই ছবির একটি দৃশ্যে ফিরে এল রাজকাপুরের এক অতীত স্মৃতি। কলকাতায় কিশোর রাজ যেভাবে শুভ্রবসনা নার্গিসকে প্রথম দেখেন সেই দৃশ্যই তিনি প্রায় অবিকল ফিরিয়ে আনলেন ডিম্পল বা ববির সঙ্গে নায়ক ঋষির প্রথম দেখায়।ববি-তে ফিরে এক আবার নার্গিস স্মৃতি।'ববি'তে যৌনতা ছিল,কিন্তু রাজ পরিচালিত পরের তিনটি চবি-সত্যম শিবম সুন্দরম, প্রেম রোগ এবং রাম তেরি গঙ্গা ময়লি-তে শুধুই যৌনতা। নানা প্যাটার্ণে।পরিচালক রাজের সেক্স-ফ্যান্টাসি।এখানে উপস্থিতি পরিচালক নয় শুধু শো-ম্যান রাজকাপুরের। একেবারে খোলাখুলি যৌনতা বোম্বাই সিনেমায় আমদানি করলেন রাজ কাপুর 'সত্যম শিবম সুন্দরম'ছবিতে।এই ছবির নায়িকা জিনত সিনে সেক্স-এ এক নতুন ডাইমেনশন নিয়ে এলেন।মুখ বাদ দিয়ে প্রায় নগ্ন শড়ির নিয়েই তিনি সারা স্ক্রিন দাপিয়ে বেড়ালেন।রাজকাপুর বিগ মুভি-মোঘল।তার হাত বেশ লম্বা। জিনতের পরেও 'রাম তেরি গঙ্গা ময়লি' স্তন্যদানের অছিলায় নায়িকা মন্দাকিনির 'বেয়ার-ব্রেস্ট' অনায়াসে পাশ করে দিল সেন্সর। বোম্বাই সিনেমায় নতুন যৌন যুগ আনলেন পরিচালক রাজকাপুর। হিন্দি ছবির যৌন-ইতিহাসে প্রায় বিপ্লব আনল এই ছবি।সুপারহিট হল ছবি।

রাজকাপুরের শরীর সায় দিচ্ছিল না। তাই যেন বিশ্রাম চাইছিল তাঁর শরীর। কয়েক বছর ছবির জগত থেকে একটু আড়ালে। কিন্তু রাজের প্রিয় প্যাশন তো সিনেমাই। তাই নতুন ছবির পরিকল্পনা। হীনা। চিত্রনাট্য লেখার কাজ শেষ। চলছিল নায়িকা খোঁজার কাজ। ইতিমিধ্যে দিল্লি যেতে হল দাদা সাহেব পুরস্কার নেওয়ার জন্যে। মঞ্চ অবধি যেতে পারলেন না। নিজের আসনেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাষ্ট্রপতি মঞ্চ থেকে নেমে এসে তাঁর হাতে তুলে দিলেন দাদা সাহেব পুরস্কার।তারপরেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটর। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির হাসপাতালে। টানা এক মাস বিপদসীমার মধ্যে থেকে মারা গেলেন ভারতের সেরা শোম্যান রাজকাপুর।২ জুন ১৯৮৮।

যেতে নাহি দিব

অনির্বাণ জানা

এইভাবেই কি সবকিছু শেষ হয়? জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে/ বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে। দূর্বার গলায় গানটা মনের মধ্যে বেজে ওঠে। ঝাঁ চকচকে প্রাইভেট সেক্টরের হাসপাতালেও বিশ্রী একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ লেগে থাকে। মৃত্যু যেন আনাচেকানাচে ওঁত পেতে আছে। শশাঙ্কশেখর মনটা অন্য দিকে ঘোরাতে বাইরের অন্ধকারের দিকে চোখ ফেরান। কাচের ওপারে এখন গভীর রাত।

দাদু, আজও তোমার মাথা নেই? রাইএর সাথে দৈনন্দিন কথোপকথন এইভাবেই শুরু হয় শশাঙ্কশেখরের। চোখের ইশারায় জানান আজও রাইএর ঠাকুমা সকাল সকাল তাঁর মাথা চিবিয়ে খেয়েছে।

ধপ করে দাদুর পাশে সোফায় বসে পড়ে রাই- ব্রেকফাস্ট

হয়েছে?

মাথা নাড়ে শশাঙ্ক। তোমার ঠাম্মার হয়েছে, আমার হয়নি।

অর্থাৎ, ঠাম্মা আর দাদুর দুজনেরই কিছু খাওয়া হয়নি। দাদুর মাথা খাওয়াটা ঠাম্মার নাকি ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সবকিছুই। ঠাম্মা ঠাকুরঘরে। সেখান থেকে মন্ত্রপাঠের সাথে সাথে দাদুর উদ্দেশ্যে চোখাচোখা বাক্যবাণ পাঞ্চ হয়ে বসার ঘরে ভেসে আসছে। একবার রাই ঠাম্মাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে পুজোর সময় অন্তত দাদুকে বকাঝকা করা উচিত নয়। ঠাকুর যদি ভুল করে দাদুকে ট্যাগ করে পাঠানো কথাগুলো নিজের মনে করে নেয়। ঠাম্মা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল তরাধামাধব ঠিক বুঝে নেন।দ রাই শেষ চেষ্টা করেছিল পুজো করার সময় তোমার একটু ছাড় দেওয়া উচিত। দ্যাখো না, বড়বড় কোম্পানিগুলো শুদ্ধু পুজোর ছাড় দেয়।

ঠাম্মা বেশ বিরক্ত হয়ে বলেছিল তুই পুরো তোর দাদুর মতো হয়েছিস।

তা একটু শশাঙ্কশেখরের দিক ঘেঁষাই বটে রাই। একমাত্র ছেলে আকাশের একমাত্র কন্যা। ওরা পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। টুইন ফ্ল্যাট। শশাঙ্কশেখরদের ফ্ল্যাটের মিরর সেপ। আকাশ আর বৌমা তিথি, দুজনেরই অফিস কলকাতায়। ওরা পাটুনীতে ফ্ল্যাট নিয়েছে বছর দশেক আগে। শশাঙ্কশেখরের সুগার, প্রেশার, হার্টের সমস্যা ধরা পড়তে কৃষ্ণনগরের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় আকাশদের পাশের ফ্ল্যাটটা কিনে নিয়েছে তিন বছর আগে। যদিও আত্মীয়স্বজন সবাই কৃষ্ণনগরে, তবুও ছেলে পাশে থাকবে এই ভরসায় কলকাতায় চলে এসেছে শশাঙ্কবাবুরা। আর বড়বড় বেসরকারি হাসপাতালগুলো সব বাইপাসের ধারে। এই ফ্ল্যাট থেকে কাছেই হয়।

শশাঙ্কবাবুর স্ত্রী দূর্বা কোনো রোগের বালাই নেই। কিন্তু যোলআনা বাতিকগ্রস্ত। আজ কোমরে ব্যথা, কাল শ্বাসকষ্ট, পরশু পেটের গন্ডগোল লেগেই থাকে। যেন টেলি সিরিয়াল - চলছে তো চলছেই। প্রতি মাসে ই এম আই হিসেবে হরেক কিসিমের ইনভেস্টিগেশনের পিছনে একটা টাকার অঙ্ক ধরা থাকে শশাঙ্কবাবুর। কানাচোখো পরীক্ষানিরীক্ষাগুলো দূর্বাদেবীর শরীরে কোনো রোগই খুঁজে পায় না। বিভিন্ন ধরণের ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনগুলো সাজালে কাশীদাসী মহাভারতও তার কাছে চটিবই লাগবে। আর যতো ডাক্তারবাবুরা দাঁতের শোরুম খুলে জানাবেন তআপনার কোনো রোগ নেই, মনের আনন্দে সব কিছু করুন,দ ততোই দূর্বাদেবী দুর্বোধ্য কারনে এসব শশাঙ্কবাবু চক্রান্ত ভেবে তাঁর হাড়ে নিজের নাম গজিয়ে ছেড়ে দেবে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আলগোছে, বেখেয়ালে শশাঙ্কবাবু যে পরীক্ষানিরীক্ষাই করাক না কেন কিছুনা কিছু গোলমেলে রিপোর্ট বেরোবেই বেরোবে।

হায়ার সেকেন্ডারির প্রশ্নপত্রের মতো একপাতা পরীক্ষার লিস্ট নিয়ে এক ডাক্তারবাবুর সাগরেদ রক্তচোষা এসেছিল দূর্বার রক্ত টানতে। চলতি নিয়ম অনুযায়ী একটার সাথে একটা ফ্রির চক্করে শশাঙ্কবাবুরও রক্ত পরীক্ষা হয়েছিল। সস্তা হোটেলের রান্নার মতো রক্তে চিনি- তেল সবই বেশি বেশি তার। ব্যস, আর যায় কোথায়! যেন দূর্বা যে সাবজেক্ট নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করছে, শশাঙ্কবাবু যে সেই সাবজেক্টে পি এইচ ডি করা, সে তথ্যটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পারলে তথ্য গোপন করার দায়ে শশাঙ্কবাবুর জেল-হাজত হয়ে যায়। একমাত্র স্বামী বলে দূর্বা দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে।

শশাঙ্কবাবু ছোটবেলায় ভাল ফুটবল খেলতেন। অফিসের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে ওর প্রাইজ বাঁধা ছিল। রিটায়ারমেন্টের পর প্রতিদিন সকালবেলায় ছুটতে বেরোয়। ওর বয়সী মর্নিংওয়াকের লোকেদের পাশ দিয়ে এখনো সগর্বে ছুটে বেরিয়ে যান শশাঙ্কবাবু। ইদানীং একটু অবশ্য বুকে চাপ লাগছিল। কি কুক্ষণে যে কথাটা আকাশকে বলেছিলো! আকাশ সেই সপ্তাহে কৃষ্ণনগরে গিয়ে প্রায় জোর করেই একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ইসিজিতে হার্টের ব্যামো ধরা পড়েছে।

পড়েছে তো কি হবে? কয়েক বছর আগেও দূর্বা যখন রাগ করে বোনের বাড়ি বা কলকাতায় ছেলের বাড়ি চলে যেত শশাঙ্কবাবু মেহফিল সাজিয়ে বসত। পছন্দসই সুরার সঙ্গে মোবাইলে রাখা মেহেদী হাসান অথবা জগজিৎ সিং- এর গজল নিয়ে কোয়ালিটি টাইম কাটানো যেত। গান নিয়ে শশাঙ্কবাবুর একটা অবশেসন আছে। ভাল গান পেলে শশাঙ্কবাবু আর কিছু চাননা। আর সত্যি কথা বলতে কি, এতো অশান্তি সত্ত্বেও দূর্বাকে ভালবাসার কারণ ওর গানের গলা। এখনো যখন খালি গলায় কোনো এক অপার্থিব সন্ধেয় তআমি রূপে তোমায় ভোলাবো নাদ গেয়ে ওঠে তখন প্রতিটি শব্দ সুরের ছোঁয়া মেখে ফ্ল্যাটের তেরশো স্কোয়ার ফিট ছাড়িয়ে বাইরে আধো অন্ধকারে হাজারটা জোনাকির আলো নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অফিস ফেরতা ক্লান্ত পথিক, থরথর বয়সের নতুন প্রেমিক -প্রেমিকা, নিতান্তই নেইকাজ চলনদার চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই গানমাখা জোনাকিগুলোর আলোর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে তারা।

সে যাইহোক, রোগবালাই-এর এই অনৈতিক পক্ষপাতিত্বে দূর্বা মোটেই খুশি হয়না। মাঝেমাঝে বেশ রাগ দেখিয়ে বলে ততুমি তো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হয়ে গেলে গো! সবই তো তোমার শরীরে পাওয়া যায়।দ আজও রেগে যাওয়ার কারণ আছে। শশাঙ্কবাবুর হল্টার মনিটরিং বলে একটা টেস্ট হয়েছিল। আজ সকালেই তার রিপোর্ট এসেছে। রিপোর্টটা মোটেই সুবিধের নয়। তার ওপর রেখামাসি আজ ডুব দিয়েছে। এরকম অবস্থায়

সাধারণত শশাঙ্কবাবুকে চা বিস্কুট এগিয়ে দিয়ে দূর্বাদেবী পূজোয় বসেন। আজ অসহযোগ আন্দোলন দূর্বার।

রাই ঠাম্মার রান্নাঘরে ঢুকে যায়। দাদু সুগার ফ্রির কৌটোটা অনেকটা উঁচুতে তুলে রাখে। ঠাম্মার যাতে পাড়তে কষ্ট হয়। না পেরে অনেক সময় রেগে গিয়ে চিনি দিয়েই চা করে দাদুকে দেয়। সুগার ফ্রির কৌটোটা পাড়তে পাড়তে রাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ঠাম্মা আর দাদুর এই ঝগড়াটা ওর একদমই পছন্দ নয়।

অ্যাসিড, অ্যাসিড। আর কিছু নয়। নিজের বুকের চাপচাপ ব্যথাটাকেই মনে মনে গালি দেয় দূর্বা। তার মানে লোকটার ভেতর ভেতর কতো কষ্ট। মনটা বেজায় খারাপ দূর্বার। আজও শশাঙ্ক জিতে গেল। লোকটা সেদিন হাঁফাচ্ছিল দেখে বৌমা বাইপাসের ধারে একটা হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল। এমনিতে তো হার্টের ব্যামো আছেই, সুগারও বেশি। পেসমেকার বসাতে হতে পারে জানিয়ে ডাক্তার হল্টার করতে বলেছিল। আর সেখানেও লোকটা জিতে বসে রইল। ঠাকুরকে ফুলটা দিতে গিয়ে বুকটা হু হু করে ওঠে দূর্বার। শশাঙ্ককে ছাড়া নিজের জীবন ভাবতে পারে না যে।

কোন ছোটবেলার সম্পর্ক। সেই সময়টাই ছিল রোমান্টিক। সাতের দশকের প্রথম দিক। উত্তম-সুচিত্রার একের পর এক হিট ছবি বেরোচ্ছে। সাড়েচুয়াত্তর, সপ্তপদী, বিপাশা, সবার উপরে, সাগরিকা । ভালোবাসায় টইটুম্বুর। তখন কিছু কিছু মাসিক পত্রিকা উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে নিষিদ্ধ বই- কাকার ঘর থেকে লুকিয়ে এনে চুপিচুপি পড়ার নিষিদ্ধ আনন্দ। টিভি সবে আসি আসি করছে। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা মানে বাড়ি জুড়ে উত্তেজনা। দূর্বাদের ঘটি বাড়ি। শশাঙ্করা বাঙাল। তবে দুবাড়িই বৈদ্য। গুপ্ত আর চৌধুরী। শশাঙ্কশেখর ছিল কাকার বন্ধু। কাকা দূর্বার থেকে খুব একটা বড় ছিল না। সেইসময় এরকম হত। কাকা ভাইঝি প্রায় পিঠোপিঠি। কাকার সঙ্গে দূর্বার সবথেকে বেশি বন্ধুত্ব ছিল।

শশাঙ্কশেখর ছিল একটা ঝড়ের মতো। যখনই আসত হইচই করে মাতিয়ে রাখত। দারুণ ফুটবল খেলত। কাকার সঙ্গে দুএকবার শশাঙ্কর খেলাও দেখতে গিয়েছিল দূর্বা। এরকম ঝকঝকে ছেলের অ্যাডমায়ারার ছিল প্রচুর। তবে সেযুগে একটা সুবিধে ছিল- মেয়েরা আজকালকার মতো ছেলেদের সাথে ধিঙ্গীপণা করতে পারত না।

সেদিনটা ছিল অদ্ভুত একদিন। মোহনবাগান পাঁচ গোলে হেরেছে। কাকা, বাবা, দুইজ্যেঠু আর বাড়িতে সব ছেলেরা একদম চুপচাপ। শশাঙ্ক একটা ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে উপস্থিত। কাকা ঘরের ভেতর থেকে দূর্বাকে বলে যে শশাঙ্ককে যেন জানিয়ে দেয় ওরা কেউ বাড়ি নেই। দূর্বাও প্রায় বাবু বললেন -বাবু বাড়ি নেইদ ভাবে শশাঙ্ককে কথাটা বলে।

শশাঙ্ক খপ করে দূর্বার হাতটা ধরে বলে মিথ্যে কথা বললে কি হয় জানো? কি হয়? মোহনবাগান এতো বিশ্রীভাবে হারায় দূর্বারও মনমেজাজ খারাপ ছিল।

তনাকে ফোঁড়া হয় ।দ শশাঙ্ক বলে। তএতো মিষ্টি মুখে নাকের ওপর একটা ধ্যাবড়া ফোঁড়া উঠলে কিরকম লাগে দেখি তো?দ মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল শশাঙ্ক।

তখন দূর্বা আঠারো হবে। বয়সটা বেশ গোলমেলে। একটা সুঠাম, সুদর্শন যুবক যখন আঠারো বছরের কোনো মেয়েকে বলে ফেলে যে তার মুখটা মিষ্টি তখন সেই মেয়েটির যে কি হয় তা দূর্বা সেদিন বুঝেছিল। একটা নাবাল জমিতে বর্ষার নতুন জল যেমন ধিরে ধিরে গড়িয়ে পড়ে, তেমনি এক ভালোলাগা দূর্বাকে আস্তে আস্তে ডুবিয়ে দিয়েছিল। ভালোলাগার একটা বিপরীতমুখী অধিকার বোধ আছে। দূর্বা মনে মনে দাগিয়ে রাখে শশাঙ্ক নামের এই ছেলেটি তার, একান্ত ভাবেই তার। আর কোনো কথা হয়নি। দরজাটা প্রায় শশাঙ্কর মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়ে এসে নিজের ঘরে শুয়ে আকুল ভাবে কেঁদেছিল দূর্বা। কাকা একবার উঁকি মেরেছিল। অঙ্কের সোজা হিসেবে ধরে নিয়েছিল মোহনবাগানের এক ডাইহার্ড সাপোর্টার পাঁচ গোলে হেরে যাওয়া ঠিক মেনে নিতে পারছে না।

তারপরেও দিন কেটেছে, সপ্তাহ গেছে, মাস ঘুরেছে - দূর্বা নিজের ভেতরের কথা ভেতরেই রেখে দিয়েছে। এই সময়ে আরেক ঠাকুরকে গভীর ভাবে জানতে শুরু করে দূর্বা। এমনিতে গানের গলা ভাল ওর। রবি ঠাকুরের গানে যেন নিজের আকুতিগুলো খুঁজে পাচ্ছিল সে। এরকমই এক কনে দেখা গোধূলিতে আপন খেয়ালে আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়দ গাইছিল দূর্বা। শশাঙ্ক কখন এসেছে খেয়াল করেনি। খেয়াল হল যখন দেখলো শশাঙ্ক মন্ত্রমুগ্ধের মতো চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেদের চোখ পড়তে পারার ক্ষমতা সব মেয়েদেরই থাকে। অনেকক্ষণ চোখে চোখ ছিল দুজনের। শশাঙ্কের চোখে আঁকা ছিল মুগ্ধতা।

তারপর স্রোতের মতো দিন কেটেছে। শশাঙ্ক প্রায়শই গান শুনতে আসত। গান শোনাতে প্রথম দিকে কার্পণ্য করেনি দূর্বা। বুঝত শশাঙ্ক কিছু বলার অছিলা খুঁজছে। দূর্বা সময় নিয়েছে। শশাঙ্ক অস্থির হয়ে নিরালা খুঁজেছে। কাকা সেদিন ছিল না। কাকার ঘরে বইগুলো গুছিয়ে দিচ্ছিল দূর্বা। শশাঙ্কর আসার একটা সম্ভাবনা ছিল। সাধারণত বিকেলের পরে মাঝেমধ্যে কাকার সঙ্গে আড্ডা দিত ও। নিচ থেকে সোজা কাকার ঘরে চলে আসত শশাঙ্ক। সেদিন অবচেতনে হয়তো শশাঙ্কর সাথে একলা দেখা

হওয়াটা চেয়েছিল দূর্বা। কাকা নেই শশাঙ্ক জানত না।

- সেকি ভেলটুস নেই?দ দুর্বোধ্য কারনে কাকাকে ভেলটুস বলে ডাকতো শশাঙ্কশেখর।

বইগুলোর ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে না বলেছিল দূর্বা। শশাঙ্ক ঘর থেকে বেরিয়ে যায়নি। দূর্বা জানত ও যাবেনা। ততোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল, দূর্বা।

দূর্বা চুপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। তআমার দিকে একবার তাকাবে, দূর্বা?দ দূর্বা তাকায়নি। কিন্তু কানে তখন চারপাঁচটা অ্যান্টেনা ঝুলিয়ে দিয়েছে - একটা কথাও না হারিয়ে যায়।

শশাঙ্ক ধীরে ধীরে আবৃত্তি করেছিল - তপ্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস- / তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।দ পরের কথাগুলো যেমন যেমন ভেবে রেখে ছিল দূর্বা সেভাবেই ভালোলাগার কথা জানিয়ে দেয় শশাঙ্ক - একেবারে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন মিলিয়ে।

বাঙালী নারীদের 'হ্যাঁ' বলতে নেই। দূর্বাও বলেনি। মাঝখান থেকে শশাঙ্ক দাড়ি রাখা শুরু করলো, রোগাও বেশ খানিকটা হয়ে গেলো। দূর্বাদের বাড়ি আসাটাও অস্বাভাবিক রকম ঘনঘন হয়ে গেলো। দাড়ি বেশ বড়সড় হতে দূর্বারও কেমন যেন অস্বস্তি শুরু হল। উকুনে বেজায় ভয় দূর্বার। অগত্যা আরেকটা কনেদেখা বিকেলের আলোয় গাইতে হল তজয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না/ হায় ভীরু প্রেম হায় রে।দ অনেক কিছু শর্ত চাপিয়ে দিয়ে 'হ্যাঁ' বলছিল দূর্বা।

এখনো কেউ জানে না বিয়ের আগে দূর্বার শশাঙ্কর সঙ্গে প্রেম ছিল। শশাঙ্কশেখর অনেক প্ল্যান করে সমস্ত ব্যাপারটাকে অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজের আকৃতি দিতে পেরেছিল। আর সেটাই ছিল দূর্বার শর্ত। কাকা কিছুটা সন্দেহ করলেও হাতে গরম কোনো প্রমাণ পায়নি।

বিয়ের দিন শশাঙ্কর পাশে বসে বুকে একটা চিনচিনে ব্যথা হয়েছিল দূর্বার। ভালোলাগার ব্যথা। এই মানুষটি অবশেষে আমার। একটু একটু করে খোলস ছাড়ানোর মতো করে জেনেছিল শশাঙ্ককে।

আকাশ পেটে আসতেও ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়েছিল ও। সারারাত দূর্বার পেটে কান দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছিল আকাশের হৃদস্পন্দন। বুকজোড়া ভালবাসা নিয়ে দূর্বাও জেগেছিল। এক আকাশ ভালবাসায় নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল দূর্বার।

সেই ব্যথাটা যেন আবারও ফিরে এসেছে আজ। অথচ দূর্বার বুকের ব্যথাটা অনেকদিনের। নিশ্বাসের কষ্টটাও তাই। দূর্বার অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে। কোথাও কোনো দোষ নেই। ও শুধু চায়- শশাঙ্কর আগে ওই যেন মারা যায়। এই শ্বাসবন্ধ হয়ে আসা শশাঙ্কর প্রতি ভালবাসা আর বুকের ভেতর ভালোলাগার যন্ত্রণা নিয়ে। ওই মানুষটাকে ছাড়া জীবন কিকরে যাপন করবেন দূর্বা? অথচ মানুষটা যেন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। একটার পর একটা রোগ ধরা পড়ছে। ঈশ্বরের পায়ে পড়ে যত আগল বাঁধে, ততই যেন শশাঙ্ক বাঁধন আলগা করার কৌশল শিখে যান।

আজও হার্টে মারাত্মক একটা দোষ ধরা পড়েছে শশাঙ্কর। তার ওপর সুগার। তাও সকাল থেকে বায়না ধরে বসে আছে যে চিনি দেওয়া চা খাবে। নিজের আর কি? যে থেকে যাবে তারই তো যন্ত্রণা। রাগ করে পুজোয় বসেছেন দূর্বা। আজ যেন কান্নায় বুকের ভেতরে চাপ ধরে আছে। রাই এসেছে, নাতনি। পুজোয় মন বসে না দূর্বার। পুজো থেকে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়েন দূর্বা। বড্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে যেন।

ঠাম্মা, তোমার শরীর খারাপ লাগছে? - রাই এসে মাথার কাছে দাঁড়ায়।

আমায় আর জ্বালাস না তো। - ঝাঁঝিয়ে ওঠেন দূর্বা। -কিচ্ছু হয়নি। আমার মন খারাপ। তুই দরজা টেনে চলে যা।

নাতনির চলে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পান দূর্বা। দাদুর সঙ্গে মোবাইল নিয়ে খেলা চলবে এবার। বুড়োটা জাদু জানে। নাতনিও ওর ফ্যান। আবার একটা ভালোলাগার যন্ত্রণা শুরু হয় বুকের ভেতর। কষ্টে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে টলে পড়েন দূর্বা। একটা কালো পর্দা চেতনার ওপর এসে পড়ে। মাঝেমাঝে ঝিলমিল আলোর ফুলঝুরি। ঘন অন্ধকারের কাছে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করেন দূর্বা।

বাড়ি ফেরেননি শশাঙ্কশেখর। বাইপাসের ধারের এই হাসপাতালের তলার লাউঞ্জটা বেশ বড়সড়। এককোণে একটা বিশাল অ্যাকোয়ারিয়াম। তার পাশে একটা সোফায় ঠায় বসে কেটে গেছে গোটা রাত। ওপরের কোনো একটা ঘরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে দূর্বা। শশাঙ্ক কি করে ওকে একলা ছেড়ে চলে আসতে পারেন ? কার টানে ফ্ল্যাটে ফিরবেন ?

অভিমানও হয়। এমনি সময়ে রোগ রোগ করে পাগল করে দেয়। আর সত্যিকারের যখন হার্টে অতবড় অ্যাটাক হল তখন কেন মুখ বুজে সহ্য করে গেল। ডাক্তারবাবুরা বললেন ইনফার্কশন বা অ্যাটাকটা হয়েছিল বেশ আগে। উনি না জানিয়ে সময়টা নষ্ট করেছেন। শশাঙ্ক কাঁদতে পারেন না। কাচ দিয়ে ঘেরা লাউঞ্জের বাইরের ঘন আঁধারকে ফিকে হয়ে যেতে দেখেন। স্মৃতিগুলো অচেনা হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে উড়তে থাকে। পুরো এক জীবনজোড়া স্মৃতি। ভোর হওয়া দেখতে দেখতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন শশাঙ্কশেখর। হঠাৎ চমকে দিয়ে দূর্বার গলায় ফোনটা বেজে ওঠে রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে/ তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহানার ধারে। রিংটোনটা দূর্বার গলার গানেই করে রেখেছিলেন শশাঙ্ক। একটা অচেনা নাম্বার থেকে কল। ধরতে গিয়ে হাত কেঁপে যায় শশাঙ্কশেখরের।

- হাসপাতাল থেকে বলছি। আপনি সিকিউরিটিকে বলে একবার তাড়াতাড়ি ওপরে চলে আসুন।

শশাঙ্কশেখর একরাশ স্মৃতির মধ্যে পথভুলে দাঁড়িয়ে থাকেন। একলা।

হাওয়া বদল

অর্পিতা ঘোষ পালিত

আজ তৃষার বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলতেই, ঋজুর ঘর থেকে কথার আওয়াজ শুনতে পেল। এত তাড়াতাড়ি তো দীপ বাড়ি ফেরে না। রাত এগারোটা বাজলে তবে বাড়ির কথা মনে পড়ে দীপের। অফিস থেকে বেরিয়ে ক্লাবে আড্ডা দিয়ে তবে বাড়ি ফেরে। তার - মানে মালতিদি এখনো আছে। আজ ওর দেরি হচ্ছে দেখে মালতিদি এখনো ঋজুকে একা রেখে ওর বাড়ি যায়নি। অন্যদিন রাত ন'টা বাজলে কিছুতেই মালতিদিকে আটকে রাখা যায় না। কেননা ওকে অনেকটা পথ যেতে হয়, এখান থেকে ওর বাড়ি যেতে, বাসে এক ঘণ্টার মতো সময় লাগে। যাতায়াতের জন্য অটো থাকলেও বাসেই যাতায়াত করে মালতিদি, ভাড়া কম লাগে বলে। তৃষা ভাবল, আজ দশটা বাজতে চলল, এখনো মালতিদি যায়নি দেখে একটু খুশিই হল। মালতিদিকে আজ অটো ভাড়া দিয়ে দেবে আর ওর ছেলের জন্য হোটেল থেকে রুটি তরকা কিনে নিতে বলবে। ব্যাগটা রেখে ঋজুর ঘরের দরজা খুলতে খুলতে মালতিদির উদ্দেশে বলল, 'আজ আজ তৃষার বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলতেই, ঋজুর ঘর থেকে কথার আওয়াজ শুনতে পেল। এত তাড়াতাড়ি তো দীপ বাড়ি ফেরে না। রাত এগারোটা বাজলে তবে বাড়ির কথা মনে পড়ে দীপের। অফিস থেকে বেরিয়ে ক্লাবে আড্ডা দিয়ে তবে বাড়ি ফেরে। তার - মানে মালতিদি এখনো আছে। আজ ওর দেরি হচ্ছে দেখে মালতিদি এখনো ঋজুকে একা রেখে ওর বাড়ি যায়নি। অন্যদিন রাত ন'টা বাজলে কিছুতেই মালতিদিকে আটকে রাখা

যায় না। কেননা ওকে অনেকটা পথ যেতে হয়, এখান থেকে ওর বাড়ি যেতে, বাসে এক ঘণ্টার মতো সময় লাগে। যাতায়াতের জন্য অটো থাকলেও বাসেই যাতায়াত করে মালতিদি, ভাড়া কম লাগে বলে। তৃষা ভাবল, আজ দশটা বাজতে চলল, এখনো মালতিদি যায়নি দেখে একটু খুশিই হল। মালতিদিকে আজ অটো ভাড়া দিয়ে দেবে আর ওর ছেলের জন্য হোটেল থেকে রুটি তরকা কিনে নিতে বলবে। ব্যাগটা রেখে ঋজুর ঘরের দরজা খুলতে খুলতে মালতিদির উদ্দেশে বলল, 'আজ তোমাকে অনেক দেরি করিয়ে দিলাম মালতিদি, আসলে অফিসের পরে মিটিং ছিল। তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।' ঘরে ঢুকেই থতমত খেল তৃষা। ঘরে তো অন্য কেউ নেই ? ঋজু তাহলে কার সঙ্গে কথা বলছিল ? ওর কাছে মোবাইলও তো নেই। জিজ্ঞাসা করল, 'কার সাথে কথা বলছিলি ঋজু?'

থতমত খেয়ে ঋজু বলল ,'কই, কারোর সাথে কথা বলিনি তো। আমি তো এতক্ষণ পড়া প্র্যাকটিস করছিলাম।'

অবিশ্বাসের চোখে দশ বছরের ঋজুর মুখের দিকে তাকিয়ে তৃষা বলল ,'সব হোমটাস্ক কমপ্লিট হয়ে গেছে?'

,'হ্যাঁ মাম্মাম'

আর একবার ঋজুর মুখের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তৃষা।

বেশ কয়েকবার ঋজুর স্কুল থেকে গার্জেন কল এসেছিল। দীপের এসব দিকে নজর দেওয়ার একদম সময় নেই। তৃষারও অফিসে এত কাজের চাপ তাই যাওয়া হচ্ছে না। দুপুরে একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইল দেখছিল তৃষা, সে'সময় একটা কল এল। কলার আইডিতে ঋজুর স্কুলের নাম দেখে তৃষা ভাবল, ওই আবার ফোন করেছে, কি এমন ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যে ফোনে বলা যাবে না! স্কুলে যেতেই হবে। স্কুল আর অফিসের টাইম একই বলে আরও যাওয়া হচ্ছে না। ফোন রিসিভ করে বলল ,'আমি তৃষা, ঋজুর মা বলছি।'

ওপাশ থেকে আওয়াজ এল,'ম্যাডাম আপনাকে অনেকবার আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে, কিন্তু আপনি আমাদের কথাটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ঋজুর ভবিষ্যতের কথা যদি আপনারা অভিভাবকরা চিন্তা করেন, তাহলে অবিলম্বে অবশ্যই তাড়াতাড়ি দেখা করবেন।'

ফোনটা কেটে দিল। বেশ গুরুতর কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে। কাল অফিসে আসার আগে স্কুলে কথা বলবে।

আজকাল ঋজু পড়া শেষ হলেই, রাতের খাবার তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে। ওর কিছু হলে দেখে বোঝা যেত। দিব্যি সুস্থ ছেলে। তবে আগের থেকে চুপচাপ হয়ে গেছে, নিজের খেয়ালে থাকে। আসলে বড় হচ্ছে তো, তাই দুষ্টুমি কমে গেছে। রাতে খাবার টেবিলে তৃষা দীপকে বলল ,'তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। ঋজুর স্কুল থেকে বেশ ক'বার ফোন করে দেখা করতে বলেছিল। তোমার কাজের চাপ বলে তোমাকে বলিনি। ইয়ার এন্ডিংয়ে অফিসের ঝামেলায় আমারও যাওয়া হচ্ছে না। আজ আবার ফোন এসেছিল। মনে হচ্ছে স্কুলে দুষ্টুমি করেছে, তাই এতবার করে ডাকছে। কি জানি কি শুনতে হবে। নিজের অফিসের ঝামেলা তার ওপর নালিশ শুনতে কাল আবার যেতে হবে। আর নিতে পারছি না।'

,'ডেকেছে যখন যেতে তো হবেই। কাল গিয়ে দেখো কি বলে। পড়াশোনা ঠিকঠাক করছে তো?'

,'পড়াশোনার দিকে মনে হয় কোনোরকম ফাঁকি দিচ্ছে না। দিলে প্রাইভেট টিউটর বলত।'

,'তাহলে কি ব্যাপারে ডেকেছে? কারোর সঙ্গে মারপিট করেনি তো?'

,'কি জানি, কাল গেলেই জানতে পারব।'

,'ঠিক আছে কাল আমিও তোমার সঙ্গে যাব। এতদিন ধরে যখন ডাকছে তখন নিশ্চয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে।'

দীপের কথা শুনে খুব খুশি হল তৃষা। ও সবসময় নিজের কাজ আর ক্লাব নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ওর কাছ থেকে এতটা পাবে আশা করেনি, কেননা ঋজুর পুরো দিকটা তৃষাই দেখে। ছেলের পড়াশোনার খোঁজ খবর নেওয়া ছাড়া, আর সেরকম কোনো খোঁজ খবর নেয় না।

ঋজুকে নিয়ে একটা বাজে স্বপ্ন দেখে রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তৃষার, ধরফর করে উঠে বসে। মনের মধ্যে তোলপাড় হতে থাকে, স্বপ্নের রেশ কাটছে না। পাশে দীপ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওকে ডেকে বিরক্ত করে না। চোখে মুখে জল দিলে ভালো লাগবে ভেবে খাট থেকে নামে। এটাচ বাথরুমে চোখে মুখে জল দিয়ে, ঘুমন্ত ঋজুকে একঝলক দেখার জন্য ওর ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। শোনে, ঋজু বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। পা টিপে টিপে ওর খাটের পাশে দাঁড়ায়। দেখে, ওর নিজের হাতে আঁকা একটা ফটোর ওপর হাত রেখে ঘুমের ঘোরে বকবক করছে। শোনার জন্য মাথা নিচু করে কান পাতে তৃষা। সব কথা বোঝা যাচ্ছে না, কাটা কাটা কটা শব্দ ছাড়া, 'ইউ আর মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডখ হু এলস আই হ্যাভ?'

ঋজুকে আগে কখনো ঘুমের ঘোরে কারোর সঙ্গে কথা বলতে শোনেনি। অবশ্য চার-বছর ধরে পাশের ঘরে একা শোয় ঋজু। আগে না ঘুমানো পর্যন্ত ওর পাশে শুয়ে থাকত তৃষা। এখন একা থাকতে থাকতে ওর অভ্যাস হয়ে গেছে। স্কুলে কোনো বন্ধুর সঙ্গে কি ওর ঝগড়া হয়েছে? ও যতদূর জানে, শিশু-কিশোররা কারোর ওপর রাগ করলে, তা মুহূর্তেই ভুলে গিয়ে আবার আপন করে নেয়। বোঝা যাচ্ছে না কী এমন ঘটনা ঘটেছে। কাল ওর স্কুলে গিয়ে ক্লাস টিচারের সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

ঋজুর স্কুলে যখন তৃষা আর দীপ গেল তখন ফার্স্ট পিরিয়ড চলছে, ঋজু ক্লাসে। হেড স্যারের রুমে যাওয়ার পর, তিনি নানান কথা বলে ওদের জ্ঞান দিলেনখ 'বর্তমান যুগের মা বাবারা তাদের বাচ্চাদের প্রতি একদম কেয়ার নেয় না। ওদের কিশোর মন, পরিবারের কাছ থেকে যা চায় তা না পেলে ডিপ্রেসনে চলে যায়। অভিভাবকেরা নিজের কেরিয়ার, প্রমোশন আর স্ট্যাটাস নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কাজের লোকের ওপর বাচ্চার দায়িত্ব দিয়ে ভাবেন নিজেদের কর্তব্য শেষ। কীভাবে

বাচ্চার দেখভাল করতে হয়, তাদের কীভাবে কেয়ার নিতে হয়, এতসব কি কাজের লোকের দ্বারা সম্ভব ? কখনোই নয়। বাচ্চার ভালোবাসার সাথি হতে ওরা কখনোই পারে না। ওরা শুধু পয়সার জন্য আপনার বাড়িতে চাকরি করতে এসেছে, জানবেন। আপনি সারাদিন বাইরে কাজ করেন। পরিস্থিতির কারণে বাচ্চা সারাদিন কাজের লোকের কাছে থাকলেও বাড়ি ফিরে ওর সঙ্গে গল্পের ছলে সারাদিন কী করেছে এইসব খোঁজ খবর নেবেন। আজকালকার মা বাবারা অনেকেই এসব বিষয়কে গুরুত্ব দেয় না। প্রত্যেকটা শিশু কিশোরের মন পবিত্র, আমরা চাই প্রত্যেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন পাক।' বিশাল বক্তব্য শেষ হতে না হতেই ক্লাস শেষ হওয়ায় ঘন্টা পড়ল। এবার তিনি ঋজুর ক্লাস টিচারকে ডাক দিলেন।

তিনি এসেও দীপ আর তৃষাকে নানা কথা বললেন, 'ঋজু কম কথা বলে, কারোর সঙ্গে মেশে না, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় না। সবাইকে ওর শত্রু ভাবে। সবসময় নিজের হাতে আঁকা একটা ফটোর সঙ্গে গল্প করে। ওনার প্রশ্নের উত্তরে ঋজু বলেছে যে, ওকে কেউ ভালোবাসে না, একমাত্র ফটোতে আঁকা ওর বন্ধু ছাড়া!

এরপর, হেড স্যার ও ক্লাস টিচার বললেন, 'ঋজুকে ভালো কোনো সাইকোজিস্টকে দেখাতে। কেননা ওর আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, ও সাইকো পেশেন্ট।'

এসব কী শুনছে ওরা, ওদের ঋজু সাইকো পেশেন্ট ! মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল তৃষা। দীপ খেয়াল করে ধরে ফেলে। তৃষা ভাবে, ঋজু যদি বলেও থাকে, ওকে কেউ ভালোবাসে না। তাই বলে ওকে সাইকো পেশেন্ট বলবে ! এতবড় কথা বলার সাহস পেল কোথা থেকে।' দীপ, তৃষাকে হাত ধরে স্কুলের বাইরে নিয়ে এল।

তৃষাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে দীপ অফিসে গেল। তৃষা আর অফিসে গেল না। শরীর ও মন দুটোই খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। যতই স্কুলের স্যারের কথায় ওরা রেগে যাক, তবু ওদের সম্পর্কে অনেকটাই ঠিক বলেছেন উনি। সত্যিই তো, ও আর দীপ কতটা খেয়াল রাখে ঋজুর। সবকিছুই তো মালতিদি দেখে। ফ্ল্যাটের কলিংবেল বাজানোর বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ ডলতে ডলতে মালতিদি দরজা খুলল। ওকে দেখে থতমত খেয়ে গেল। পাশ কাটিয়ে তৃষা ড্রইংরুমে ঢোকে, সেখানে জোরে টিভি চলছে। টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিল মালতিদি। সে না হয় ঘুমাচ্ছিল, তাই বলে খাটের ওপর থেকে ওর বালিশ নিয়ে এসে শোবে ! এতদিন মালতিদির মাথায় দেওয়া বালিশ নিয়ে ও আবার রাতে শুয়েছে। ভাবতেই ঘেন্নায় গা রি-রি করে উঠল। মালতিদিকে তৃষা বিশ্বাস করত ও ভালোবাসত। এই তার প্রতিদান। তৃষা মুখে কিছুই বলল না, কেননা মালতিদি সারাদিন বাড়িতে একাই থাকে, ঋজুকে দেখাশোনা করে। কাজ ছেড়ে দিলে বিশ্বাসী লোক পাওয়া মুশকিল। মালতিদির মুখের দিকে তাকাতে, লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল।

সেদিন থেকেই বাড়ির নিয়ম সম্পূর্ণ বদলে গেল। দীপ অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে এল, এসেই ঋজুর ঘরে ঢুকল। পাপাকে ওর ঘরে আসতে দেখে ঋজুর চোখে মুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।
দীপ একটা প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল ,'এটা তোর জন্য'
ঋজু ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে নিল।
দীপ ,'ভেতরে কি আছে দেখলি না?'

ঋজু প্যাকেট খুলতেই টিনটিনের দুটো বই বেরিয়ে পড়লো। প্রচ্ছদে জ্বলজ্বল করছে রিপোর্টার ও অভিযাত্রী টিনটিন, তার কুকুর স্নোয়ি আর ক্যাপ্টেন হ্যাডক। যাদের সঙ্গে নিয়ে টিনটিন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়।

ঋজুর ভয় পাওয়া মুখ বদল হয়ে হাসিতে ঝলমল করে উঠল , খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলল ,'থ্যান্ক ইউ পাপা, আই লাভ ইউ পাপা'।

ঋজুর খুশি দেখে দীপের মুখেও হাসি খেলে গেল। এই সামান্য উপহারটুকু পেলে ছোটোরা যে কী খুশি হয় সেটা ও ভুলে গিয়েছিল। ও নিজেও তো একসময় ঋজুর মতো ছিল। ছোটোবেলায় ও নিজে অ্যার্জের টিনটিন, কুট্টুস, যাকে ইংরেজিতে স্নোয়ি নামে ডাকা হয়, আর ক্যাপ্টেন হ্যাডক, প্রফেসর ক্যালকুলাস, জনসন, রনসন নামে দুই যমজ এইসব চরিত্র-গুলোর প্রত্যেকটা গল্প গুলে খেয়েছে। আজ অফিস থেকে ফেরার সময় নিজের ছোটোবেলার কথা মনে পড়ল, তাই বুক স্টলে গিয়ে ঋজুর জন্য খুশিটুকু নিয়ে এল।

দীপ পেছন ফিরতেই দেখে দরজায় তৃষা। ফ্রেশ হয়ে আসতেই হাসিমুখে তৃষা বলল ,'তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি। তোমার দৌলতে প্রথম দিনেই ঋজুর হাসিমুখ দেখলাম। ঋজু কতদিন পর আজ তোমাকে ভালোবাসি বলল।'
,'আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। ওকে যে আমরা খুব ভালোবাসি, আভাসে ইঙ্গিতে তা বোঝাতে হবে। তবে ডাক্তারের কাছে একবার যেতে হবে।'
,'আমরা দুজনে আমাদের একমাত্র সন্তানকে ঠিক ডিপ্রেশন থেকে মুক্ত করতে পারব।'

এর মাস দেড়েক পর ঋজুকে নিয়ে ছোটোখাটো ট্যুরে পাঁচদিনের জন্যে আরাকু- বিশাখাপত্তনম গেল তৃষা আর দীপ। ঋজু বড় হওয়ার পর অনেকদিন এরকম বেড়াতে যাওয়া হয়নি। ওখানে যে কদিন ছিল ঋজু যেন আনন্দে টগবগ করে ফুটছিল। ঋজুর খুশি দেখে দীপ আর তৃষা ঠিক করল, প্রত্যেক পুজোর ছুটিতে এখন থেকে দেশ-ভ্রমণে বেরোবে। এতে যেমন নিজেরা রিল্যাক্স হতে পারবে তেমন ঋজুও খুব আনন্দ পাবে।

শোক

রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

'খবর হল ?'

'না।'

ইশ, হাতটা নিশপিশ করে উঠল মাখনবাবুর। এখনো কিছু হল না। ওদিকে দ্যাখো, গত দুদিন ধরে এই হয়ে গেল, এই হয়ে গেল রব। যেন ঘাটের সামনে মা দুর্গাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঢাকি বাজাচ্ছে ' ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ, ঠাকুর যাবি বিসর্জন ' কিন্তু জলে আর ফেলছে না।

নাঃ, উপমাটা তো বেশ ভালো এল মনে। টুক করে ফোন খুলে লিখে রেখে দিলেন। লিখে লেখাটার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন। কখন কোথায় কাজে লেগে যায়, কে বলতে পারে। এইযে এখন যেমন জমিয়ে লিখেছেন বিখ্যাত কবির 'অঙ্খ বিচুয়ারি।'যেদিন খবর পেয়েছেন যে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে সেদিনই গুছিয়ে বাগিয়ে লিখে ফেলেছেন। নেট ঘেঁটে দু-একটা ছবিও জোগাড় করে রেখেছেন। যদি একখানা নিজের সঙ্গে ছবি দেওয়া যেত তবে আরো জমত বেশ। ছোট্ট করে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ দিয়ে লেখাটা শুরু করেছেন কিনা। তবে চিন্তা নেই, ছবি না থাক ওটা তিনি লেখা দিয়েই খাপ খাইয়ে দেবেন। দিয়েওছেন,নিজের গরিবির গল্প জুড়ে, ছবি তুলে রাখতে না পারার আফসোসের কথা বলে বেশ একটা মন কেমন করা হু হু ব্যাপার এনেছেন গল্পটায়। হুম, গল্পই তো। কবি অমর গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনোকালেই দেখা হয়নি। নামই শোনেননি সেসময়। শুনবেনই বা কী করে ! সেই কোন ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে থাকতেন। সেখানে শহরের কোন খবরটাই বা পৌঁছাত? কিন্তু তা বলে তো আজকের মাখনবাবু হেরে যেতে পারেন না।এখন তিনি না থাকেন সেই গোবিন্দপুরে আর না আছেন

সেই গোঁয়ার গোবিন্দ। শহরে হাওয়া গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে কিছুটা নাম ন-ডাক হয়েছ। বিশেষ করে সমসাময়িক জলন্ত বিষয় নিয়ে মতামত প্রদানে। বেশ কিছু অনুরাগীও হয়েছে,যারা তার লেখা বেশ পছন্দ করে। আর তাছাড়া তখন না হোক এখন কিন্তু উনি অমরবাবুর বন্ধুবৃত্তেই আছেন। বয়স পঁচাত্তর হলে কি হবে অমরবাবু একদম আধুনিক মানুষ, ঠিক হাওয়া বুঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় হয়ে গেছেন। এমনি এমনি তো আর 'বেস্টসেলার' হননি। আসলে এসব লাইনেও করে কম্মে খেতে গেলে এলেম লাগে। এটা অন্তত মাখনবাবু এদ্দিনে বুঝেছেন। অমরবাবুর সেইসব লেখায় মাখনবাবু নিয়মিত মন্তব্য করেন। কয়েকবার উত্তর পর্যন্ত পেয়েছেন।তাই দেখাসাক্ষাৎ -এর গল্পটা লোকে নেহাৎ ফেলে দিতে পারবে না।

কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। এরকম একটা মাখোমাখো লেখা,যা পড়ে কিনা মাখনবাবুর নিজেরই চোখে জল চলে আসছে,মুখ দিয়ে আহা! অব্দি বেরিয়ে যাচ্ছে,বুকের মধ্যে চিনচিনে ব্যথা টের পাচ্ছেন, সেই লেখাটাই ছাড়ার সুযোগ আর আসছে না। চাতক পাখির মতো এ অপেক্ষা আর সহ্য হচ্ছে না।এ লাইনেও এখন প্রচুর প্রতিযোগিতা। লোকজন সব খবর পাওয়াটুকুর অপেক্ষা, ব্যাস! বন্যার তোড়ের মতন লেখা নামাবে। একটু দেরি করেছ কী ব্যাস,তুমি পিছিয়ে গেলে।এদিকে আবার আগেভাগে চালিয়ে খেললেও বিপদ,ব্যাপক গালি খাবে। দু-একটা ছেলে ছোকরা ধৈর্য ধরতে না পেরে দিয়েছিল পোস্ট করে।উফফ, তারপর যা খাপ বসল, বেচারারা পালাতে পথ পায় না,এখন দু-তিনদিন অন্তত এমুখো হবে বলে মনে হয় না। মাখনবাবু এদের দশা দেখে মনে মনে হাসেন,'হুম,হুম বাওয়া, এতো ছেলেখেলা নয়,এ হলো একদম সেই সার্কাসের খেলার মতন। যতক্ষণ দড়ি দিয়ে এক পা এক পা করে হেঁটে যাবে সব্বাই হাততালি দেবে,একচুল পা এদিক ওদিক হয়েছে কী ব্যাস,পপাত ধরণীতল। এ এক আজব জগৎ।

মাখনবাবুর অবশ্য সুবিধা আছে একটা। তাঁর ভাগ্নে সাংবাদিক, বড়ো হাউসে আছে। সব খবর সবার আগে ওদের কাছে।তাই কিছুটা নিশ্চন্তে আছেন।খবর হলেই ভাগ্নে ঠিক জানিয়ে দেবে।এই যে আগে থেকেই সব গুছিয়ে লিখে রাখলেন এ তো ভাগ্নেরই পরামর্শ। ওদের লাইনেও নাকি বহুযুগ থেকেই এই চলে আসছে।জনপ্রিয় মানুষ, একটু বয়স হয়েছে, তাঁর বিন্দুমাত্র অসুস্থতার খবর পেলেই নাকি এসবের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। শিরোনাম পর্যন্ত তৈরি থাকে।একবার এক বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদের সময় নাকি মৃত্যুর আগেই খবর ছাপতে অবদি চলে গিয়েছিল। একদম শেষ মুহূর্তে তা রদ করা হয়।সে এক কেলেঙ্কারি।

মাখনবাবু একবার পরিচিত কয়েকজনের প্রোফাইলে ঢুঁ মেরে দেখে নিলেন। হুম, আজ অনেকেই রাত পর্যন্ত অনলাইন হয়ে বসে আছে। কখন কী খবর আসে, বলা তো যায় না।এক ব্যাটা পদ্যকার তো একটা পদ্য নামিয়েও দিয়েছে, সেখানে অবশ্য সুস্থতা কামনা করে বলা আছে।এ মাখনবাবু দুদিন আগেই পোস্ট করে দিয়েছেন। শেয়ারও হয়েছে কয়েকটা।

টিভিটা চালালেন। এক ব্যাটা বসে বসে কেন্দ্রের নীতির ভালো মন্দ বোঝাচ্ছে। কবি অমর গোস্বামীর কোনো খবর নেই। এদিক ওদিক দু-চারটে চ্যানেল ঘুরেফিরে দেখলেন। লাভের লাভ কিছু নেই।রাত ভালোই হয়েছে,এরপর জেগে থাকলে আবার গিন্নির মুখঝামটা শুনতে হবে। সে জিনিস ফেবু খাপের চেয়েও ভয়ংকর। তবে শোবার আগে একবার নিজের লেখাটা ঝালিয়ে নিলেন,আর নিতে গিয়েই বুকটা আবার টনটন করে উঠল। এ জিনিস পাতে না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। যাকগে যা হবে কালকেই দেখা যাবে।

ঘুম ভেঙে প্রথমেই ফোনটা খুলে দেখে নেওয়া এখন কীরকম অভ্যাস হয়ে গেছে। আগে এসব ছিল না কিন্তু উপায় কী, সময়ের সঙ্গে চলাই নিয়ম। ফোনে চোখ বোলাতে বোলাতে একজায়গায় এসে থমকে গেলেন। আরে ! এই লোকটা মাঝে মাঝেই ওর লেখায় বেশ ভালো মন্তব্য করত না ? মারা গেছে ! কয়েকটি মন্তব্য পড়ে বুঝলেন রাতে ঘুমের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক।একটু সৌজন্যবোধ দেখানো দরকার। তাতে নিজেরই ইমেজ ভালো হবে। সত্যি জন্ম মৃত্যুর কথা কেই বা বলতে পারে? নিজেই কি ভেবেছিলেন বেঁচে ফিরবেন। তারপর আস্তে আস্তে টাইপ করে কবি অমর গোস্বামী লিখলেন 'রিপ মাখনবাবু। '

এক যে ছিল পাকিস্তান...

সুমিতা মুখোপাধ্যায়

সেই কোন ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছি ভারত-পাকিস্তান কেমন যেন শত্তুর-শত্তুর ব্যাপার স্যাপার। মানুষজন বিলেত যায়, আমেরিকা যায়, অস্ট্রেলিয়া যায় কিন্তু কাউকে বলতে শুনিনি যে পাকিস্তান যাচ্ছি ! ওদিকে দেশটা দেখো একেবারে ঘাড়ের ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে আছে। দু-পা বাড়ালেই পৌঁছে যাওয়া যায়। অথচ কেমন বেয়াড়া রকমের সম্পর্ক দু দেশের ! এটা জেনেই বড়ো হয়েছি যে ও দেশটায় যাওয়া যায় না বা কখনোই যাব না। কিন্তু ঐ যে বলে না, 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে, আইন-কানুন সর্বনেশে' ! ২০০৬-এর মে মাসে সবে জার্মানি থেকে নাটকের দুটো শো করে ফিরেছি। ইউরোপের গন্ধ তখনও গা থেকে মুছে তুলিনি, জিইয়ে রেখেছি, তারই মধ্যে একদিন স্পন্দনের রিহার্সাল রুমে বোমা ফাটল, তৈরি হও আমরা পাকিস্তানের লাহোরে যাব নাটকের শো করতে।

প্রথমটায় তো খুব ঘাবড়ে গেলাম ! বাড়িতে এসে বলতেই সবাই কেমন চুপ ! তারপরে তারা ধরেই নিল এবার শ্রাদ্ধের আয়োজন শুরু করতে হবে ! যাই হোক, ভেতরে ভেতরে আমি কিন্তু প্রবল উত্তেজনা টের পাচ্ছি, ধুক্‌পুক্‌ থেকে ধড়্‌ফড়ানি শুরু হল যখন আরও শুনলাম কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে কলকাতার স্পন্দন মানিকতলা নাট্যগোষ্ঠিকে কালচারাল আম্বাসাডার করে লাহোরে পাঠাতে চায়। তার মানে সরকারি অতিথি হয়ে পাকিস্তান ভ্রমণ।

২০০৬-এর নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের লাহোরে ওয়ার্ল্ড পারফর্মিং আর্টস ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শয়ে শয়ে শিল্পীরা আসবেন সেখানে।

গান, নাচ, থিয়েটার, পুতুল নাচ এই রকম বিভিন্ন ধরণের পারফর্মিং আর্ট সেখানে পরিবেশিত হবে। ঐখানে আমরা যাব নাটক করতে ! ভাবতেই কেমন শিউরে শিউরে উঠছি। বাড়িতে প্রবল আপত্তি। মাঝে মাঝে আমিও যে একটু আধটু ভয় পাচ্ছি না তা নয় ! তবে যেখানে দুই রাষ্ট্রীয় সরকার মিতালী পাতাতে চায় সেখানে বোধহয় অত ভয় পাবার কারণ নেই --- নিজেই নিজেকে নানা ভাবে প্রবোধ দিচ্ছি আর বাড়ির প্রতিকূল স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে যাচ্ছি। তবে এটুকু বুঝতে পারছি ইউরোপের তুলনায় এবার সবাই একটু বেশিই সতর্ক। ভিসা এল, টিকিট কাটা হল... এ সবই গ্রুপ থেকেই করা হল। আমরা শুধু প্রাণপণে রিহার্সাল দিয়ে যাচ্ছি। যথাসময়ে সেই দিনটি এলো, বাড়িতে সবার তেলো হাঁড়ির মতো মুখ। ছেলের রাগী মুখ, মা বিরিয়ানি খেতে যাচ্ছে, মায়ের ছল্‌ছল্‌ চোখ --- যেন শেষ বিদায় জানাচ্ছে।

আমরা গ্রুপের জনা পনেরো সোজা কলকাতা থেকে উড়ে গেলাম দিল্লি, সেখানে কিছুটা সময় কাটানো। নাটকের ডিরেক্টারের সঙ্গে তখনকার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দেখা করে শুভযাত্রার সূচনা করলেন। তারপর বিকেল পাঁচটা নাগাদ পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের প্লেনে করে সোজা লাহোরের পথে।

উঠেই চমেক গেলাম, মেল এয়ারহোস্টেস দেখে ! পাঁচ মাস আগেই এমিরেটস্‌-এ চেপে জার্মানি গেছি। সেই এয়ারহোস্টেসদের দেখে তো আমার বিকল বিবশ তনুমন ! হাঁ করে চেয়েই থেকেছি। কিন্তু এদের বেলায় বাপু অমন আদেখলামি দেখানো ভারি বিপদের ! একে তো দেশটা পাকিস্তান তায় মেল এয়ারহোস্টেস। প্রবল চাপ।

প্রায় পাঁচটা বাজছে, এরই মধ্যে দেখি একটা ফাঁকা জায়গায় মানুষজন নীচে বসে নিষ্ঠাভরে নামাজ পড়ছেন। এও আর এক বিরল অভিজ্ঞতা। ওদিকে অসীম এগিয়ে এসে কী যেন গুঁজে দিয়ে গেল আমার হাতে, এগুলো কি ?

-খেয়ে দেখো, তেঁতুলের টফি।

-ধ্যাৎ, তেঁতুলের আবার টফি হয় নাকি?

সেলোফনে মোড়া টিকটিকি লজেন্সের মতো দুটো ছোটো ছোটো বল। টপাস্‌ করে মুখে দিয়েই তো চোখ গোল গোল! কী দারুণ খেতে। একটু নরম নরম আচার আচার ...। ইতিমধ্যে সুদর্শন এক যুবা হস্টেস বিকেলের স্ন্যাক্স এবং চা নিয়ে হাজির, ভেজপ্যাক। ইন্টারন্যাশানাল ফ্লাইট হলেও এখানে কিন্তু হার্ড ডিঙ্কস অ্যালাউড নয় মোটে। যাক গে যাক, সে নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নেই। জমিয়ে আয়েস করে খাচ্ছি, হঠাৎ বলে কিনা সিটবেল্ট বেঁধে নিন এবার আমরা নামব। মানে ? এই তো সবে দিল্লি থেকে উঠলাম বাপ্‌ ! খাওয়াটাও তো শেষ করতে পারলাম না ! তা যখন সিকিউরিটি চেকিং করছিলে তখনই একটা করে খাবারের ট্রে হাতে ধরিয়ে দিলেই পারতে, তখন থেকেই শুরু করে দিতাম ! আর কী, ঐ আধখাওয়া ট্রে ফেরত দিয়ে শক্ত করে বেঁধেছেদে বসলাম। শুনলাম, দিল্লি থেকে মোটে পঞ্চাশ মিনিট লাগে। আসলে লাহোর তো আমাদের পাঞ্জাবেরই একটা দিক এবং পাঞ্জাবি কালচারে অভ্যস্ত। পরে আমি দেখেছি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি। এয়ারপোর্টে নেমেই দেখি থিক্‌থিক্‌ করছে বন্দুকধারী দাড়িওয়ালা মিলিটারি কমান্ডো।

ও বাবা, আমি এই প্রথম দাড়িওয়ালা মিলিটারি দেখলাম ! সবই কেমন অবাক করে দেওয়া কারসাজি যেন। সব ফর্মালিটিজ সমাধা করে বেরিয়ে এসে দেখি মিনিবাসের মতো সাদা একটা বাস আঙ্কা মাদের জন্য দাঁড়িয়ে। ও ভালো কথা, ভেবেছিলাম ছবি তুলব, কিন্তু সেটি হবার নয়, এয়ারপোর্ট অঞ্চলে ছবি তোলা অমার্জনীয় অপরাধ। সুতরাং ক্যামেরা ব্যাগেই তুলে রাখো বাবা। রওনা তো হলাম কিন্তু কিছুদূর গিয়েই মারাত্মক যানজটে গাড়ি আটকে রইল। রাস্তা দিয়ে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ যাচ্ছেন। কী-ই বিড়ম্বনা বাপু ! অথচ ব্যাগে আমাদের তারই আমন্ত্রণপত্র। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। প্রচন্ড ক্লান্ত শরীর মন দুই-ই। বেশ অনেক রাতেই পৌঁছলাম এক পেল্লাই বাড়িতে। এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা। ত্রুটিহীন আপ্যায়ন। তদারকিতে রয়েছে এখানকার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেপুলেরা। ফুলের মতো ফুট্‌ফুটে দেখতে, যেমন গায়ের রঙ তেমনি মুখখানি ! দোতলার একটা ঘর বরাদ্দ হল আমার আর সুস্মিতার জন্য। সাজানো গোছানো সুন্দর একটা ঘর। বেশ অনেক রাতেই খাবার এল, রুমালি রুটি, চিকেন আর মাটন বিরিয়ানি। না, রাতে বিরিয়ানি খাবার সাহস পেলাম না। রুটি চিকেনই ঠিক আছে। তবে ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে যা সুঘ্রাণ ইনহেল করেছি তাতে অর্ধভোজনং কেন ফুলবেলি 'ভোজনং' হয়ে গেছে। ঐ গন্ধ কিন্তু আমি কলকাতার কোন বিরিয়ানি থেকে পাইনি, কখনো না, কোনদিন না। খেয়েদেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে আর কিছু মনে নেই, একেবারে ঘুমের দেশে।

পরেরদিন ঘুম থেকে উঠেই নতুন দেশ, নতুন মানুষ নতুন অভিজ্ঞতা। জায়গাটা লাহোর, পাকিস্তান। যেতে হবে আল-হামারা কালচারাল কমপ্লেক্সের লাহোর ব্ল্যাকবক্স অডিটোরিয়ামে। কলকল করতে করতে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে আমাদের নিতে এল। না, এখনো পর্যন্ত কাউকে হিজাব পরতে দেখিনি। মেয়েরা দিব্যি নীলরঙা জিনস্‌ আর টী-শার্টে ফুরফুরে পেজ্জাপতি। মাথা মুখ ঢাকার কোন আল্কা তাগিদ তো তেমন দেখলাম না। বেশ তো দেখছি বাবা ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারই মধ্যে দু-একটা মেয়ে আমার হাতের সোনা বাঁধানো নোয়া আর কোলাপুরি চটি দেখে একেবারে মুগ্ধ ! পারলে তক্ষুনি খুলেই নেয়।

-এটা কী পরেছ গা ?

-এটাকে বলে নোয়া।

-গোল্ড?

-হ্যাঁ।

-আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আমি তোমাকে যদি দাম দিয়ে দিই তুমি আমাকে দেবে ? তুমি গিয়ে আর একটা করিয়ে নিও।

-না রে বাবা, এটা দেওয়া যাবে না।

-প্লিজ, সো কিউট ব্যাঙ্গেল!

-ওরে বাপু এটা ব্যাঙ্গেল নয়। বাঙালি মেয়েরা বিয়ে হলে পরে। এটা দেখে বোঝা যায় যে বিবাহিত।

-আচ্ছা! কই আমরা তো তেমন কিছু পরি না !

এই সেরেছে, তা আমি কেমন করে বলব, কেন পরো না। কী উত্তর যে দিই। ততক্ষণে আমার নোয়া ওর হাতে, দেখতে নিয়েছে। প্রস্তাব শুনেই তো আমার পিলে চমকে গেছে । দাও,দাও ক'রে প্রায় ছোঁ-মেরে নোয়াটা ছিনিয়েই নিলাম। মুশকিল বাধল রাতে, শো-এর সময়। এই নোয়া খুলে স্টেজে উঠব, কার কাছে রেখে যাব ? এতো পছন্দ, যদি হাতে গলিয়ে নিয়ে আর দিতে না চায় ! ওদিকে এটা হাতছাড়া হ'লে সমাজ-সংসার বলবে, নারী জনম অসার্থক, শো শুরু হবার আগে কী ক্রাইসিস্ ভাবুন আমার ! অস্তিত্বে সংকট একেবারে।

শেষ পর্যন্ত সেফটিপিন দিয়ে জামার হাতার সঙ্গে ভেতর দিকে আটকে স্টেজে উঠলাম। আসার দিন আমার ঠিকানা ফোন নং নিয়ে ওদের ঠিকানা আর ফোন নং দিয়ে বলেছিল গোটা তিনেক নোয়া বাঁধানো আর কয়েক পিস কোলাপুরি চটি আমি যেন কিনে পাঠিয়ে দিই। ওরা টাকা পাঠিয়ে দেবে। তিন-তিনটে সোনার নোয়া পাঠাবো ! এ কেমন বায়না বাছা ! অবশ্যই পাঠাতে পারিনি।

তবে লাহোরের ছেলেমেয়েদের আলো করা রূপ দেখে দেখে মুগ্ধ হয়েছি বটে। ঈশ্বর যেন তাঁর সবটুকু মনোযোগ দিয়ে ওদের গড়েছেন।

ঘন চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, পাতলা ঠোঁট, ঈষৎ মোটা জোড়া ভ্রু, আপেলের মতো গোলাপি রঙা গাল সব মিলিয়ে অসামান্য রূপচ্ছটা। ছেলেরাও ততোধিক সুন্দর। সে সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা হয় না , শুধু মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয় ! ছেলেরা আধুনিক পোশাক পরলেও আফগান পাঠান স্যুটেই অভ্যস্ত। বোরখা কিন্তু সচরাচর চোখে পড়ল না।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামে, দর্শক সমাগম শুরু হয়ে গেছে। অতিথিদের দেখে আমার আর সুস্মিতার তো ভিরমি খাওয়ার জোগাড় ! চাঁদের হাট !... গাড়ি থেকে নামছে যেন মনে হল এক কণা চাঁদা কা টুক্রা। অধিকাংশেরই পরণে সিফনের ওপর ভারি জারদৌসি কাজ করা শাড়ি। এই প্রথম আমি জারদৌসি দেখলাম ! কী অপূর্ব জরি আর ছোটো ছোটো পুঁতি দিয়ে নিখুঁত কাজ করা। তবে বেশ ভারি এবং খুবই এক্সপেনসিভ। ঝুঁকি নিয়েছিলাম কেনবার, ছ্যাঁকা খেয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছি। মনে মনে ঠিক করা আছে, সুযোগ পেলে জারদৌসি কিনতেই লাহোর যাব !

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলেই গেছি, অর্গানাইজারদের ও তত্ত্বাবধায়কদের আন্তরিক ব্যবহারে আমরা এতটাই মুগ্ধ, পাকিস্তান বলে ভয় পাবার যে কথাটা ছিল সেটা বেমালুম ভুলেই গেলাম। কী কাণ্ড বুঝে দেখুন ! আমাদের শো শেষ, এবার দেখার পালা। আমি গিয়ে বসলাম পুতুল নাচ দেখতে। ওদিকে আবার খাবারের ডাক পড়েছে। একখানা বিরাট তাঁবু, দিব্যি রং-বেরং-এর। বাফেট। হাঁড়িতে হাঁড়িতে বিরিয়ানি, চিকেন, মাটন, গোস্ত। রাজমা, আলু ফুলকপির ডালনা, ডাল মাখানি, বিভিন্ন ধরনের কাবাব, ফ্রুট সালাড... দিনেরাতে এলাহি ব্যাপার স্যাপার। কিন্তু আমি এক চামচ বিরিয়ানিও মুখে তুলতে পারলাম না, বাড়িতে রেখে যাওয়া আমার বিরিয়ানি বিলাসী ছেলেটার মুখটাই বার বার আমাকে সে স্বাদ থেকে বঞ্চিত করে রাখল। আসার সময় বলেছিল, তুমি তো গিয়ে খুব বিরিয়ানি খাবে। ছোটো তো, তাই মা-কে সবটুকু বুঝে উঠতে শেখেনি ! তবে একদিন ফ্রুটস বিরিয়ানি খেলাম। আঙুর, বেদানা, সবুজ আপেল, কাজু, কিশমিশ, আখরোট এই সবকিছু দিয়েখএক স্বর্গীয় আস্বাদন। একটু মিষ্টি মিষ্টি।

এরই মধ্যে আমি আর বাপি দুজনে একদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম লাহোর দেখতে। বাপি আর আমার দিদি-ভাইয়ের সম্পর্ক। একই গ্রুপের সহ-নাট্যকর্মী। ঝাঁ চকচকে লাহোর শহর ছেড়ে একটু এদিক ওদিক... বাপ রে ! বাস তো চোখে দেখা যায় না ! শুধু ঝুলন্ত মানুষ। বাসের গায়ে মাথায় পেছনে কেমন স্পাইডারম্যানের মতো মানুষ সেঁটে সেঁটে রয়েছে ...

'ওরা ঝুলছে কেন গা ? যদি পড়ে যায় !' মনে আছে গানটা ? আরে হংসরাজ, হংসরাজ ! রিক্সোয় উঠব, দেখি ছোট্ট সিঁড়ি এগিয়ে দিল। হ্যাঁ, ঠিকই, সিঁড়ি বেয়ে রিক্সোয় চড়লাম। কী উঁচু রে বাবা ! রাস্তায় থিকথিক করছে লোক। অপরিচ্ছন্ন, আনঅর্গানাইজড। ট্রাফিকের বালাই নেই।যাব, আনারকলি বাজার। শুনেছি বিরাট মার্কেট, মানে বাজার ! একটু আধটু তো কিনেকেটে নিয়ে যেতে হবে। যতই ভেতরে ঢুকছি ততই অস্বস্তিকর অপরিষ্কার প্রকট হচ্ছে। বেশ নোংরা লাগছে। মানুষজনের চেহারাও বদলাচ্ছে। তবুও বোরখা কিন্তু তেমন চোখে

পড়ছে না। সালোয়ার কামিজ আর মাথা ঢাকা ওড়না, একদমই পাঞ্জাবি মহিলাদের বেশভূষা। বাজার শুরু হল। সরু চলার পথ, নোংরা জমা জল, তবু তারই মধ্যে দুদিকে অনিক্স পাথরের চোখ ধাঁধাঁনো বিরাট বিরাট দোকান। কী-ই নেই সে দোকানে! পাথরের ডাইনিং টেবিল চেয়ার থেকে খাট, সেন্টার টেবিল, অজস্র ঘর সাজানোর শো-পিস, দাবার বোর্ডখ হাল্লে পড়েছি ! ভুলে গেছি এগুলো পাথরের। নিতে হবে, মা, কাকিমা,পিসিমা,খুড়িমা,মাসিমা খবিরাট লিস্টি। এখানেই হল আমার সেই বিরল অভিজ্ঞতা

-কাঁহাসে?

-ইন্ডিয়া সে।

-ইন্ডিয়া সে তো হ্যায়, লেকিন কাঁহা?

-কলকত্তা !

-দাদা কা কলকত্তা, আই মীন সৌরভ গাঙ্গুলি কা কলকাত্তা ?

-জী হাঁ।

- আরে জনাব, ইয়ে আপকো পহেলি-ই বোলনা চাহিয়ে থা।

বা রে, ইন্ডিয়া থেকে এসেছি শুনলে সব দোকানেই স্পেশাল খাতির যত্ন জুটছে দেখছি। গল্প করছে, ঠান্ডা খাওয়াচ্ছে, জিজ্ঞেস করছে, ইন্ডিয়ার লোকজন পাকিস্তানের মানুষকে কী চোখে দেখে ? শত্রু মনে করে কি ? ওদের মতে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের এই যে টেনশনটা সেটা দু-দেশের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থে জিইয়ে রাখে। সাধারণ মানুষ কিন্তু এমনটা চায় না। এই মনোভাবটা ওরা খুব অকপটেই ব্যক্ত করল আমাদের কাছে।

দূর! আমি আবার অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম। হ্যাঁ, সৌরভ গাঙ্গুলির দেখলাম দারুণ জনপ্রিয়তা। দাদার নামে এরা চার ঢোক জল বেশি খায়। ঘুরে ঘুরে কিনলাম বটে, প্রাণভরে। সবচেয়ে খুশি হয়েছি আতর কিনে। গন্ধে কেমন বুঁদ হয়ে যেতে হয়। দেখলাম, দিদির সঙ্গে ঘুরতে বাপীর কোনো বিরক্তি নেই। বরং পছন্দ করতে বেশ সাহায্যই করছে। বাপীকে দেখলে খুব ক্যাজুয়াল মনে হলেও গণশক্তির এই একনিষ্ঠ কর্মীটি কিন্তু আদতে তেমন নয় ! ও দেখেছে দিদি সব রকম সুখাদ্য থেকেই নিজেকে দূরে রেখে কেবল ভাত,রাজমা,আলু ফুলকপি আর রুটিতেই আটকে আছে। তাই নিয়ে গেল আমাকে লাহোরের সেই বিখ্যাত কাবাব স্ট্রিটে। ঢুকলাম এক দোকানে।

কিন্তু আমি যাই বঙ্গে তো আমার কপাল যায় সঙ্গে, দোকান খোলা থাকলেও অর্ডার নেওয়া নাকি বন্ধ। সুতরাং এ যাত্রায় কাবাব খাওয়া আর হল না। ওখান থেকে গেলাম মিউজিয়াম দেখতে। আশ্চর্য গোটাটা জুড়ে শুধু হিন্দু দেবদেবীদের পাথর আর ধাতুর মূর্তি। কে নেই সেখানে

? বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, দুর্গা, সরস্বতী, গৌতম বুদ্ধখএমন কী, আমি তো উপহার দেবার জন্য গুচ্ছের সেই ছোটো ছোটো মূর্তিও কিনলাম। এখানেই আমি প্রথম দেখলাম অসুস্থ কঙ্কালসার গৌতম বুদ্ধের গাছতলায় শায়িত সেই মূর্তি। ভারতের পতাকার অশোকচক্রটিও রাখা আছে ওখানে। যদিও সবই রেপ্লিকা।

একদিন সবাই মিলে বেরোলাম আশপাশের কিছু কিছু জায়গা দেখ তে। বেশ কিছু মসজিদ দেখলাম। কী অসাধারণ যে তার স্থাপত্য, কী অনবদ্য মীনাকারির কাজ। মুগ্ধ হয়ে দেখতে গিয়েই দৃষ্টি আহত হল, অত্যাধুনিক মেশিনগান হাতে অতন্দ্র প্রহরীরা মসজিদের বিভিন্ন কোনায় কোনায় ছড়িয়ে। খুব বেশি এদিক ওদিক যাওয়ায় দলের একটা নিষেধাজ্ঞা ছিল। তাই কাছেপিঠেই ঘুরে বেরিয়েছি। নাটক দেখে গভীর রাতের অন্ধকারে আমি আর সুস্মিতা বাড়ি ফিরেছি। ভয় করেনি বা অবাঞ্ছিত কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি কখনই। তবে রাস্তায় রাস্তায় টহলদারি মিলিটারি চোখে পড়েছে। প্রপার লাহোর শহরটা একেবারে ঝাঁ চক্‌চকে। বিশাল বিশাল শপিং মল, ঝক্‌ঝকে রাস্তা, বিদেশি গাড়ির ছুটোছুটিখ এগুলো বেশ চেনা লাগলেও একটু ইন্টিরিয়ারে গেলে জায়গাটার প্রকৃত ঘ্রাণটা পাওয়া যায়। এরই মধ্যে আমাদের ডিরেক্টর সাহেব একটু চাইছিলেন সবাইকে নিয়ে মহেঞ্জদড়ো দেখতে যাবেন। কিন্তু সে গুড়ে বালি ! আমাদের ভিসা শুধুমাত্র লাহোরের জন্য। তাই আমরা লাহোরের বাইরে আর কোথাও যেতে পারব না। যদিও কর্মকর্তারা আশ্বাস দিয়েছিলেন রাতে গাড়ি করে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন, কিন্তু ভরসা পেলাম না। সবাই সরকারি চাকরি করি তো ! অনুযোগ পাকিস্তানের মানুষেরও, ওরাও যখন ভারতে আসেন তখন শুধু যে জায়গায় যাবেন কেবল তারই ভিসা দেওয়া হয়, অন্য কোথাও যাবার অনুমতি মেলে না। অথচ সিনজেন ভিসা নিয়ে আমরা ইউরোপের কতো জায়গায় তো ঘুরে এলাম! দেখো দিকি এই দুটো দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক কী বেজায় আড়ষ্ট !

আবার একদম অন্য অভিজ্ঞতা হল মেলার মাঠে। ইয়া গোঁফদাড়িওয়ালা এক বয়স্ক পুলিশ, ফেরার রাস্তাটা জিজ্ঞেস করতেই বললেন,
(কথপোকথন হিন্দিতেই হয়েছিল)

-কোথা থেকে এসেছেন?

-ইন্ডিয়া।

-দিল্লি?

-না, কলকাতা।

-দিল্লি হয়েই তো আসতে হল !

-হ্যাঁ, তা তো হলই।

-আমার দাদী আর আম্মির দেশখ

মনে হল কেমন এক বিষাদ জড়িয়ে আছে ওঁর কথায়। কিছু বলতে চায় কী আমায় ?

-ওনারা খ

-নেই। বোন, ভারত থেকে আমি আব্বার সঙ্গে যখন পাকিস্তান চলে আসি তখন আমি এত্তো ছোটো যে আমার কিছু মনে নেই, লেকিন মনে আছে আমার আম্মি আর দাদী পাঞ্জাবে রয়ে গেল। মনে আছে আমার আম্মির কান্না, আর কোনোদিন দেখা হয়নি। দুজনেই মারা গেছে। খবর পেয়েছি, দেখতে যেতে পারিনি। তাই ওদেশ থেকে কেউ এলেই আঙ্গু মার মনে হয় ঐ মানুষটা আমার আম্মির দেশের মাটি ছুঁয়ে এসেছেখখ

-কেন যেতে পারেননি?

-ভিসা মিলবে না। দেশ ভাগ হয়ে গেল না! সাথে সাথে ফেমলি ভী ভাগ হয়ে গেল যে ...

দাঁড়িয়ে আছি ঝক্‌ঝকে নিয়ন আলোর নীচে, স্পষ্ট দেখছি অভিজ্ঞ দুটো চোখের ঝাপ্সা দৃষ্টিখ স্মৃতির আতুঁড়ঘরে কী যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে ! আমার ভেতরেও তখন উথাল-পাতাল কালবোশেখিখপালিয়ে এলাম, এই ঝেঁপে বৃষ্টি নামল ব'লে।

দেখতে দেখতে দিনগুলো কেমন চলে গেল। ও হ্যাঁ, একটা কাজ আমি করেছি এই ক'দিনে, আয়নায় নিজের মুখ দেখিনি। লজ্জায়। সারাদিন এত সুন্দর দেখতাম যে নিজেকে আয়নায় দেখার আর ইচ্ছেটুকুও করেনি। হাঁ করে শুধু ওদের রূপসুধা পান করেছি। ফিরে গিয়ে তো আবার নিজের শ্রীমুখই দর্শন করতে হবে। এই ক'দিন চক্ষুরত্ন সার্থক করি। পনেরোই নভেম্বর, ফিরে এলাম দিল্লি, উঠলাম বঙ্গভবন। নেমেই বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিলাম পরাণটা নিয়ে বহালতবিয়তেই ফিরেছি। বাবাকে ফোনেই নির্দেশ দিলাম ফিরে গিয়েই তোমার হাতের পোস্ত আর কাতলা মাছের ঝাল খাব ! সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। সন্ধ্যেটা ছোটোমামা আর মাইমার সঙ্গে দিব্যি কাটল দিল্লিতে। পরের দিনই কলকাতার বাড়িতে ফিরলাম পাকিস্তান ভ্রমণের একঝুলি বিরল অভিজ্ঞতা নিয়ে। সন্ধ্যেবেলায় সবাই গোল করে ব'সে আর আমি গল্প বলছি, এক যে ছিল পাকিস্তান।

মণিমহেশের পথেপথে

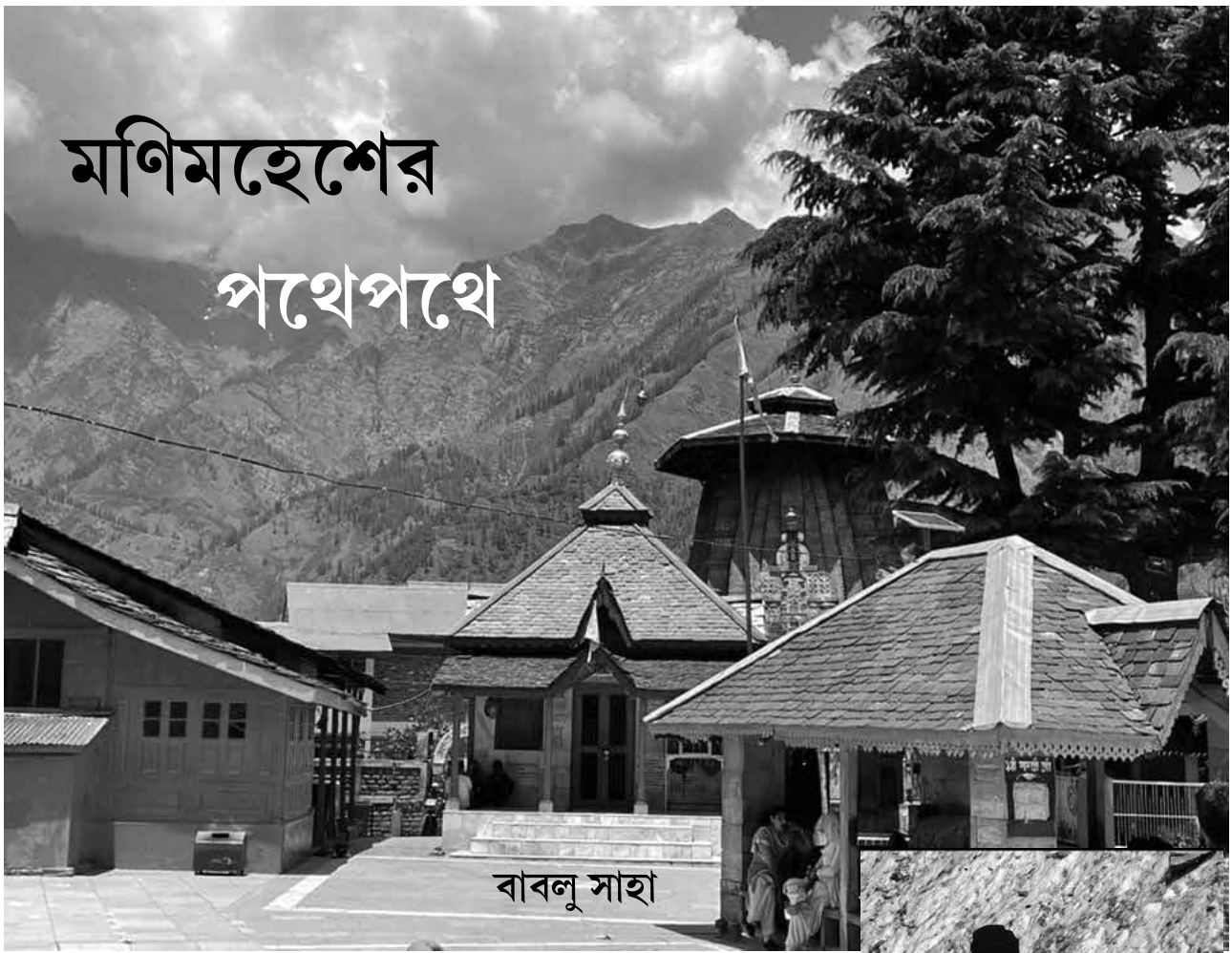

বাবলু সাহা

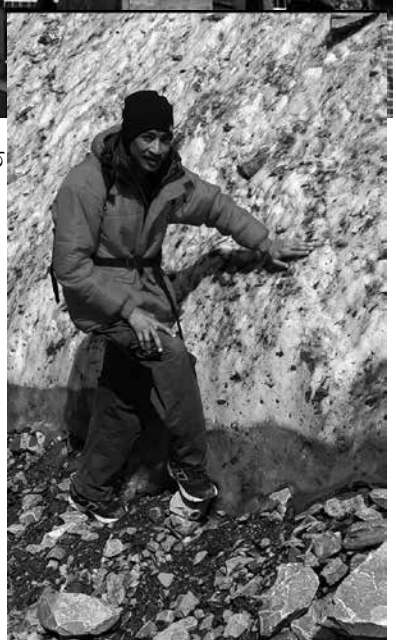

আজ যে ভ্রমণের কাহিনি আমি লিখতে বসেছি, সেটা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। লেখার শুরুতেই সংক্ষেপে সেটি বলে নিই। আমার সঙ্গে নির্মাল্যদার আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ফেসবুকের মাধ্যমে। তার আগে দুজনের কেউই কাউকে চিনতাম না। তো যাই হোক, ব্যক্তিগতভাবে দুজনের মিল ছিল, দুজনেই একা থাকি এবং ঘুরতে ভালোবাসি। বেশ কিছুদিন মেলামেশার পর হঠাৎ করে একদিন সেই দাদা প্রস্তাব দিলেন যে, হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায় একটি ট্রেক এবং তারপর বেশ কিছুদিন সেখানে থেকে, বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ, যার শুরুটা হবে পাঞ্জাবের পাঠানকোট হয়ে হিমাচলের ডালহৌসি শৈলশহর দিয়ে। হাওড়া থেকে ট্রেনে যাতায়াত নিয়ে মোট ২৩ দিনের সফর। অর্থাৎ সেই বছরের বিশ্বকর্মা পুজোর আগে গিয়ে, দুর্গাপুজো ওখানে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরব একেবারে বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যায়।

সেইমতো আগাম রিজার্ভেশন টিকিট কাটা হল যাওয়ার হিমগিরি এক্সপ্রেসে এবং ফেরার টিকিট জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে।

আগেই বলে রাখি, যেহেতু এটি ধারাবাহিক লেখা নয়, সেহেতু এখানে আমি মণিমহেশ ট্রেক বা

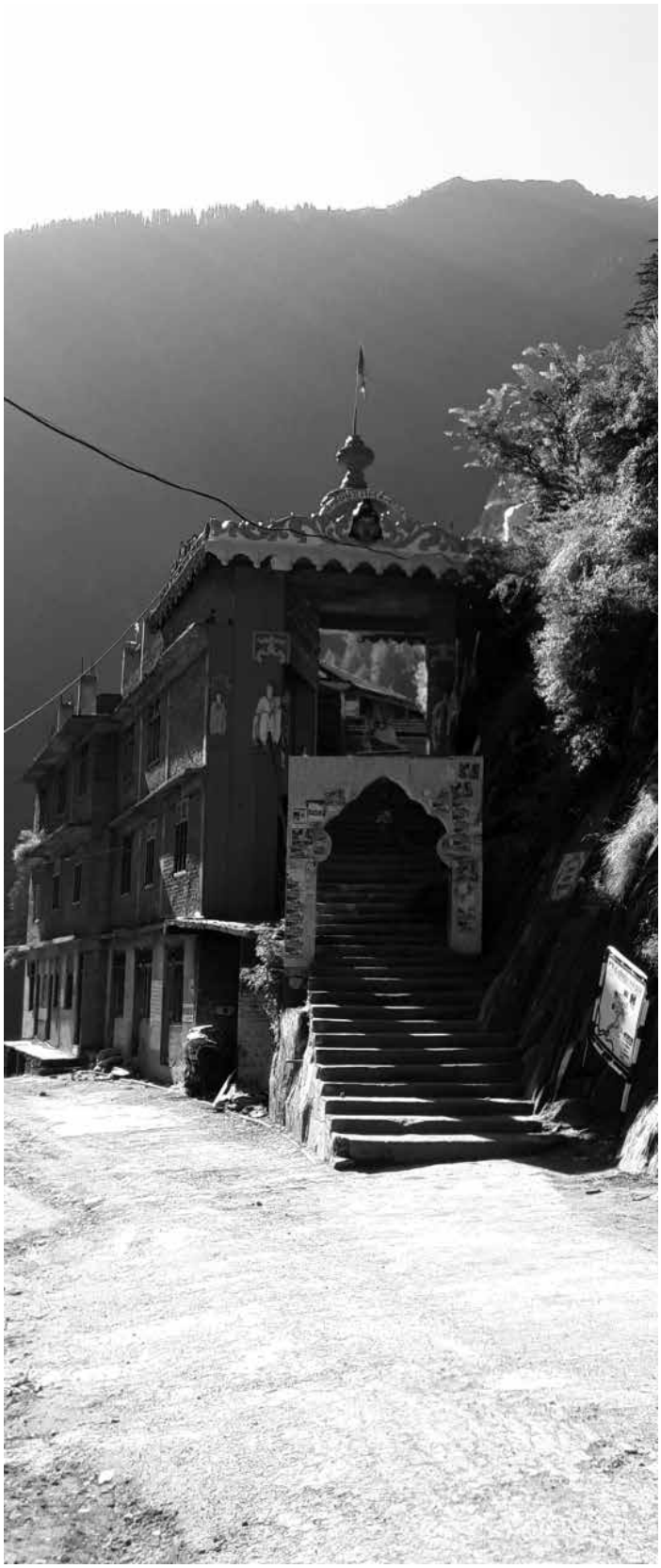

ট্রেকরুটের যাতায়াতের বর্ণনা তুলে ধরব পাঠকের সামনে। তার আগে সংক্ষেপে যাওয়ার বর্ণনা একটু দিয়ে রাখি। সময়টা ছিল ২০১৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার। রাত ১১,৫৫ মিঃ এ হিমগিরি এক্সপ্রেস ছাড়বে। সেকারণে আমি এবং সেই দাদা নিজ বাসভবন থেকে রুকস্যাক, ক্যারিম্যাট্রেস, স্লিপিং ব্যাগ সহ এই লম্বা সফরের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ গুছিয়ে তৈরি হয়ে আলাদাভাবে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হলাম। যথাসময়ে ট্রেনে উঠে সব গুছিয়ে বাসার পর ট্রেন আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। ট্রেনে দু রাত কাটিয়ে তৃতীয়দিন সকালে আমরা বিশাল লটবহর নিয়ে নামলাম পাঠানকোট স্টেশনে।

ব্রেকফাস্ট ট্রেনে বসেই হয়ে গিয়েছিল। ফলে নেমেই আমি দাদার হেফাজতে সব রেখে দৌড় দিলাম অটোর সন্ধানে। অটোয় উঠে বাসস্ট্যান্ডে নেমে আমরা ডালহৌসির বাস ধরলাম। ডালহৌসিতে আমাদের কলকাতা থেকেই যে হোটেল বুক করা ছিল, সেটি হচ্ছে নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত সেখানকার একমাত্র হেরিটেজ হোটেল, যে হোটেলের একটি ঘরে একদা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এসে উঠেছিলেন। নাম ' হোটেল মেহের '। এই হোটেলের পাঞ্জাবি মালিক ভাইয়েরা আজও নেতাজির রাত কাটানোর সেই ঘর পরিষ্কার আর যত্ন করে অবিকল একই রকমভাবে সংরক্ষিত করে রেখে দিয়েছেন। বিরাট অংশ জুড়ে পুরাতন সব ঘর ঘন সবুজ গাছপালা দিয়ে ঘেরা। সেখানে দু - তিন রাত কাটিয়ে আমরা বাসে চেপে রওনা দিলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য খাজিয়ারের উদ্দেশ্যে। সেখানেও দুদিন থেকে আমরা চলে এলাম আর এক বড় শহর চাম্বায়। এখানে দু দিন থাকার পর আমরা এবার রওনা দিলাম চাম্বা জেলার আরেকটি শহর ভারমৌর-এর উদ্দেশ্যে। চাম্বা শহর থেকে বেশ খানিকটা লম্বা পথ এই ভারমৌর। বাস যখন গন্তব্যে পৌঁছল, তখন বিকেল প্রায় ৪টে বাজে ঘড়িতে। বাস থেকে লটবহর সব এক এক করে নামিয়ে রাস্তার একধারে দাদাকে রেখে আমি গেলাম হোটেলের সন্ধানে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, ঠিক তার উপরের দিকেই একটি সাধারণ মাপের চা এবং খাবারের হোটেল দেখা যাচ্ছিলো। বেশ খিদে পেয়েছিল। সোজা উপরে উঠে সেই দোকানে গিয়ে দোকান মালিকের কাছে একপ্লেট রাজমার তরকারি নিয়ে খাওয়া হলে, ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কোথায় মোটামুটি মাঝারি মানের পকেটসাধ্য থাকার ঘর পাওয়া যাবে। শুনে উনি বললেন যে, তার দোকান ঘেঁষে আরেকটু উপরেই উনি একেবারে নতুন সদ্য নির্মীত দুটি থাকবার ঘর করেছেন। পছন্দ হলে আমরা সেটায় থাকতে পারি সাধ্যের খরচের মধ্যে।

সাথে সাথেই আমি রাজি হয়ে গেলে, উনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে

ঘরের উদ্দেশ্যে চললেন।

খেয়াল করলাম, আমরা যে গাছপালার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সেসবই লাল টুকটুকে ফলন্ত আপেল ভর্তি গাছ। মাটিতে পড়ে অনেক আপেল গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাই দেখে আমি কুড়োতে যেতেই মালিক আমার হাত টেনে ধরে বললেন, মাটি থেকে কুড়িয়ে খাওয়ার কোনো দরকার নেই, যখন খুশি যেন গাছ থেকেই সরাসরি পেড়ে খাই। আরেকটু উপরে উঠেই চোখে পড়ল সদ্যনির্মিত রং করা পাশাপাশি দুটি ঘর। সামনের দিকে বড় বড় গোলাপ গাছ এবং চারপাশের পুরো এলাকাটি ফলন্ত আপেল গাছের বাগান বা ক্ষেত ঘেরা। তারই একটিতে আমাদের আগামী কয়েকদিনের ডেরা।

হোটেল মালিক আমাদের ঘর দেখিয়ে চাবি দিয়ে নীচে চলে গেলেন। আমরা দুজন নতুন ঘরে ঢুকে আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে ফ্রেশ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম, তখন পড়ন্ত বিকেল।

ঘর থেকে বেরিয়েই আমি সামনের একটা লম্বা আপেল গাছে তরতরিয়ে উঠেই মনের সুখে আপেল পাড়তে লেগে গেলাম। গাছ থেকে যখন নেমে এলাম, আমার গুঁজে নেওয়া শার্টের ভিতরে বোঝাই আপেল। সেগুলি ঘরে রেখে চাবি দিয়ে নীচে নেমে হোটেলে রাতের খবর অর্ডার দিয়ে রাস্তা ধরে সোজা চললাম ভারমৌরের বিখ্যাত পৌরাণিক ইতিহাস সমৃদ্ধ চৌরাসি মন্দির চত্বরের দিকে। এটি একটি মন্দির কমপ্লেক্স যা ৮৪টি মন্দির সমন্বয়ে গঠিত।

তার আগে ভারমৌরের এই ৮৪ মন্দিরের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে একটু বলে নিই। প্রায় ১৪০০ বছর আগে ৭ম শতাব্দীতে এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। যেখানে মন্দিরের গ্যালাক্সির বেশিরভাগই ৮৪টি শিবলিঙ্গের আকারে বিদ্যমান। এই ৮৪মন্দির ভারমৌরের তৎকালীন রাজা সহিল বর্মণ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, ৮৪জন যোগীদের সম্মানে , যাঁরা কুরুক্ষেত্র থেকে এসেছিলেন এবং মণিমহেশ যাওয়ার পথে যেখানে বসে ধ্যান করেছিলেন।

আমরা দুজন কিছুটা রাস্তা পাড় হয়ে মন্দির চত্বরের মূল গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

অনেকটা এলাকা জুড়ে লাল পাথরে বাঁধানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই মন্দির চত্বর। সামনে এবং বামদিকে ঘন সবুজ হিমালয়, প্রতিটি মন্দির সুবিন্যস্ত এবং পুরাতন শৈলীতে নির্মিত। মন্দির গাত্রের সূদ নিখুঁত কারুকার্য চেয়ে দেখবার মতো। পুরো চত্বরে নির্দিষ্ট সময়ে

পূজা - আরতি হলেও, কোনো রকম পান্ডা বা পুরোহিতের অত্যাচার বা দৌরাত্ম্য নেই। শান্ত নিস্তব্ধ সব।

চোখে পড়ল চত্বরের ঠিক মাঝখানের বেশ খানিকটা এলাকাজুড়ে সুবিশাল উচ্চতার গাছের সারি, একইসাথে এমনভাবে উঠে দাঁড়িয়ে আছে, যাদের মূল গোড়ার থেকে আলাদা করা খুবই মুশকিল। পরে এই গাছগুলি সম্বন্ধে তথ্যসূত্র ঘেঁটে যা জেনেছি, তা বেশ চমকপ্রদ। এই বৃক্ষ Deodar (বাংলায় দেবদারু নয়) Ceder xíîy Indian Cedar নামেও পরিচত।

এটি হিমালয়ে উৎপন্ন গাছ। আফগানিস্তান, নেপাল এবং ভারতের জম্মু - কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, সিকিম এবং হিমাচল প্রদেশে দেখতে পাওয়া যায়। এর বিশেষত্ব হচ্ছে, এই গাছগুলির উচ্চতা ৪০-৫০ মিটার লম্বা (১৩১-১৩৬ ফিট) এবং চওড়ায় (trunk diameter) ৩ মিটার / ১০ফিট। এদের আয়ু স্বাভাবিকভাবে ১০০ বছর। কিছু গাছ আবার ১০০০ বছরের পুরাতন হয়ে থাকে। এই গাছের কাঠ খুবই নমনীয় এবং খুব সহজে পচে বা ক্ষয় হয়ে যায়না। এর কাঠের গা থেকে সুন্দর সৌরভ বেরোয়। এবং এর কাঠ ফার্নিচার, construction এবং কাঠখোদাই এর কাজে লাগে। এবং, হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে এই গাছ নিয়ে ধর্মীয় রীতি প্রচলিত আছে। বিশেষ করে প্রাচীন বৌদ্ধ মনেস্ট্রি ও হিন্দু মন্দিরের গায়ে এই গাছ লাগানো হয়ে থাকে। তবে, এখানকার গাছগুলিকে ভালোভাবে সামনে থেকে দেখার পর আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছিলাম। কারণ, প্রায় প্রতিটি গাছের গায়ে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে অপূর্ব সব ভাস্কর্যের সৃষ্টি হয়েছে বহুবছর ধরে।

কোনোটির গায়ে একজন মা যেন স্নেহভরে তার ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন, কোনোটিতে গাছের গায়ে অবিকল একটি পূর্ণাঙ্গ গাছের আদল, কোনোটিতে আবার কেশর শোভিত সিংহের মুখ। এরপর সন্ধ্যা নামলে আমরা আমাদের ঘরে ফিরে এলাম। রাতেই ফোনে যোগাযোগ করলাম আমাদের আগে থেকেই ঠিক করে রাখা নির্দিষ্ট গাইডের সঙ্গে। সে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে আরও একদিন পরে , মণিমহেশ যাত্রার উদ্দেশ্যে।

আর সেদিন রাতেই আমাদের জন্য প্রবল দুঃসংবাদ। সন্ধ্যা থেকেই নির্মাল্যদার ডান পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল, সেটাই রাতে ভয়ানকভাবে বেড়ে উঠল। কোনোরকমে সে রাতটা কাটিয়ে সকালেই গেলাম স্থানীয় হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগের তখনকার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের কাছে। উনি সব দেখেশুনে যা বললেন, সেটি আমাদের ভীষণই চিন্তায় ফেলে দিল। দাদার পায়ের পাতার হাড় নাকি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে, সেইমুহূর্তে ব্যথা কমানোর কড়া ইনজেকশন আর ট্যাবলেট দেওয়া ছাড়া আর কিছু আপাতত করার নেই।

যাই হোক, প্রয়োজনীয় ওষুধ ইনজেকশন নেওয়ার পর নির্মাল্যদার পায়ের যন্ত্রণা সাময়িকভাবে কিছুটা কমলো। এরপর উনি সিদ্ধান্ত নিলেন, হাডসার থেকে ধানচো অবধি গিয়ে অস্থায়ী ধাবায় বিশ্রাম

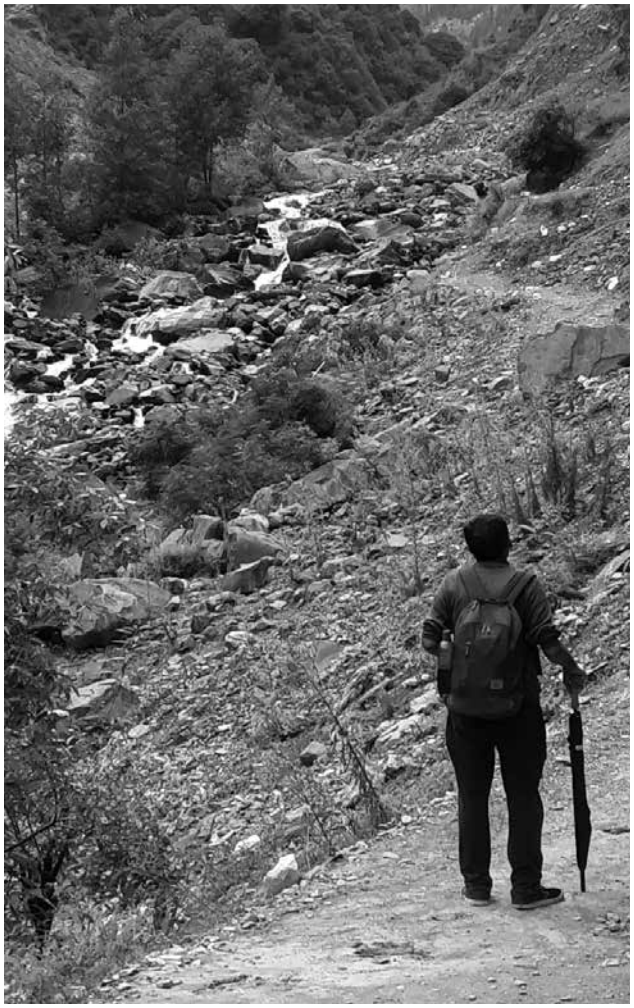

নিয়ে থেকে যাবেন। আমি আর গাইড মণিমহেশ লেক ট্রেক করে আসব।

এবার মণিমহেশ নিয়ে কিছু কথা বলে নিই।

মণিমহেশ কৈলাস চূড়া ৫৬৫৩ মিটার (১৮,৬৪৭ ফুট), যা চম্বা কৈলাস নামেও পরিচিত। মণিমহেশ হ্রদের উঁচুতে দাঁড়িয়ে। এটি শিবের বাসস্থান বলে মনে করা হয়। এটি হিমালয়ের পাঁচটি পৃথক শৃঙ্গের গ্রুপের মধ্যে পঞ্চম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিখর যা সম্মিলিতভাবে পঞ্চ কৈলাস নামে পরিচিত। প্রথম স্থানে আছে তিব্বতের কৈলাস পর্বত, দ্বিতীয় স্থানে আছে আদি কৈলাস, তৃতীয় স্থানে শ্রীখন্ড মহাদেব কৈলাস এবং চতুর্থ স্থানে কিন্নর কৈলাস। মণিমহেশ ভারমৌর, হাডসার, ধানচো হয়ে ২৬ কিলোমিটার। এটি হিমাচল প্রদেশের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থানের পাশাপাশি একটি জনপ্রিয় ট্রেকিং রুট। মণিমহেশ হ্রদটি ৩,৯৫০ মিটার (১২,৯৬০ ফুট। কৈলাস শৃঙ্গের গোড়ায় অবস্থিত। এই মণিমহেশ কৈলাস পর্বতারোহীদের দ্বারা আজ অবধিও সফলভাবে আরোহণ সম্ভব হয়নি। এবং এভাবে কুমারী শিখর (ভার্জিন পিক) রয়ে গেছে। ১৯৬৮ সালে নন্দিনী প্যাটেলের নেতৃত্বে একটি ইন্দো - জাপানি দলের দ্বারা চূড়ায় আরোহণের চেষ্টা বাতিল হয়েছিল। লেকে যাওয়ার দুটি ট্রেকরুট আছে। একটি হল হাডসার গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করে, ধানচোতে একরাত রাত্রিবাস করে, পরেরদিন খুব ভোরে মণি মহেশ লেকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আবার ধানচোয় ফিরে আসা। আরেকটি পথ হোলি গ্রাম থেকে আরও উপরে উঠে তারপর হ্রদে নেমে গেছে। এ পথে একটি ছোট্ট গ্রাম ছাড়া আর কোনো বসতি নেই।

আমি আর গাইড প্রথম রাস্তা ধরেই যাব ঠিক করলাম।

পরেরদিন সকালে গাইডের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সেরে, জিনিসপত্র গোছগাছ করে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গেল। ছোটো গাড়িতে হাডসার নেমে, ধানচোর বিখ্যাত অস্থায়ী ধাবার মালিক এবং গাইড পাপ্পুর পুরাতন বাড়ির কাঠের দুতলার একটি ঘরে আমাদের পিঠের বোঝা কিছুটা হালকা করে পথ চলা শুরু হল। প্রথম থেকেই ঝুরো পাথরের ভাঙাচোরা খাড়াই রাস্তা, পথের পাশ দিয়ে চলা নদী এবং

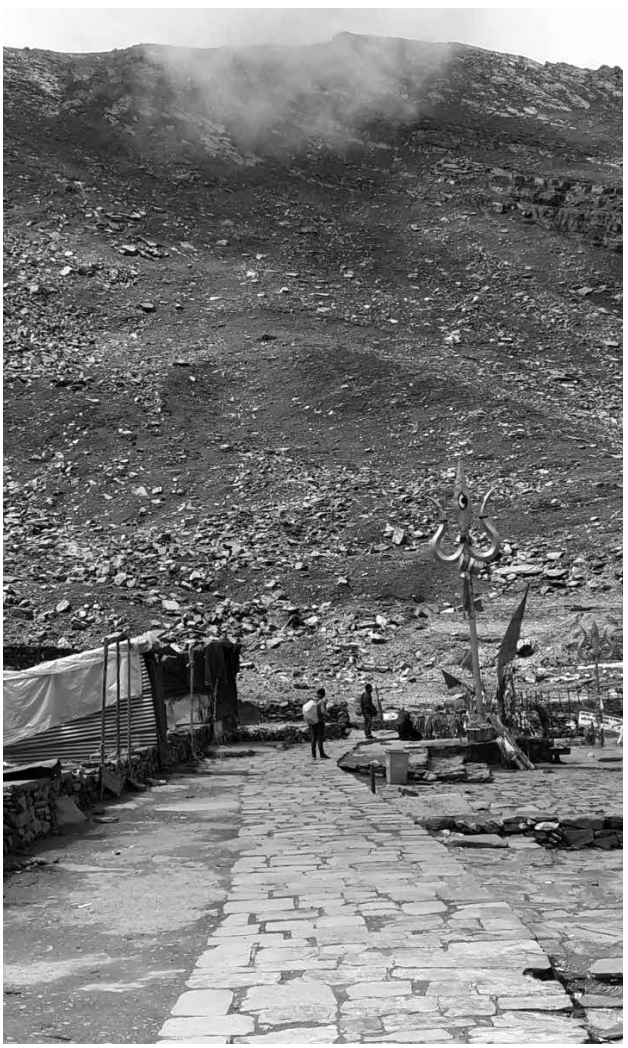

ঝর্ণা - ঝোরাকে সঙ্গী করে।

নির্মাল্যদার পায়ে যেহেতু ভারী চোট সেহেতু গাইডকে তার সঙ্গী হয়ে সামলে নিয়ে সাবধানে উঠতে হচ্ছে। বেশকিছুটা ওঠার পর শুরু হল বৃষ্টি, তার সঙ্গে ঝুরো পাথর উপর থেকে গড়িয়ে পড়া। ভাদ্র মাসে এখানে একমাসের জন্য বিরাট মেলা বসে। সেইসময় এই মণিমহেশ যাত্রায় প্রচুর ভক্তের আগমন উপলক্ষে পুরো রাস্তাতেই অস্থায়ী থাকা এবং খাওয়ার ধাবা ও লঙ্গরখানা গড়ে ওঠে। মেলার মাস শেষ, অতএব সবাই যে যার মতো পাট উঠিয়ে চলে গেছে, শুধুমাত্র বিশেষ কিছু হাতে গোনা জায়গায় এখনও কয়েকটি ধাবা রয়ে গেছে। একসময়ে মুষলধারে বৃষ্টি নামায় আধভেজা অবস্থায় (তাড়াহুড়োয় বর্ষাতি এবং পঞ্চু ফেলে এসেছিলাম) প্রায় পরিত্যক্ত এক সাধুর ছাউনির নিচে সাময়িক আশ্রয় নিলাম। বেশ কিছক্ষণ পর বৃষ্টি একটু ধরে এলে, আবার আমরা তিনজনে হাঁটা শুরু করলাম উপরের দিকে। ধানচো অবধি পুরো রাস্তাতেই আমরা তিনজন ছাড়া আর কোনো মানুষের দেখা পাইনি।

এভাবে চলতে চলতে এক সময়ে দূরে দু - তিনটি বড়মাপের ঘেরা ছাউনি চোখে পড়ল। আরও কিছুটা উঠতে সামনেই দেখলাম একটি অস্থায়ী বড়ো মাপের ধাবা। আজকের মতো এখানেই বিশ্রাম। ঘড়ির কাঁটা তখন চারটে ছুঁয়েছে। এটিই সেই পাপ্পু ওরফে রাকেশ শর্মার সেই বহু পরিচিত ধাবা। এতক্ষণ চলার পথে কোনো রকম হুঁশ ছিল না প্রায়। পাপ্পুর কয়েকজন স্টাফ এবং একজন ঘোড়া চড়ানোর পাহাড়ি মানুষ ছাড়া পুরো এলাকাটি একেবারে ফাঁকা আর নির্জন। পাপ্পুর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ পরিচয় হওয়ার পর, ও ব্যস্ত হয়ে পড়ল আমাদের খাবার প্রস্তুত করতে। বিশাল তাঁবুর ভিতরের একটি ঘরে আমাদের মালপত্র রেখে যখন তাঁবুর সামনের খোলা চত্বরে এসে দাঁড়ালাম, প্রকৃতির পাগল করা অবর্ণনীয় রূপদর্শন করে, মুহূর্তে যাবতীয় খিদে তৃষ্ণা ভুলে স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে কোনদিকে যে তাকিয়ে দেখব সেটা স্থির করা দুষ্কর হয়ে পড়ল। আমার সামনে ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো পীরপঞ্জাল শ্রেণি, ডানদিকে নিকষ কালো পাথরের পাহাড়ের চূড়ায় শেষ বিকেলের সূর্যাস্তের আলো প্রতিফলিত হয়ে মনে হচ্ছে কোনো কয়লা খনিতে আগুন জ্বলছে, আরেকটু ঘুরে বামদিকে সোজা যতদূর চোখ যায়, প্রবল খরস্রোতা পাহাড়ি নদী বিশাল জায়গা জুড়ে গর্জন করে, ঝর্ণা - সফেন নদীখাত বিস্তৃত হয়ে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে আমার ঠিক নীচে দিয়ে সবেগে এগিয়ে চলেছে আমাদের ওঠার পূর্ব রাস্তা ধরে। এভাবে কতক্ষণ মুক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, সম্বিৎ ফিরল ' খানা রেডি, জলদি আইয়ে ' ডাক শুনে। একটু পরেই সন্ধ্যা নেমে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা কয়েকজন ছাউনির তলায় কাঠকয়লার আগুনের ধুনির তাপ নিতে নিতে খানিকক্ষণ গল্প করে যে যার বিছানার কম্বলের তলায়। বাইরে তখন প্রবল ঠান্ডা হাওয়া বইছে।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে ৫ টার সময়ে আমি আর আমার গাইড পিঠের ছোটো স্যাকে পাপ্পুর তৈরি করে দেওয়া ফয়েলে মোড়া আলুর পরোটা আর আচার ভরে নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম চড়াই ভেঙে উপরে উঠে মণিমহেশ হ্রদের উদ্দেশে। ধানচো থেকে দূরত্ব ৮ কিলোমিটার। আকাশ পরিষ্কার ছিল। কিছুটা পথ যাওয়ার পর একজায়গায় সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামতে, গাইড একটি সুখবর জানিয়ে প্রশ্ন করল যে আমি ফেরার পথে সেখানে যেতে আগ্রহী কিনা। শুনেই তো আমি

একপায়ে খাড়া। আসলে ফেরার পথে এখনকার ওঠার রাস্তা দিয়ে না নেমে, বেশকিছুটা ঘুরপথে একটি উঁচু গ্লেসিয়ার বিস্তৃত স্থান আছে। ও সেখানেই যাওয়ার কথা বলেছে।

মনে অতিরিক্ত আনন্দ নিয়ে আবার হাঁটা শুরু হলো। এবং ক্রমে পুরো রাস্তাটাই কিছুটা অবিন্যস্ত কালো পাথুরে পথ। এভাবে চলতে চলতে আমার গাইড অনেকটাই আগে এগিয়ে গিয়েছিল। সেইসময় হঠাৎ কোথা থেকে একটি পাহাড়ী কুকুর এসে আমার সঙ্গী হয়ে একেবারে আমার গা ঘেঁষে চলতে লাগলো। এইসব পাহাড়ী কুকুর যে কতটা বিশ্বস্ত সাহায্যকারী, তার প্রমাণ এর আগে বহুবার পেয়েছি এবং প্রভুত উপকৃত হয়েছি। এরা বিপদের বন্ধু তো বটেই (রাস্তার খেই হারিয়ে ফেললে), উপরন্তু এরা ট্রেকারদের তুলনামূলক সহজ পথ ছেড়ে, দ্রুত পৌঁছনোর জন্য শর্টকাট আপাত কঠিন রাস্তার দিশা দেখিয়ে আগে আগে প্রশিক্ষিত গাইডের ভূমিকায় নিয়ে চলে।

ওর পিছু পিছু কিছুটা পথ চলার পর গাইডের সাথে দেখা। সে আমাকে প্রশ্ন করলো যে, শর্টকাট (নেপালী ভাষায় যাকে বলা হয় চোরবাটো) রাস্তায় গেলে আমার কোনও রকম অসুবিধা নেই তো ? সেই শুনে আমি সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম।

খানিকক্ষণ চলার পরই আমি টের পেলাম, আমার ডান পায়ের থাই মাসলের শিরায় অসম্ভব ব্যথা এবং টান ধরছে পায়ের stepping তোলার সময়।

এর কারণ, আমি গত প্রায় দীর্ঘ ৮-৯ বছর পর আবার ট্রেক রুটে পা দিলাম। ফলে এটাই হওয়ার ছিল। যদিও আমি আমার অসুবিধার কথা গাইডের কাছে প্রকাশ করিনি বা মুখে কোনও রকম ভাবান্তর প্রকাশ করিনি। বাকিটা পথ ওই তীব্র যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেই শর্টকাট রাস্তা ধরেই উঠতে থাকলাম। এভাবে চলার পর হঠাৎই আড়াল থেকে চোখের সামনে ভেসে উঠলো কৃষ্ণবর্ণ গাত্রের মণিমহেশ শৃঙ্গ। শৃঙ্গের গায়ে তখন কালো মেঘ ভেসে আড়াল করতে চাইছে চুড়াটিকে। পায়ের কাছে বরফের প্যাচ এবং বরফ গলা জল। মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে কিছুটা সময় ধরে চেয়ে রইলাম।

আর একটু এগিয়ে ছোট একটি সংক্ষিপ্ত রাস্তা ধরে (প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার পর্যায়ে) একেবারে অনেকখানি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রেলিং ঘেরা পবিত্র হ্রদ চত্বরে এসে উঠলাম।

নিস্তরঙ্গ হ্রদের চারপাশে এখনও কিছু ধাবা কাম দোকান রয়ে গেছে।

চত্বরের একেবারে মাঝখানে একটি গোল বাঁধানো জায়গায় সোনালী চকচকে একটি বিশাল ত্রিশূল দন্ডায়মান। ত্রিশূলের নিচেরদিকে কয়েকটি ছোট দেব - দেবীর মূর্তি। এবং এখানেও কোনও পান্ডা বা পুরোহিতের দেখা পেলামনা পুজো দেওয়ার জন্য। বছরভোর এখানে কিছু সাধু থেকে জান শীতকালের প্রবল ঠান্ডা আর জমাট বরফ উপেক্ষা করে। সেসময়ে তাঁরাই দেখভাল করেন।

আস্তে আস্তে মণিমহেশ শৃঙ্গ মেঘে আচ্ছাদিত হয়ে পড়লো। আমরাও অবশেষে আমাদের আনা সেই ঠান্ডা আলুর পরোটা আর আচার দিয়ে খুন্নিবৃত্তি করে নামার পথ ধরলাম। তবে, যে পথে এসেছিলাম সে পথে নয়। পূর্বের কথামত গাইড আমাকে ঘুরপথে নিয়ে চললো সেই উক্ত বর্ণিত গ্লেসিয়ার পয়েন্টের দিকে।

অনেকটা পথ চলার পর আচমকাই পাহাড়ের একটি বাঁক নিতেই একেবারে সামনে সেই সুউচ্চ শক্ত জমাট বাঁধা গ্লেসিয়ার পয়েন্ট। অনেকটা উপর থেকে নীচের দিকে একেবারে অতলে নেমে গেছে। দুটি গ্লেসিয়ারের মাঝখানে সরু একফালি বরফগলা জল গড়িয়ে পড়া পিচ্ছিল মোরেন রাস্তা। সেখানে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ফটো তুলে, অতি সাবধানে সেই রাস্তা পাড় হয়ে পুণরায় হুড়মুড় করে নীচের দিকে নামা। অনেকটা পথ যাওয়ার পর অনেক দূরে চোখে পড়লো আসার সময়ে রাস্তার পাশের একমাত্র বড় ধাবাটি।

বেশ দ্রুততার সাথেই একপ্রকার হুড়মুড়িয়ে নীচে নামছিলাম। যেহেতু নীচের দিকে নামার সময় পায়ের টান বা যন্ত্রণা ছিলনা।

অনেকটা নেমে এসে সেই ধাবায় শরীর এলিয়ে দিয়ে নুডলের অর্ডার করলাম। ধীরে সুস্থে খাবার খেয়ে, সেখানে প্রায় একঘন্টা গল্প করে সময় কাটিয়ে আবার হাঁটা লাগালাম আমাদের অস্থায়ী থাকার আশ্রয়ে। প্রসঙ্গত, মণিমহেশ এ ওঠার সময় নির্মাল্যদাকে মিস করার জন্য মনটা বেশ খারাপ ছিল। কিন্তু বাস্তবকে তো মেনে নিতেই হবে।

যত নিচের দিকে নামছি, ততই চোখের সামনে পরিস্ফুট হচ্ছে, ধাবার থেকে দেখা দূরের সেই খরস্রোতা নদী আর ঝর্ণা। প্রবল আওয়াজ করে সশব্দে পাহাড়ের অনেক উপর থেকে নানানভাবে, বিভিন্ন দিকে বিভক্ত হয়ে আলাদা আলাদা রূপ নিয়ে সবেগে এগিয়ে চলেছে। মনের সাধ মিটিয়ে বেশকিছু ফটো তুলে ক্যামেরা বন্দী করলাম।

অবশেষে বিকেলের দিকে পাপ্পুর ধাবায় এসে পৌঁছলাম। আমাদের পথ চেয়ে নির্মাল্যদা এতক্ষণ অধীর অপেক্ষায় বসে ছিলেন। আঙ্কমাদের দেখে খুশি হয়ে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন।

এরপর যথারীতি গতকালের মত গল্পগুজব - রাতের ডিনার খেয়ে আবার ঘুম।

পরেরদিন বিষন্নচিত্তে পাপ্পু সহ অন্যান্য সহকর্মীদের বিদায় জানিয়ে ধীরে ধীরে নিচের দিকে ফেরার পথে চললাম হাডসারের উদ্দেশ্যে। শেষবারের মতো দু চোখ ভরে প্রকৃতিকে দেখতে দেখতে নীচে নেমে আবেগভরে প্রণাম জানিয়ে চললাম আর এক নতুন জায়গার উদ্দেশ্যে।

সেই সব পুরোনো কর্মকর্তারা ডোডো পাখির মতো আজ দুষ্প্রাপ্য

জয়ন্ত চক্রবর্তী

সেই কথাটা কোনওদিন ভুলব না । উনিশশো নব্বই সালে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কভার করার জন্য আমার তখনকার কাগজ আঞ্জ মার নাম অনুমোদন করেছে। অথচ প্রয়োজনীয় অ্যাক্রেডিটেশন তখনও আসেনি। যাঁরা বিশ্বকাপ ফুটবল কভার করেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন এই অ্যাক্রেডিটেশন ব্যাপারটা কতটা জরুরি। বিনা আক্রেডিটেশনে বিশ্বকাপ কভার করা আর মহাশূন্যে খালি হাত পায়ে বিচরণ করাটা অনেকটা একরকম। মনের দুঃখে একদিন নেতাজি স্টেডিয়ামে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের অফিসে বসে আছি, এমনসময় প্রিয়দা মানে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন-এর সভাপতি, কেন্দ্রের দাপুটে মন্ত্রী ঢুকলেন অফিসে । আমাকে ওই ভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে। আমাকে আর কিছু বলতে হয়নি, সেই সময়কার এ আই এফ এফের অফিস সেক্রেটারি কুণ্ডুদা মানে নীহার কুণ্ডু প্রিয়দাকে বলে দিলেন সব ব্যাপারটা। প্রিয়দা সবটা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন -- কুছ পরোয়া নেই। তুই আমার এই চিঠিটা ফিফা অফিসে দেখাবি রোমে। বাপ্ বাপ্ বলে কাগজপত্র পেয়ে যাবি। প্রিয়দাকে বললাম যে, ইতালিয়া - ৯০ এর আঞ্জ ক্রেডিটেশন কার্ড আমার গলায় ছাড়া রিজার্ভ ব্যাংক বিদেশি

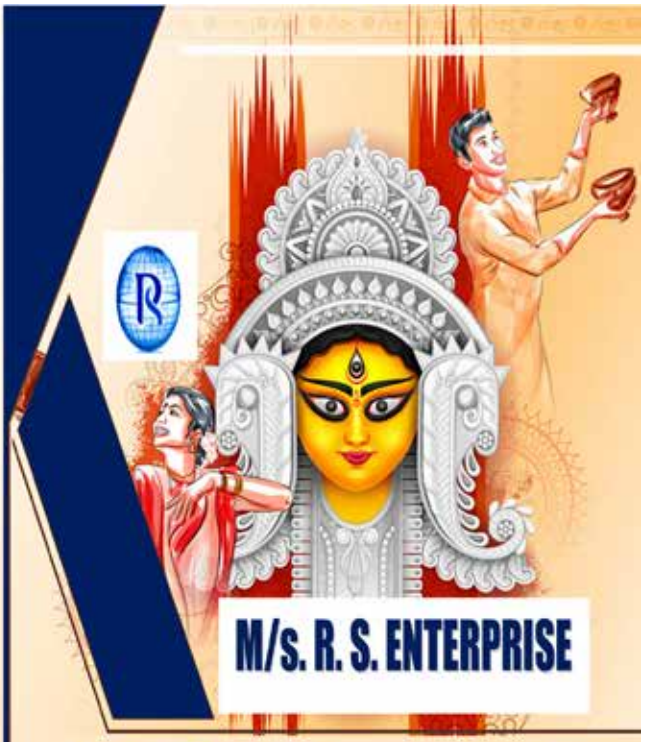

সমস্ত লেখক পাঠক
এবং
বিজ্ঞাপনদাতা বন্ধুদের
জানাই আসন্ন উৎসবের
শুভেচ্ছা
+91 33 2321 0004
CE 17, 3rd Cross Road, Sector 1
Salt Lake, Kolkata 700064, WB
www.banglastreet.online
বাংলাST.
online
Published by
Look East Media
Pvt. Ltd.
Powered by
diahome
DIABETES CARE COMES HOME

M/s. R. S. ENTERPRISE
OUR SERVICES
Service System
Mobile: +91 9800221184, +91 9434300215,
+91 8670042609, +91 9732657501
rse.haldia@gmail.com
adhik.info@gmail.com
Registered Office:
PURBA MEDINIPUR PIN: 721604
444/0CHIRANJIBPUR COLONY, HALDIA,
Kolkata Office:
547/2(547),RAJA RAM MOHAN ROY ROAD
KOLKATA-700008

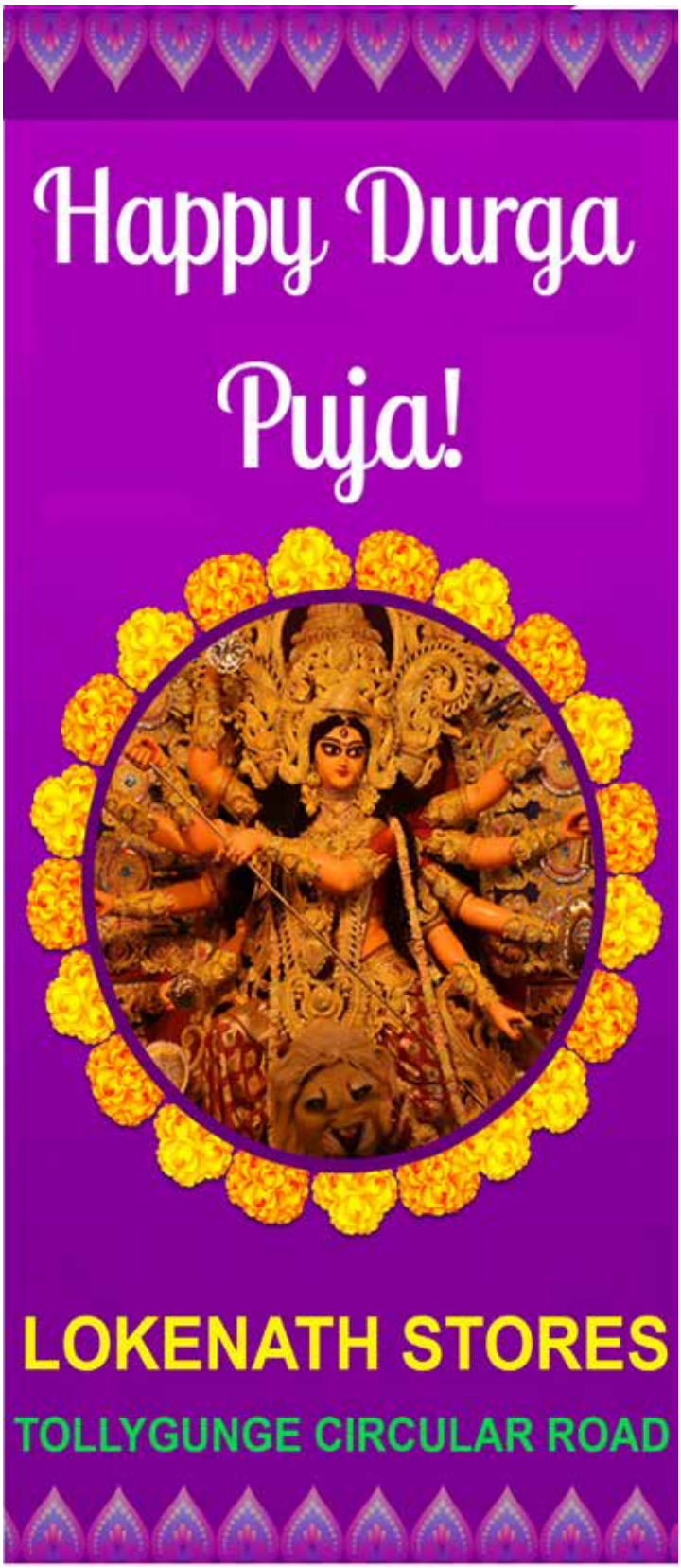

মুদ্রার অনুমোদন দিচ্ছে না। প্রিয়দা রিজার্ভ ব্যাংকের এক অফিসারের নামে চিঠি করে দিলেন। সেদিন বিকেলের মধ্যে আমি বিদেশি মুদ্রার অনুমোদন পেয়ে গেলাম। প্রিয়দা ইতালিতে যাঁকে চিঠি লিখেছিলেন তাঁর নামটা এতদিন পরেও মনে আছে -- গুইদো টগনানি। দুরু দুরু বক্ষে রোমের মিডিয়া সেন্টারে টগননি সাহেবকে চিঠিটা দিলাম। চিঠিটা পড়েই টগননি সাহেব তাঁর মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডাকলেন। আমাকে দেখিয়ে ছবি তুলতে বললেন। বাস, আধঘন্টার মধ্যে ফিফার আক্রেডিটেশন কার্ড আমার গলায়। টগননি সাহেবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সোনিয়া মেমসাহেব সেদিন আমাকে বলেছিলেন -- দাসমুন্সির চিঠি! তোমার আক্রেডিটেশন না হয়ে যায় কোথায়? আজ এতদিন পরে বসে ভাবছি ভারত তখন মেন স্ট্রিম ফুটবল খেলছে না। ফিফার কর্তারা অনেকেই ভারতের নামটা শোনেননি। অথচ তখনই বিশ্ব ফুটবলের সাংগঠনিক মহলে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির কী দাপট ! এর ঠিক আট বছর বাদে ফ্রান্স বিশ্বকাপে আমি প্রিয়দাকে আবিষ্কার করি ফিফার বক্সে । ফিফার তদানীন্তন সচিব সেপ ব্লাতারের পাশে বসে খেলা দেখছেন। এই রকম দাপুটে ক্রীড়াকর্তারা আজ ডোডো পাখির মতো দুষ্প্রাপ্য। আমি কলকাতা

ময়দানের কিং মেকার বিশ্বনাথ দত্তকে দেখেছি অসামান্য ব্যাক্তিত্ব নিয়ে আই এফ এ আর সি এ বি চালাতে। মনে আছে, বিশ্বনাথ দত্ত মানে ময়দানের সর্বজনগ্রাহ্য বিশুদা আমাকে একবার একটা শিক্ষা দিয়েছিলেন যেটি আমার জীবনে অন্যতম বড়ো পাঠের স্বীকৃতি পেতে পারে। তখন আমি যুগান্তরে কাজ করি। কলকাতায় একটা টেস্ট ম্যাচ আসন্ন। টিকিট কেলেঙ্কারির একটা খবর পেলাম। তখন যুগান্তরের অফিস বাগবাজারে। জমিয়ে খবরটা করব বলে তৈরি হচ্ছি , এমন সময় বিশুদার ভাব শিষ্য, সি এ বির সম্পাদক জগমোহন ডালমিয়ার ফোন -- সি এ বির সভাপতি বিশুদা ডাকছেন। খুব জরুরি। একবার ইডেনে আসতে হবে। রাতে বাস ধরে গেলাম ইডেনে । জগমোহন ডালমিয়া আর বিশ্বনাথ দত্ত একটি ঘরে বসেছিলেন। আমি যেতেই বিশ্বনাথ দত্ত বললেন -- প্রথমেই তোমাকে অভিনন্দন, টিকিট কেলেঙ্কারি নিয়ে খ বরটা পাওয়ার জন্যে। আমি তখন ভাবছি - আরে এরা জানল কী করে যে খবরটা আমি পেয়েছি। বিশ্বনাথ দত্ত তারপর বললেন -- খবরটা ছাপা হলে কলকাতায় টেস্ট ম্যাচটাই অনিশ্চিত হয়ে যাবে। আমি বা জগু কোনো ভাবেই এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত নই তা তুমি জানো। কিন্তু খবরটা বের হলে গোটা ক্রিকেট ফ্রেটারনিটি সমস্যায় পড়বে। কলকাতায় টেস্ট ম্যাচ হবে কিনা সন্দেহ । বাংলার ক্রিকেটের স্বার্থে খবরটা নাই বা করলে। কিছু কিছু খবর এমন থাকে যা প্রকাশিত হলে রিপোর্টারের কদর বাড়ে কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। আমরা তো তোমাকে বলতে পারি না এই খবরটা লেখো, এটা লিখো না। আমরা তোমাকে অনুরোধ করতে পারি মাত্র !

সেদিন রাতে বড়ো একটা শিক্ষা নিয়ে ইডেন থেকে বেরিয়েছিলাম - একজন সাংবাদিকের জীবনে কিছু না লেখার দায়ও আছে। বৃহত্তর স্বার্থে কলম থামাতে হয়। ওই খবরটি সেদিন লিখিনি। কিল করে দিয়েছিলাম। কিন্তু, আঙ্গ মার অ সাংবাদিকতার জীবনের সব থেকে বড়ো শিক্ষাটি সেদিন পেয়েছিলাম - লেখার মতোই না লেখাটাও সাংবাদিকতার একটা বড়ো শর্ত। বিশ্বনাথ দত্তর ভাই প্রদ্যুৎ দত্তর একটা গল্প না

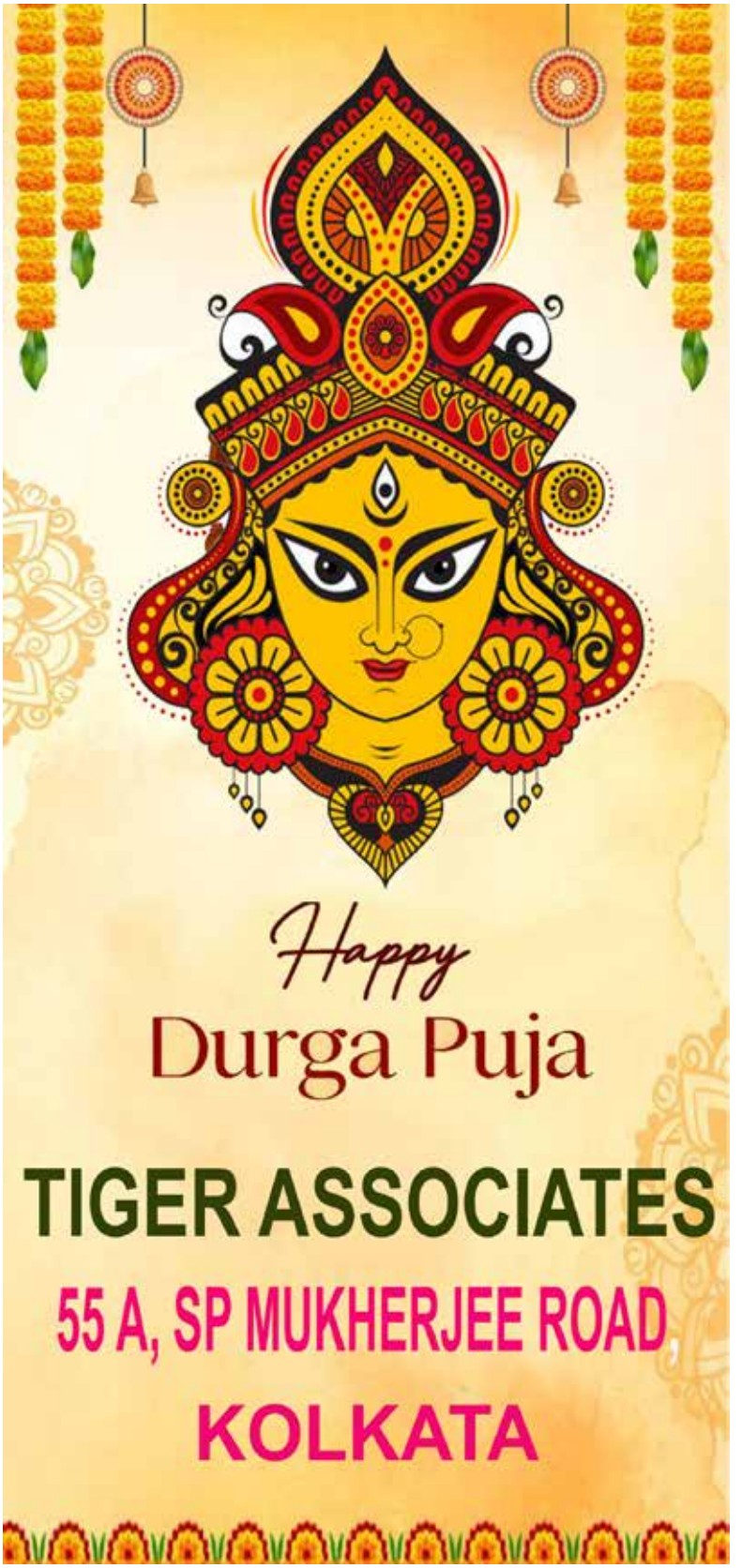

শোনালে অন্যায় হবে। আই এফ এ সচিব হিসেবে প্রদ্যুৎদা তখন মহামেডানকে সাসপেন্ড করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন । মীর মোহাম্মদ ওমর, তখনকার কলকাতার এক দুর্ধষ ডন , প্রতিবাদে মিছিল বের করেছেন। ধর্মতলা চত্বর অশান্ত। সেই দুপুরে প্রদ্যুৎদার ঘরে বসে আছি আই এফ এ অফিসে। ঝন ঝন শব্দে ফোন বেজে উঠল। প্রদ্যুৎদা আঙুলের ইশারায় আমাদের বললেন -- চুপ করতে। পুলিশ কমিশনারের ফোন। ওপার থেকে কী অনুরোধ এল জানি না, প্রদ্যুৎদা বললেন -- আই এফ এ সচিব হিসেবে আমি মহামেডানকে সাসপেন্ড করেছি। ওটা আমার কর্তব্য ছিল। আপনার কাজ শহরের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা। আমি আমার কাজ করি, আপনি আপনার কাজ করুন। মাফ করবেন, মহামেডানের শাস্তি আমি উইথড্র করতে পারব না।

এই প্রদ্যুৎদাই আবার আই এফ এ অফিস বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করে শিলিগুড়িতে নেহেরু কাপ করেছিলেন। আই এফ এ র অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং-এর দিন সকালে খবরটা করেছিলাম যুগান্তরে । বিকেলে প্যারিস হলের সভায় তুলকালাম হয়ে গেল। প্রদ্যুৎদা প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করলেন। সভার শেষে এই প্রদ্যুৎদাই আমাকে কংগ্রাচুলেট করলেন এমন একটা খবর করার জন্যে। বললেন - খবরটা ডিনাই করেছি চেয়ার থেকে। কিন্তু চেয়ারের বাইরে খবরটা মিথ্যা বলি কীভাবে? খবরটা তো একশো ভাগ সত্যি।

সেদিনের কর্মকর্তারা এই রকমই ছিলেন। আই এফ এর আর-এক কর্মকর্তা অশোক ঘোষকে দেখেছি অনেক বড়ো সিদ্ধান্ত নিয়েও অম্লান বদনে গ্র্যান্ড-এর জিমে গিয়ে শরীচর্চা করতে । অশোক মিত্র, রঞ্জিত গুপ্ত কিংবা হালফিলের আরও অনেক কর্তা কে দেখেছি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে। কিন্তু জমোহন ডালমিয়ার মতো একজনকেও দেখেছি কি ? সি এ বির ট্রেসারার থেকে সচিব। সেখান থেকে সভাপতি। বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট-এর ট্রেজারার থেকে শুরু করে সচিব। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যান। জগুদার উড়ানটা স্বপ্নের মতো। এই জগুদা আমাকে পছন্দ করতেন। রাত বিরেতে কত খবর দিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট দল উনিশশো তিরাশিতে বিশ্ব কাপ জয় করল। জগুদা তখন বোর্ড-এর ট্রেজারার। হাতে একটা পয়সা নেই যে খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা দিয়ে হাতে কিছু পারিতোষিক তুলে দেবেন। জগুদা তদানীন্তন বোর্ড সভাপতি রাজ সিং দুঙ্গারপুরকে নিয়ে গেলেন রাজের বান্ধবী লতা মঙ্গেশকরের বাড়ি প্রভু

কুঞ্জ-এ। উদ্দেশ্য লতাকে দিয়ে গান গাইয়ে কিছু টাকা উপার্জন। যা দিয়ে সম্বর্ধনাটি হবে। সেবার লতা কনসার্ট করেছিলেন। বিশ্ব কাপের ক্রিকেটাররা একটি করে মোটা সোনার চেন উপহারও পেয়েছিলেন বোর্ড থেকে।

এখন ভবি এই সব কর্মকর্তারা ছিলেন বলেই বল এখনও গড়াচ্ছে। এঁরা ছিলেন দধিচি। বুকের হাড় দিয়ে বজ্র তৈরি করে বাংলার, ভারতের খেলার দুনিয়াকে বাঁচিয়েছেন। এঁরা আজ কোথায় গেলেন !

এলো যে পুজোর বেলা

শারদোৎসবের দিনগুলিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিলেন পিউ

মডেল ঃ পিউ জানা
ছবি ঃ বিজয় নৌকুদকর
মেকওভার ঃ মালতী ভানুশালি

SRAM MRAM GROUP

SRAM & MRAM Group's core strengths lie in Information Technology, covering semiconductor design, fabrication, and application development for Hospitality and Healthcare sectors. Their operations span Neural Networks, AI, Hospitality Solutions, Embedded Systems, agro products, exports, and healthcare product trading.

Comprehensive Tech Solutions

Sustainable Development

Innovative Solutions for a Sustainable Future

Powered by Technology, Driven by Excellence

Contact Us

info@srammram.com

https://srammram.com/

SAPTHAGIRI, PADMAVATHI
&
PEE GEE GROUP OF INSTITUTIONS, DHARMAPURI

(An ISO 9001: 2008 Certified Institutions)

Education Can Change the World

SAPTHAGIRI
College of Engineering
Creating Tomorrow

SAPTHAGIRI COLLEGE OF ENGINEERING

(Approved by AICTE New Delhi & Affiliated to Anna University,Chennai)

BE	Civil I Mech I EEE I ECE I EIE I CYBER SECURITY
BTECH	IT I ARTIFICIAL INTELLIGENCE(AI) DATA SCIENCE
M.E	CSE I PSEI SE
MCA	MBA

SAPTHAGIRI COLLEGE OF EDUCATION

(Approved by The Govt. of Tamil Nadu- Recognized by NCTE, Bangalore & Affiliated to Tamil Nadu Teacher's Education University, Chennai)

B.Ed. (2 years)

D.Ted (2 years)

PEE GEE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE

(Approved by AICTE New Delhi & The Govt of Tamil Nadu Affiliated to the Periyar University,Salem)

UG	PG
BSC (Mathematics, Computer science, Bio chemistry,Microbiology,Physics, Chemistry, Bio Technology)	**MSC** (Mathematics, Computer science, Bio chemistry,Microbiology,Physics, Chemistry, Bio Technology)
• B.C.A • B.B.A • B.COM • B.A (TAMIL/ENGLISH) • B.Lit. (TAMIL) • B.SC Hotel Management	• M.Com • M.A (TAMIL) • M.A (ENGLISH) • M.SC Industrial Microbiology • M Phil (Commerce/Management (Part Time/Full Time) • M.Phil (TAMIL) (Part Time/Full Time) • M.B.A • M.C.A

PEE.GEE POLYTECHNIC COLLEGE

(Approved by AICTE New Delhi & Affiliated to DOTE, Chennai)

- DECE
- DEEE
- DCSE
- DME

PADMAVATI COLLEGE OF PHARMACY

(Affliated To The Tamil Nadu Dr M.G.R University,Chennai, Approved By AICTE, PCI- New Delhi)

Doctor of Pharmacy (Pharm.D) - 6 years
Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) - 4 years
Diploma in Pharmacy (D.Pharm) - 2 Years
Master of Pharmacy (M. Pharm) – 2 Years
Master of Pharmacy (M. Pharm) – 2 Years

- Pharmaceutics
- Pharmacognosy
- Pharmacology
- Pharmacy Practice
- Pharmaceutical Analysis
- PH.D

PADMAVATI COLLEGE OF NURSING

(Affliated To The Tamil Nadu Dr M.G.R University, & TNNMC Chennai. Indian Nursing Council, New Delhi)

BSC Nursing (4 Years)

GNM (3 years)

NO DONATION 100 % PLACEMENT 100 % SCHOLARSHIP HOSTEL AVAILABLE BUS FACILITIES AVAILABLE

FOR FURTHER DETAILS CONTACT

87544 37007 I 97864 34244 I 90877 02696

87548 72666 I 87548 73666 I (04348) 247782/ 27880

CAMPUS- NH-44 BANGALORE-SALEM MAIN ROAD, PERIYANAHALLI, DHARMAPURI- 635 205

EMAIL- admissions@sapthagiri.edu.in WEBSITE- https://sapthagiri.edu.in

Banglastreet, UTSAV, Registered: KOLRMS/2012-2014 RNI NO: WBBEN/200935299 INR: 200.00 Printed at Calcutta Graphic Pvt. Ltd., 3B Maniktala Industrial Estate, Ultadanga , Kolkata-700054 & Published by Ashis Pandit at CE-17, Saltlake, Sector-1, Kolkata-700064

Heartiest Bijoya Greetings from :

MAIDEN CONTAINERISED CARGO MOVEMENT ON INDO BANGLADESH PROTOCOL ROUTE FROM HALDIA TO PANGAON

- Five Star Logistics is proud to announce the first voyage of containerized cargo movement through the Indo Bangladesh Protocol Route to further strengthen the ties between India and Bangladesh. This is the first movement of EXIM containers to Bangladesh through the protocol route.
- 45 containers carrying Sponge Iron on account of Rashmi Cements Limited and Orissa Metaliks Pvt. Ltd. will be loaded from Haldia Port for Pangaon Terminal in Bangladesh.
- The voyage will take about 8 days via Hemnagar and Mongla.
- Five Star Group would like to thank Rashmi Cement Limited, Orissa Metaliks Pvt Ltd., Haldia Port Authorities, Kolkata Customs and Adani Logistics for their guidance and support in making this vision a reality.
- This will be a regular service with a voyage every 15-20 days.

FIVE STAR LOGISTICS PVT. LTD.

OUR SERVICES :

Stevedoring ▸ Logistics Storage ▸ Man Power handling ▸ Documentation

▸ Shipping Agency and Chartering ▸ Exporting & Importing (Iron Ore Fines, Coal, Clinker)

KOLKATA OFFICE : 19A, J. N. Road, Lesley House, 2nd Floor, Kolkata-700087, West Bengal India. Ph : 91-33-22171040 / 40014608, Fax : 91-33-22171041

HALDIA OFFICE : Ranichak, Haldia, Dist: Purba Medinipur, West Bengal, India. Ph: +91-3224 252415, +91-324093, Fax: +91-3224-251740

PIC : Yogesh Agarwalla, Mob. : 98300 84611, E-mail : yogesh@haldiafivestar.com

www.haldiafivestar.com